শংকর

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ

ছোটবেলায় যিনি আমার হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন তাঁর কথাই মনে পড়ছে। সরস্বতীর দপ্তরখানায় যদি পুরনো হিসেবের কাগজ-পত্র যথাযথভাবে রক্ষা করবার ব্যবস্থা থাকে তবে সেখানকার লেজারে আমার নামের পাশে আজও নিশ্চয় লেখা আছে—ইনট্রোডিউস্‌ড্‌ বাই যোগেন্দ্রনাথ মান্না।

বৃদ্ধ মানুষটি—সারাক্ষণ নিজের মনে পান চিবোতেন। বয়সের টানে দেহের চামড়া আর টান-টান ছিল না—কিন্তু মাথার চুলগুলো দেহের কালোরঙের সঙ্গে খাপ খাবার জন্যেই যেন তখনও কালো ছিল। বাড়ির আর সবাই বলতেন মুহুরীমশায়, আর আমার বাবা (তিনি উকিল ছিলেন) ডাকতেন যোগীন। আমাদের বাড়িতেই থাকতেন তিনি; আর সারাক্ষণ লাল খেরোবাঁধানো খাতায় কি সব লিখতেন। তাঁর মুক্তোর মতো হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম আমিও কবে অমনভাবে লিখতে পারবো।

অন্য সবার সঙ্গে আমিও প্রথমে তাঁকে মুহুরীমশায় বলেই ডাকতাম। তারপর একদিন মা বললেন, "এখন থেকে ওঁকে মাস্টারমশায় বলে ডাকবে। প্রণাম করো ওঁকে।"

মাস্টারমশায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "আ-হা-হা তা কখনই হয় না। বাউনের ছেলে পায়ে হাত দেবে কি।"

মা বললেন, "হবে না কেন; আপনি না ওর হাতে-খড়ি দিচ্ছেন—ওর গুরুদেব। সেকাল হলে আপনার বাড়িতে গিয়ে, আপনার সেবা করে লেখাপড়া শিখতে হতো।"

বিব্রত মাস্টারমশাই উত্তর দিয়েছিলেন, "কী যে বলেন।"

এরপর মা ও মাস্টারমশায় আর ও প্রসঙ্গের অবতারণা করেননি। কিন্তু আমার প্রস্তাবটা মন্দ লাগেনি। মাসে এক শনিবার মাস্টারমশায় বাড়ি যেতেন—বালি উত্তরপাড়ার কাছে রঘুনাথপুর না কোথায়। সোমবারে

যখন ফিরতেন তখন সঙ্গে থাকতো একটা থলেবোঝাই লাউ-এর শাক, চালকুমড়ো, পেঁপে ইত্যাদি ; আর প্রায়ই একটি কয়েদবেল। কয়েদবেলের সঙ্গে সর্দি ও জ্বরের যে কী সম্পর্ক আছে তা ঈশ্বরই জানেন—কিন্তু বাড়ির লোকেদের ভয়ে মাস্টারমশায়কে সেটি গোপনে আমার জন্যে আনতে হতো! মানসনেত্রে আমি প্রায়ই রঘুনাথপুরের একটি নিষিদ্ধ বৃক্ষে শত শত লোভনীয় ফল ঝুলে থাকতে দেখতাম। তাই বিনা দ্বিধায় সানন্দে আমি গুরুগৃহে বাসের প্রস্তাব পেশ করলাম।

মাস্টারমশায় বললেন, "সে কি হয়? এমনি একবার আমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসবে, বাবু যদি রাগ না করেন।"

এর পরই শুরু হয়েছিল—অ আ ক খ। বর্ণপরিচয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংখ্যা পরিচয়। আর সেইখানেই আমার দুঃখময় জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনা।

অঙ্কের সঙ্গে আমার জীবনব্যাপী বৈরীর সূত্রপাত হয়েছিল একটু অপ্রত্যাশিতভাবে। সেইটুকুই বলবো এখন—আমাদের বর্তমান হিসেব-নিকেশের পক্ষে সেইটুকুই এখন প্রয়োজন।

মাস্টারমশায় আমাকে আঙুল গুণতে শিখিয়েছিলেন। বলতেন "চার আর চারে যোগ করলে কত হয় বল তো?"

গণিতশাস্ত্রে আমার দিদি তখন আমার থেকে অনেক অগ্রবর্তিনী। দিদি বলেছিল, "এ-ম্যা, তুই সবে এখন যোগ শিখছিস্! আমার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব শেষ হয়ে গিয়েছে।"

সেই মুহূর্তেই বোধ হয় আমার মস্তিষ্কে কোনো গোলযোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। যোগ কষা ছেড়ে দিয়ে চুপ-চাপ বসে রইলাম। মাস্টারমশায় খুব ভালমানুষ ছিলেন, মারধোর করতেন না। বললেন, "অঙ্ক না কষে বুঝি খেলার কথা ভাবছো?"

বললাম, "না মাস্টারমশায়, আমি জানতে চাই আগে যোগ কেন? আগে বিয়োগ, গুণ বা ভাগ নয় কেন?"

আজ ভাবি, মাস্টারমশায় নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির মানুষ ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, "গুণ আর ভাগটা কিছু নয়—যোগ আর বিয়োগেরই একটা বড় ধরন। আসল হলো এই যোগ আর বিয়োগ। রান্নায় যেমন

সব কিছুই হয় ভাজা না হয় সেদ্ধ ; সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রটা তেমনি কেবল যোগ আর বিয়োগ।"

আমি একটু বোধহয় অকালপক্ক ছিলাম। মাস্টারমশায়কে ভালমানুষ পেয়ে ঘাড়ে চেপে প্রশ্ন করেছিলাম, "যোগ আগে না বিয়োগ আগে ?"

মাস্টারমশায় ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "দুষ্টুমি না করে যে অঙ্কটা দিয়েছি সেটা কষো।"

আমার দিক থেকে আদেশ মান্য করবার কোনো লক্ষণ না দেখে তিনি বলেছিলেন, "ওরকম করলে বাবুকে বলে দেবো।"

বাবুকে বলে দেওয়ার ফল যে আমার পক্ষে বিশেষ প্রীতিপদ হবে না তা জানতাম। কিন্তু মাস্টারমশায়কেও ভীতি প্রদর্শনের পন্থা আমার জানা ছিল। ভাবতে আজও লজ্জা লাগে যে, আমার শিক্ষাগুরুকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেদিন জানিয়েছিলাম, বাবুকে বললে সুযোগ মতো তাঁর হিসেবের খাতায় কোনো এক সময় কালির দোয়াত উল্টে দিতে আমি মোটেই সঙ্কুচিত হবো না। মাস্টারমশায়ের অসাবধানতায় এই কালির দোয়াত একবার খাতায় উল্টে গিয়েছিল। তার ফলে বাবার কাছে তাঁকে কিভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছিল তা আমার জানা ছিল ; এবং পরে কালির বন্যায় নিশ্চিহ্ন হিসেবগুলো পুনরুদ্ধারের জন্যে তাঁকে দিনের পর দিন যে অমানুষিক পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল তাও স্বচক্ষে দেখেছিলাম।

এই ভীতিপ্রদর্শনে ফল হয়েছিল। মাস্টারমশায় নিরুপায় হয়ে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন—"যোগ আর বিয়োগ, গুণ আর ভাগ নিয়েই অঙ্কের জগৎ। কেন জানি না, আগে যোগ তারপর বিয়োগ শেখানো হয়।"

আমি বলেছি, "ও-সব ঠকানো বুদ্ধি চলবে না। যোগ বড় না বিয়োগ বড় বলতেই হবে।"

মাস্টারমশায় বিরক্ত হয়ে বলেছেন, "কি জানি, আমাদের পিতৃপুরুষরা প্রথমে যোগ না বিয়োগ আবিষ্কার করেছিলেন বলতে পারবো না। তবে দুই-ই মানুষের কাজে লাগে—না হলে জমাখরচ হয় না।"

সময়ে অসময়ে এরপর কতদিন যে মাস্টারমশায়কে বিরক্ত করেছি তার ইয়ত্তা নেই। যখন অঙ্ক কষবার ইচ্ছে হয়নি, যখনই ফাঁকি দেবার লোভ হয়েছে, তখনই পুরনো প্রশ্ন তুলে মাস্টারমশায়কে নাস্তানাবুদ করেছি।

আজও ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সেই বৃদ্ধ মানুষটি কি অসীম ধৈর্যে আমাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতেন। আমাকে বোঝাবার জন্যে কত সহজ সাধারণ উপমা খুঁজে বার করতেন। তিনি বলতেন, "এই দেখো না, তোমার ভাই হয়েছে সেদিন—এটা যোগ। আর আমাদের জুড়ন মুদির মা মারা গেল—এটা বিয়োগ।"

আমি কিন্তু কিছুই শুনতে চাইনি। বলেছি, ওদের মধ্যে কে বড় বলুন। ফলে, আর কিছুই হয়নি, মাস্টারমশায়ের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও আমি অঙ্কে কাঁচা হয়ে গিয়েছি। আমার সমবয়সী ছেলেরা যখন ইয়া-ইয়া গুণ ভাগ, এমনকি গসাগু লসাগু কষছে, আমি তখনও যোগ আর বিয়োগ নিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি। গুরু নির্যাতনের মূল্য পরবর্তী সময়েও আমাকে যথেষ্ট দিতে হয়েছে। কখনও সেই গোড়ার গলদ সামলে উঠতে পারিনি—আমার সমগ্র ছাত্রজীবনে অঙ্কটা একটা জীবন্ত বিভীষিকা হয়ে তার অশুভ অন্ধকার ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল।

এখনও, এতোদিন পরে ছোটোবেলার সেই কথাগুলো ভেসে ওঠে। মনে হয়, যোগ বিয়োগের হাঙ্গামা না থাকলে পৃথিবীটা কি অসীম শান্তির নীড় হতো! মানব সভ্যতার সেই আদি যুগে আমাদের পিতৃপুরুষরা কেন যে যোগের গোলযোগে গিয়েছিলেন জানি না। তবে যোগ আছে বলেই বিয়োগ এসেছে। মাস্টারমশায় বলেছিলেন, জন্ম আছে বলেই মৃত্যু রয়েছে; জুড়নের মা যদি না জন্মাতো তা হলে তাকে মরতে হতো না, জুড়নকেও তাহলে খালি গায়ে খালি পায়ে কাছা গলায় দিয়ে অমনভাবে ঘুরে বেড়াতে হতো না। নিজের অপরিণত বুদ্ধিতে তখন ভেবেছি, জুড়নের মা যদি না জন্মাতো তাহলে বেচারা জুড়নকে এতো কষ্ট পেতে হতো না।

তখন কী জানতাম, এই যোগ বিয়োগের মধ্যে জুড়নের অস্তিত্বও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে? আরও মনে পড়ছে, একটু বড় হলে মাস্টার-মশায় বলতেন, "বসে থাকা চলবে না। অঙ্ক কষে যেতেই হবে—হয় যোগ না হয় বিয়োগ, হয় গুণ না হয় ভাগ—কিছু একটা করতেই হবে।"

এখন বুঝেছি, সংসারেও তাই। হিসেব থামিয়ে রাখবার উপায় নেই। হয় যোগ, না হয় বিয়োগ, হয় গুণ, না হয় ভাগ করে যেতেই হবে।

ভাগ্যবানরা এ-সংসারে যোগ করেন, ভাগ্যহীনরা বিয়োগ, নিতান্ত সৌভাগ্যবানদের জন্যে গুণ, আর অভাগাদের ভাগ্যে কেবলই ভাগ।

অনেক পুরনো কথা মনে পড়ছে। নিজের হিসেবের খাতায় কোনো বৃহৎ মাস্টারমশায়ের ইঙ্গিতে কখনও কেবল যোগই করেছি—খাতায় শুধু জমা পড়েছে, আবার কখনও খরচ—বিয়োগের পর বিয়োগ। গুণও আছে; আবার ভাগও আছে। এই যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের শেষে জীবন-অঙ্কের ফল কী দাঁড়াবে কে জানে? হয়তো শূন্য; কিন্তু ফল জেনে তো আর অঙ্ক কষতে বসিনি।

সুতরাং শুরু করি। এর কোন্‌টা যোগ কোন্‌টা বিয়োগ তাও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু সেটা প্রশ্নের দোষ নয়; আমার অঙ্ক না-বোঝা বুদ্ধিই সে জন্যে দায়ী।

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব গোলমাল হয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। ছেনোদার ছবিটা যেমনি মনের মধ্যে ভেসে উঠছে তেমনি হিসেবের জটিল অঙ্কটা আরও জট-পাকিয়ে যাচ্ছে—যোগের জায়গায় ভাগ, ভাগের জায়গায় গুণ করে বসছি। অতীত, সুদূর অতীত, আর এই বর্তমানকে কালানুক্রমে সাজিয়ে রাখতেও পারবো বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু হিসেবের জট-পাকালে তো চলবে না। ছেনোদার কথা যে লিখতেই হবে আমাকে। জানি, মানুষের সংসারে এর পর থেকে আমি সম্মানিতের আসন পাব না। কিন্তু আমার সযত্নসঞ্চিত সুনাম যে বেশী সুদের আশায় সন্দেহজনক ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি—সে তো ফেল হবেই।

কিন্তু গোড়া থেকেই বলি। মাস্টার মশায়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একদিন হাওড়া জেলা ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে কয়েক বছর কাটিয়ে, অনিবার্য কারণে আমাকে যে ইস্কুলে ট্রান্সফার নিতে হলো তার নাম বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন। হাওড়ার নেতাজী সুভাষ রোডে এই ইস্কুলের সেকেলে ধরনের তিন তলা বাড়ি হয়তো আপনাদের কেউ কেউ দেখে থাকবেন।

এই ইস্কুলে আমাদের থেকে কয়েক বছরের সিনিয়র ছিলেন লক্ষ্মীমাধব মণ্ডল। সবাই আমরা তাঁকে ডাকতাম ছেনোদা বলে। ছেনোদাকে দূর থেকে ইস্কুলে দেখতাম আর ভাবতাম, হায়রে, যদি আমি কোনো রকমে

ছেনোদার মতো হতে পারতাম। ছেনোদা তখন সবার হিরো। কারণ স্পোর্টসে তাঁর জুড়ি নেই। হাইজাম্পে ফার্স্ট হয়েছিলেন ছেনোদা। ৪৪০ গজ এবং দুশো কুড়ি গজ দৌড়েও ফার্স্ট প্রাইজ অন্য কারুর নিয়ে যাবার উপায় নেই। চার মাইল 'ভ্রমণ প্রতিযোগিতাতেও সেবার ডিষ্ট্রিক্টে ফার্স্ট হয়ে রূপোর চ্যালেঞ্জ কাপ পেয়েছিলেন—এতো বড়ো কাপ যে একা বয়ে আনতে পারছিলেন না। খেলাধূলা কোন দেবতার অধীনে জানি না। ছেনোদার উপর তিনি সন্তুষ্ট হওয়ায় ঈর্ষাপরায়ণা দেবী সরস্বতীর মন বিগড়ে গেল। বিবেকানন্দ ইস্কুলের ক্লাস সেভেনের স্টেশনে এসে ছেনোদার বিদ্যের ইঞ্জিন সেই যে থামলো, আর নড়লো না।

তিন বছর পর পর ফেল। শেষবারে পরীক্ষার সময় কোমরে কাগজ মুড়ে এনেছিলেন ছেনোদা। কিন্তু আমাদের হেডমাষ্টার মশায়ের চোখ একটি রাডার যন্ত্র বিশেষ। টুকতে গিয়ে তাঁরই হাতে ছেনোদা ধরা পড়ে গেলেন। প্রথমে পরীক্ষার হল থেকে এবং সময়মতো ইস্কুল থেকেও তাঁকে বিদায় নিতে হলো।

তারপর যা হয়ে থাকে তাই হলো। ছেনোদা বয়ে গেলেন। কোঁড়ার-বাগানে একটা নোংরা চায়ের দোকানে বসে তিনি বিড়ি খেতেন। সেই দোকানে অশ্লীল গালাগালিও চলতো।

খবর পেয়েছি, ঐ বয়সে ছেনোদা নাকি গাঁজাও ধরেছিলেন। ইস্কুল যাবার পথে চায়ের দোকানের সামনে ছেনোদার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা হয়ে যেতো। আমাকে তিনি ডেকেছেন—"এই শোন।"

আমরা ভাল ছাত্র, ঐরকম বিড়িখাওয়া ছেলের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যেতো। ছেনোদা অবশ্য খুবই ভদ্র ভাবে কথা বলতেন: "মাস্টারমশায়রা সব ভালো আছেন তো? এবার চার মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় কে ফাস্ট হলো?" ছেনোদা জানতেন আমি ভাল ছেলে। তাই কোনো গালাগালি করতেন না। তবু আমার ভয় হতো, কেউ যদি দেখে ফেলে। ভাববে, আমি খারাপ হয়ে গিয়েছি, না হয় উচ্ছন্নে যাবার পথে পা বাড়িয়েছি।

এরপর ছেনোদা আমাকে বিশেষ ডাকতেন না। হয়তো আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ আমাকে তিনি

ডেকে বসলেন। নোংরা হাফ্‌প্যাণ্ট পরে ছেনোদা বিড়ি টানছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, "এই শোন।"

সেবার স্কুল ম্যাগাজিনে আমার একটা লেখা বেরিয়েছিল। ছেনোদা বেশ কিছুক্ষণ সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁরে, তুই গল্প লিখিস?"

আমি গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লাম। ছেনোদার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। প্রশ্ন করেছিলেন, "কী ক'রে গল্প লিখিস রে?"

ভারিক্কী চালে উত্তর দিয়েছিলাম, "বানিয়ে।"

ছেনোদা আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। "মাথার মধ্যে বুঝি গল্প এসে যায়? আচ্ছা, রবিঠাকুরও তো ঐভাবেই লিখতেন?" ছেনোদা জানতে চেয়েছিলেন।

আমি বিজ্ঞের মতো মৃদু হেসে সায় দিয়েছিলাম এবং এমন একটা ভাব দেখিয়েছিলাম যে, ছেনোদার বুঝতে কষ্ট হয়নি, আমি ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই লেখক, এবং আমরা দু'জনেই মাথা খাটিয়ে লিখি! আর সেইজন্যেই বোধহয় ছেনোদা তখন থেকেই আমার সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা করে বসেছিলেন। দেখা হলেই কথা বলতে চাইতেন। আবার কখনও নিজেই সাবধান করে দিতেন, "আমাদের সঙ্গে মিশবি না—আমাদের রেকর্ড খারাপ। দিনরাত পড়াশুনা নিয়ে থাকবি, আর মাথা খাটিয়ে লিখে যাবি।"

এই ভাবে হয়তো আরও অনেক দিন চলতো। কিন্তু ছেনোদা অন্য কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। আর আমিও আগ্রহ করে তেমন খোঁজ নিইনি, বরং তাঁর হাত থেকে বাঁচতে পেরে আশ্বস্ত হয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ম্যাগাজিনে আমার আরও লেখা বেরিয়েছে; ভালো ছেলে বলে আমার সুনাম আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সেই সৌভাগ্যের জোয়ারে অবাঞ্ছিত ছেনোদা আরও দূরে সরে গিয়েছেন।

কিন্তু অনেকদিন পরে ছেনোদাকে আবার আমার প্রয়োজন হলো। বাবা তখন অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মফঃস্বল আদালতের আইনজীবী, দৈনন্দিন অন্নবস্ত্রের সংগ্রামেই ব্যস্ত থাকতেন, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করবার সুযোগ পাননি। আমার বড়ই দুর্দিন। পয়সার অভাবে পড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরির উমেদারি করে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু কোথায় চাকরি? শুনেছিলাম টাকা ফেললে কলকাতা শহরে বাঘের দুধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তাই বাবার দেওয়া ছোটবেলাকার সোনার আংটি এবং বোতাম বিক্রি করে কিছু টাকাও জোগাড় করে রেখেছিলাম। একশ টাকা সেলামী দিয়ে আমার এক নিকট আত্মীয় এক সরকারী প্রতিষ্ঠানে লোয়ার ডিভিশন কেরাণীর চাকরি পেয়েছিলেন। আমার ধ্রুবতারাস্বরূপ সেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, "ক্যাশ জোগাড় রেখো, কখন সুযোগ এসে যাবে, তখন টাকা না থাকলে সারা জন্ম আফসোস করে মরবে।" আমার টাকা রেডি, কিন্তু কোথায় চাকরি?

শেষে টাইপ শিখতে আরম্ভ করলাম। কত তাড়াতাড়ি ঐ বিদ্যেটি রপ্ত করা যায় এই চেষ্টা। কিন্তু সেখানেও বাধা। টাইপ ইস্কুলের মালিক ভবতারণবাবু খালি গায়ে, ঘড়ি হাতে শিকারী কুকুরের মতো মেসিন পাহারা দিচ্ছেন। শেখাবার জন্যে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই; তিনি নজর রাখছেন কেউ আধঘণ্টার বেশী টাইপ করছে কিনা। আধঘণ্টাও তিনি ধৈর্য ধরে বসতে পারেন না। পঁচিশ মিনিট হলেই চিৎকার করে বলতেন, "রেমিংটন তিন নম্বর, ফাইভ মিনিট্স্ মোর।" পাছে কেউ বা বেশী শিখে ফেলে, সেই জন্যই কড়া নজর।

এক একজন ছাত্র নাছোড়বান্দা ছিল। জোর করে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত তারা টাইপ করে যেত। ভবতারণবাবু বলতেন, "এই আগ্রহটা ম্যাট্রিকের সময় দেখালেই পারতে। স্কলারশিপ পেয়ে আই-সি-এস, বি-সি-এস হতে পারতে—এই বাক্স বাজানোর লাইনে আসতে হতো না।"

এর মধ্যেই লোকজনকে বলেছি, "টাইপিস্টের চাকরির খবর পেলে একটু দেখবেন। চল্লিশ স্পিড হয়েছে।"

স্পিডের বহর শুনে কেউ কেউ আঁতকে উঠেছেন: "সে রামরাজত্ব আর নেই ভায়া। চল্লিশ স্পিডে ডবকা মেমসায়েবরা ছাড়া কেউ চাকরি পায় না। আমাদের অফিসের আয়ার ছোকরা তো হাসতে হাসতে পঁচাত্তর স্পিডে টাইপ করে। ছোকরা পাঁচটার পর একঘণ্টা একস্ট্রা প্র্যাকটিশ করে—একশ স্পিড হলো বলে।"

দু'চার জন তো আমাকে দেখলেই অন্য দিক দিয়ে চলে যেতেন। ভাবতেন, এখনই হয়তো চাকরির জন্যে ঘ্যানর-ঘ্যানর আরম্ভ করবো।

রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে একটা ধনদা কবচ কিনবো কিনা। বিজ্ঞাপনে লিখেছে বেকারের নিশ্চিত চাকরিপ্রাপ্তি! তবে দ্রুত ফল পেতে হলে আণবিক শক্তিসম্পন্ন ধনদা একস্ট্রা স্ট্রং কবচ। দাম কিন্তু অনেক বেশী—১৭২ টাকা। অত টাকা আমি কোথায় পাবো?

এমন সময় একদিন ছেনোদাকে দেখতে পেলাম। সাদা হাফসার্ট, খাকী হাফপ্যাণ্ট, কালো জুতো আর সবুজ মোজা পরে ছেনোদা চলেছেন। হাতে একটা কালো রঙের চৌকো চামড়ার ব্যাগ। আমাকে দেখেই ছেনোদা থেমে গেলেন। কাছে এসে বললেন, "হ্যাঁরে, নতুন গল্প কী লিখলি?"

বললাম, "কিছুই লিখিনি।"

কিন্তু আমার উত্তরে ছেনোদা নিরাশ হলেন না। বললেন, "রবিঠাকুরও তো মাঝে মাঝে কিছু না লিখে চুপচাপ বসে থাকতেন। কবি, শিল্পী, লেখকদের ঐ মুশকিল। কখন সরস্বতী দয়া করবেন তার জন্যে বুড়ো আঙুলটি মুখে গুঁজে চুপচাপ বসে থাকো। আমাদের কিন্তু ওসব নেই। শ্লা, যখন ক্ষিদে পাবে তখন ঠিক যেমন করেই হোক টাকা কামিয়ে পেট ভরাবো।"

কথার উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ছেনোদার কালো ব্যাগটার উপর নজর পড়ল। সাদা রঙ দিয়ে লেখা—গ্রেট ইণ্ডিয়ান টাইপরাইটার লিমিটেড। ছেনোদা চলে যাচ্ছিলেন। আমি হঠাৎ ডাকলাম, "ছেনোদা।"

চমকে পিছন ফিরে ছেনোদা আমার কাছে ফিরে এলেন। উত্তেজনায় আমার তখন ঠোঁট কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এতোদিন তবু ভদ্রলোকের কাছে চাকরির জন্য বলেছি। এবার বস্তির লোকদেরও ধরতে হবে। ছেনোদা বললেন, "আমাকে ডাকছিস? কিছু বলবি?"

"ছেনোদা, আপনি টাইপের কাজ করেন?"

"হ্যাঁ, আমি তো মেকানিক!"

লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, "আমি টাইপ করতে শিখেছি ছেনোদা।"

ছেনোদা যেন চমকে উঠলেন। বললেন, "তুই কেন এ লাইনে আসবি? রবিঠাকুর কি টাইপ করতেন?"

আমি উত্তর দিতে পারিনি। চোখ দিয়ে জল পড়তে আরম্ভ করেছে। ছেনোদা বুঝতে পারলেন। চাকরি না হলে আমাকে যে না খেতে পেয়ে মরতে হবে, তাও বুঝলেন। পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, "ঘাবড়াস না, তোর চাকরি আমি দেবো। কত জায়গাতেই তো মেসিন সারাতে যাই।"

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় দু'জনের আবার দেখা হয়েছে। ছেনোদা চায়ের দোকানে বসে ঘোড়ার আলোচনা করছিলেন। আমাকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে ডাকলেন। বললেন, "চা বিস্কুট খা।" লজ্জা পেয়ে বলেছি, "এসব কেন ছেনোদা? আমার চাকরির চেষ্টা করছেন এই যথেষ্ট।"

ছেনোদা বলেছেন "খেয়ে নে। না খেলে গল্প লেখার মাথা খুলবে না। ভালো ছেলেদের মগজ সাফ রাখার জন্য কত কি খাওয়া দরকার। তা তোর চাকরির জন্যে বহু জায়গায় বলে রেখেছি। তুই বরং কাল আমার সঙ্গে বেরো: সঙ্গে করে পার্টিদের কাছে নিয়ে যাবো।"

পরের দিন সকালে আমার নতুন জীবন শুরু হলো। ৯৫ নম্বর কোঁড়ারবাগান লেনে হিন্দুস্থানী বস্তির একটা অন্ধকার ঘরে ছেনোদা থাকেন। ছেনোদার কার্ডখানার দিকে নজর পড়লো—

Great Indian Typewriter, Ltd.
Factory & Head Office:
95, Korar Bagan Lane, Howrah
City Office:
167, Swallow Lane
Phone:

ছেনোদা আমার ভাব দেখে হেসে ফেললেন। নিজের ব্যাগটা দেখিয়ে বললেন, "অফিসের নামটা দেখে ঘাবড়ে যাস না। আসলে এই ব্যাগটাই আমার ফ্যাক্টরি। এইটাই আমার সিটি অফিস, এইটাই আমার হেড আপিস। কার্ড না থাকলে পার্টি বিগড়ে যায়, ভাবে বাজে লোক।"

বাস এবং ট্রামে চড়ে আমরা যখন কলকাতার অফিস পাড়ায় হাজির হলাম, তখন প্রায় বেলা এগারোটা। কিন্তু কোথায় গ্রেট ইণ্ডিয়ান টাইপ-রাইটার কোম্পানি? একটা পুরনো টাইপরাইটারের ছোট্ট দোকান দেখা

যাচ্ছে বটে, কিন্তু কোনো নাম লেখা নেই। আর দোকানের সামনে রাস্তার ওপর খানকয়েক বেঞ্চি পাতা। সেখানে জন কয়েক লোক বসে আছেন। তাঁদের সকলের হাতেই ছেনোদার মত একটা চামড়ার ব্যাগ।

ছেনোদাকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন। রোগা রোগা চেহারা লোকগুলোর। অনেকেই হাফপ্যাণ্ট পরেছেন। দু'একজন পরেছেন আধ-ময়লা ধুতি আর রংওঠা নিউকাট জুতো। রেমিংটন রিবনের কৌটো থেকে বিড়ি বার করে আগুন দিতে দিতে একজন বললেন, "এই যে বাবা, আসুন।"

ছেনোদা কিন্তু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "তোমাদের আমি মাইরি সাবধান করে দিতে চাই। মুখ দিয়ে যদি আর খারাপ কথা বেরোয় তাহলে একটি ঘুঁষিতে মুখের জিওগ্রাফী পাল্টে দেবো।" ছেনোদা এবার আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। "এ আমার ছোট ভাই-এর মতো। তোমাদের মতো বিশ্ববখাটে নয়। খুব ভালো ছেলে। এর লেখা পদ্য, গল্প কাগজে ছাপা হয়।"

ভদ্রলোকরা এবার সত্যিই বেশ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

যে ভদ্রলোক প্রথমে মুখ খুলেছিলেন তিনি বললেন, "কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনার দাদার সঙ্গে 'বাবা' সম্পর্ক পাতিয়েছি। অনেকদিনের বদ অভ্যাস। দু' একবার ভুল হয়ে যেতে পারে।"

দোকানের মধ্যে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর গায়ে একটা তেল-চিটে গেঞ্জী। চোখের চশমার একটা ডাঁটি নেই, সুতো দিয়ে বাঁধা। কাঁচের আলমারির মধ্যে নানা সাইজের যন্ত্রপাতি। ছেনোদা বললেন, "পাঁচুদা, কেন মাইরি ল্যাজে খেলাচ্ছো, একটা এসকেপমেণ্ট হুইল দাও। পার্টিটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

পাঁচুদা পান চিবোতে চিবোতে বললেন, "চোদ্দ নম্বর রেমিংটন তো? কোম্পানির মাল নাও, আনিয়ে দিচ্ছি।"

বেঞ্চির এক ভদ্রলোক এবার ফোড়ন কাটলেন, "আর সতীপনা করতে হবে না। কোম্পানির ঘরের মাল বেচে উনি মাগের জন্যে শাড়ি-গয়না কিনছেন। কোম্পানির ঘরে মাল কিনে মেসিন সারতে হলে আমাদের আর করে খেতে হবে না।"

আন্দাজে বুঝলাম সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মালের স্টক এখানে। পাঁচুবাবু মিটমিট করে হেসে বললেন, "যাক, একটা মাল যেখান থেকে হয় দিয়ে দেবো। কিন্তু পুরো দশটি টাকা লাগবে।"

"এই জন্যেই তো তোমার বৌ পালালো। ঘরের লোকের সঙ্গে পর্যন্ত কাবলের মত ব্যবহার করবে? পাঁচসিকের মাল কিনা দশ টাকায় ঝাড়তে চাইছো।"

ওঁদের কথা চলতে লাগলো। আমি বেঞ্চিতে এসে চুপচাপ বসে রইলাম। এক ভদ্রলোক বললেন, "দুনিয়ার যতো টাইপ মেকানিককে এখানে আসতে হয়। আমরা সবাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি—রেমিংটন বা আণ্ডারউড-এ মাস মাইনের চাকরি নয়।"

পাঁচুবাবুর কাছ থেকে পার্টস কিনে ছেনোদা বেঞ্চিতে এসে বসলেন। এ-রাজত্বে ছেনোদার দোর্দণ্ড প্রতাপ। সব মেকানিক ওঁকে ভয় করেন। বেঞ্চিতে ততক্ষণ জন সতেরো মেকানিক এসে বসেছেন। ছেনোদা বললেন, "দেখো, আমার এই ছোট ভাই-এর একটা চাকরি দরকার। টাইপ শিখেছে! শ্লা, আমি সাত দিনের সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যেখানে পারো ঢুকিয়ে দিতে হবে। না হলে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে বলে রাখছি।"

নোংরা জামাকাপড় পরা লোকগুলোর কেউ কিন্তু রাগ করলেন না। একজন বললেন, "আমাদের কাছে যে-ব্যাটারা মেসিন সারায় তারা কি মানুষ? এক একটি ছারপোকা! চাকরি হলেও রক্ত শুষে নেবে।"

ছেনোদা রেগে উঠলেন। বললেন, "রাজকেষ্ট, বাত পরে মারবি। এখন একটা খারাপ চাকরিই জোগাড় কর। আমার ভাই তো আর তোদের মতো হর্স পেজ নয়। পেটে সামথিং হ্যাজ।"

ছেনোদা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এক আপিসে অয়েলিং ক্লিনিংয়ের কাজ ছিল। আমার হাতে ব্যাগটা দিয়ে ছেনোদা কাজ আরম্ভ করলেন। আমি দেখতে লাগলাম। কাজের মধ্যেই ছেনোদা আমার চাকরির চেষ্টা করলেন। কিন্তু যার পাথর চাপা কপাল, অন্য লোকে তার কী করবে?

কাজ শেষ করে দুটো টাকা পকেটে পুরে ছেনোদা মেসিনের মালিককে

বললেন, "মেসিনটা একবার ওভারহল করিয়ে নিন, আবার দশ বছর হেসে খেলে চলে যাবে।"

মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, "কণ্ডিশান কেমন আছে?"

"কণ্ডিশান! এ সব বনেদী জিনিস। পুরনো চাল ভাতে বাড়ে স্যার। আজকালকার যে-সব মডেল, সে-সব ঠিক আজকালকার মেয়েদের মতো। দেখতেই ছিমছাম ফিটফাট—কিন্তু কোনো কাজের নয়। ব্রেকডাউন লেগেই আছে।"

মালিক মিষ্টি কথায় ভিজলেন না। বললেন, "আরও মাসখানেক দেখি।"

তখন প্রায় একটা বাজে। আমাকে নিয়ে ছেনোদা সোজা খাবারের দোকানে ঢুকলেন। প্রায় বারো আনার মতো খাইয়ে দিলেন আমাকে। আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছেনোদার ঐ এক যুক্তি, "ভাল ছেলেদের খাওয়া দরকার। তবে তো মাথা খুলবে। তবে তো গল্প, পদ্য এইসব লিখতে পারবি।"

টাইপরাইটারের বিচিত্র জগতের সঙ্গে আমি ক্রমশঃ পরিচিত হয়ে উঠেছিলাম। আণ্ডারউডের ডগ কাষ্টিং যে স্মিথ করোনাতে লাগবে না, কিন্তু স্মিথের টাইপবার কুশন যে অনায়াসেই ইম্পিরিয়াল মেসিনে ফিট করা যাবে, তা আমিও একদিন জেনে ফেললাম। কিন্তু চাকরি আর হয় না।

সবাই ফিরে আসেন। বলেন, "কিছুতেই সুবিধে হচ্ছে না।"

ছেনোদা সেই কথা শুনে বেজায় রেগে ওঠেন। বলেন, "পিঁয়াজি ছাড়ো। আরও তিনদিন সময় দিলুম। এর মধ্যে যদি কাজ না হয় তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের রোজ এক আনা ফাইন দিতে হবে। ট্যাঁকের কড়ি খরচ হলে তবে যদি তোমাদের গতর নড়ে।"

এরপর ছেনোদা অশ্লীল গালাগালি দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে চুপ করে গেলেন। আমি ছেনোদাকে বলেছি, "কতদিন আর আমার জন্য পয়সা নষ্ট করবেন?"

"আমি তো নষ্ট করছি না। তুই রোজগার করছিস। এই যে আমার সঙ্গে আপিসে যাচ্ছিস, আমাকে সাহায্য করছিস; এর কোনো দাম নেই?"

সাহায্য তো খুব করছি। পার্টির কাছে ছেনোদা আমাকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বলে পরিচয় করিয়ে দেন। মেসিনে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বলেন, "টেক ডাউন"। আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে রবার স্ট্যাম্পমারা প্যাড বার করে এষ্টিমেট লিখি—ওয়ান ক্যারেজ স্ট্র্যাপ—৮, ওয়ান ডগ কাস্টিং—৪০; সার্ভিস—৫। মোট—৫৩।

খদ্দের সেই হিসেব দেখে চমকে ওঠে, "এতো টাকা!"

আমি বলি, "না স্যার, এই আমাদের ইউজুয়াল চার্জ। কিন্তু আপনি রেগুলার কাস্টমার, আপনার অনারে দশ টাকা রিবেট।"

ছেনোদা কাগজখানার উপর বিরাট লম্বা সই বসিয়ে দেন—এল মণ্ডল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তারপর বললেন, "আমরা ব্যাগহাতে করে ঘুরে বেড়াই তাই। কোম্পানীর ঘরে মেসিনটা একবার পাঠিয়ে দেখবেন স্যার। রিপেয়ার তো দূরের কথা, শুধু ইনস্‌পেকশন চার্জই নিয়ে নেবে পঞ্চাশ টাকা।"

"কোম্পানির কাজ আর আপনাদের কাজ?" খদ্দের বললেন।

"কোম্পানির মিস্ত্রিদের হাত দুটো কি আর সোনা দিয়ে বাঁধানো আছে স্যার? আমারই মতো কোন হতভাগা মেসিন সারবে; কিন্তু সই করবে কোট-প্যাণ্ট-টাই পরা রাঙা সায়েব। তাদের মাইনেটা কোত্থেকে আসবে স্যার—এই আপনাদের ঘাড় দিয়েই তো?"

খদ্দের একটু ভিজছে দেখে ছেনোদা আরও বললেন, "কোম্পানির কাজও তো দেখছি স্যার। মেসিন সেরে যেদিন ফিরলো, সেদিনই খারাপ হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয় ঠিকানা দিয়ে দিতে পারি। এখন কোম্পানি ছেড়ে আমাকে কাজ দিচ্ছে? যা-তা জিনিস নয় স্যার—মেমসায়েব টাইপিস্ট।"

খদ্দের বললেন, "তাই বুঝি?"

ছেনোদা বললেন, "মেমসায়েব আমার কাজে খুব খুশী। তিনি বলেন, মিস্টার মাণ্ডল্ তোমার টাচ্‌টা—আহা যেন ফেদার টাচ্। ওরা কী-বোর্ডের টাচের মূল্য বোঝে। সরু সরু আঙুল তো, হাতুড়ী পেটার মতো টাইপ করতে পারে না।"

খদ্দের বললেন, "বটে?"

ছেনোদা নিবেদন করলেন, "লোক ভাল করে মেসিন সারায় কেন? ওই

জন্যেই তো, শুধু চিঠি ভাল হবে তা নয়—প্রোডাকশন বেড়ে যাবে। একটি লোক দুটো টাইপিস্টের কাজ করবে।"

ছেনোদা এবার নিজের প্রসঙ্গ তুললেন। "তাহলে এস্টিমেটটা একটু দেখবেন নাকি?"

"না, রেখে যান, পরে জানাবো।"

এই রকম কত এস্টিমেটই তো তৈরি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্ডার আসে কটা? দোকানের পাঁচুবাবু বলেন, "এই কারবারের এই হাল। মেকানিকরা তবু অয়েলিং ক্লিনিং করে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। আমি তো শুধু পার্টস নিয়ে চুপচাপ বসে আছি, আর মাছি তাড়াচ্ছি।"

সত্যি এ এক অদ্ভুত জগৎ। হাসি-ঠাট্টা, গালাগালির মধ্যে দিন কাটছে বটে, কিন্তু বিকেল বেলায় বাজার করবার টাকা রোজগার হবে কিনা তাও কেউ জানে না। আবার হয়তো কোনোদিন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মেসিনের দালালী করে কুড়ি টাকা জুটে গেল। অন্য সঙ্গীরা সে খবর পেলে হয়। সবাই এক সঙ্গে ছেঁকে ধরবে। বলবে, "হ্যাঁরে ঋষে, ওই বুড়ী মেসিন দুশো টাকায় বিক্রি করলি কী করে? ওকে কি নবযৌবন বটিকা খাইয়েছিলি?"

ঋষিবাবু মাথা নাড়লেন। "সাজাতে জানলে সব বুড়ীকেই ছুঁড়ী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। বাইরেটা কোনো রকমে চক্‌চকে করে দাও। তাতেই বোকা খদ্দের খুশী—ভিতর নিয়ে তারা একটুও মাথা ঘামায় না।"

একজন ফোড়ন কাটলে, "বুড়ী যখন বেঁকে বসবে, তখন বুঝবে।"

ঋষিবাবু উত্তর দিলেন, "তাতে তোরই কী, আমারই কী? ডাক পড়লে সেরে দেবো, আবার বিল করবো।"

এঁরা সবাই সংসারী লোক। চিন্তার শেষ নেই। একজন বললেন, "কী দিন-কালই যে পড়লো।"

ছেনোদার সংসার নেই। কিন্তু অভাব আছে। তবু মুখ ফুটে বলেন না। আমি আবার তাঁর ঘাড়ে চেপেছি। কিন্তু আমার যে উপায় নেই। পৃথিবীতে এতো মানুষ থাকতে ছেনোদা আমাকে ভালবাসেন কেন বুঝতে পারি না। সে আমার স্বভাবের জন্য নয়, সে আমার দারিদ্র্যের জন্যও নয়। সে আমার লেখার জন্য। কবে হঠাৎ একটা লেখা ইস্কুলের ম্যাগাজিনে লিখেছিলাম। ছেনোদা সেটা পড়েনও নি, শুধু হয়তো দেখেছিলেন।

তাতেই উজাড় করে ভালবাসা ঢেলে দিলেন। আর তারই সুযোগে দিনের পর দিন এই সোয়ালো লেনের দোকানে বসে তাঁর ঘাড়ে খাওয়া দাওয়া করছি।

আমাকে পাঁচুবাবুর দোকানে বসিয়ে রেখে ছেনোদা একদিন বেরিয়ে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যেতে পাঁচুবাবু ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হাসতে লাগলেন।

একজন বললেন, "ছেনোবাবু গেলেন কোথায় ?"

পাঁচুবাবু বললেন, "বুঝতেই পারছো। আজ মাসের সাত তারিখ।"

ঋষিবাবু বললেন, "ভাগ্য! না হলে শ্লা এমন পার্টি পাবে কেন ?"

পাঁচুবাবু বললেন, "তোমাদের পোড়া কপাল—তোমরা চিরকাল টাইপিস্ট বাবুদের মেসিন পরিষ্কার করেই মরবে।"

"যা বলেছেন দাদা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর ময়লা শার্ট পরে টাইপিস্ট বাবু বসে আছেন। অথচ ছেনোর ভাগ্যে কেমন মেমসায়েব।" আর একজন বললে।

পাঁচুবাবুর আগ্রহ একটু বেশী। বললেন, "এই মেমসাহেবকে দেখেছিস ?"

"দেখিনি মানে ? ঠিক যেন মাইরি পোলসনের মাখন দিয়ে তৈরি। তার উপর কে যেন আবার পোয়াখানেক গোলাপ জল ছড়িয়ে দিয়েছে। সেবার যখন ছেনোর পেটের অসুখ করেছিল, আমি তো সারাতে গিয়েছিলাম। মাইরি মেসিন সারবো কি, নাকে শুধু ভুর ভুর করে গোলাপের গন্ধ ভেসে আসছে। আহা-হা দেখলে যেন প্রাণটা জুড়িয়ে যায়।"

একজন বললে, "সেই জন্যেই তো তুমি সেবার দেড়ঘণ্টা ধরে মেসিন পরিষ্কার করেছিলে।"

"মিথ্যে কথা বলিসনি, মাইরি, ঠিক একঘণ্টা ছিলাম। তবে কিনা উঠে আসতে ইচ্ছে করে না। আর আমি যতক্ষণ সারছি, মেমসায়েব পাশের চেয়ারে বসে, হাঁ করে দেখছিল। হঠাৎ দেখি ঘাড় দুলিয়ে গুণ-গুণ করে গান গাইছে। তারপর মাইরি, ছুকরী হাতের নোখ কাটলে, ব্যাগ থেকে আয়না বার করে চুল আঁচড়ালে, ঠোঁটে সিঁদুর লাগালে!"

"বে থা করেছে নাকি ?"

"কে জানে বাপু। তবে কেমনতর যেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলে

'তুমি এসেছ কেন ? হোয়ার ইজ মিস্টার মাণ্ডল্ ?' ভাবলুম একবার বলেই দিই, 'তোমার মিস্টার মণ্ডলের পেটের গণ্ডগোল হয়েছে—হি ইজ লিকিং।' তারপর ভাবলুম, কী দরকার আমার। শেষে ছেনোটা হয়তো চটে যাবে। তাই বললুম, জ্বর হয়েছে।"

"বাঃ খাশা বুদ্ধিখানা তোর," আর একজন বললেন।

ঋষিবাবু বললেন, সেই না "শুনে মেমসায়েবের কি আদিখ্যেতা। দু তিন বার চু চু করলে। তারপর বললে, "ও আই অ্যাম সো স্যরি।"

পাঁচুবাবু বললেন, "কেন রে বাপু, তোর অত স্যরি হবার দরকার কি ? তোর মেসিন ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে, বিলের পয়সা নিয়ে চলে আসবো। মেকানিকের হাঁড়ির খবর নিয়ে কী করবি ?"

ওঁদের নজরটা এবার আমার উপর গিয়ে পড়লো। একটু ভয়ও পেয়ে গেলেন। পাঁচুবাবু ঢোক গিলে বললেন, 'আমরা মশাই নিজেদের মধ্যে একটু খিস্তি খেউর করি—আপনার দাদাকে যেন বলবেন না। উনি যা লোক, হয়তো খুন জখম করে বসবেন।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "বেশ।"

সাহস পেয়ে ঋষিবাবু বললেন, "তবে সেই শেষ। ছেনোটা আর কখনও আমাদের পাঠালে না। অথচ এখনও মনটা কেমন কুর-কুর করে ওঠে।"

পাঁচুবাবু বললেন, "বটে !"

ঋষিবাবু বললেন, "এমনও প্রপোজাল দিলাম, বিলের টাকা তুই নিস, আমি শুধু কাজটা করে দিয়ে আসি। মাইরি তাতেও রাজী নয়।"

"এখন উল্টে একটা টাকার লোভ দেখাও তাতে যদি ফল হয়।"

"তা মাইরি যা জিনিস, তাতেও আমার আপত্তি নেই। কোথায় লাগে তোর ইংরেজী বই-এর এস্টারদের।"

হয়তো আরও কথা হতো, কিন্তু একজন সাবধান করে দিলে ছেনোদা আসছেন। ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ফিউজ হয়ে গেলেন। আমাকে ইশারায় পাঁচুবাবু নীরব থাকবার প্রতিশ্রুতিটা মনে করিয়ে দিলেন।

ছেনোদা এসে বেঞ্চিতে বসলেন। অন্য মেকানিকরাও ক্রমশঃ সেখানে জড়ো হলেন। ছেনোদা বললেন, "তাহলে শ্লা তোমরা আমার ভাই-এর চাকরির জন্যে কিছুই করোনি। বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গিয়েছে, আজ

তাহলে ফাইন দাও। ন্যাপা, প্রত্যেকের কাছ থেকে এক আনা করে কলেক্ট করো।"

যেমন হুকুম, তেমন কাজ। ন্যাপা ফাইন আদায় করতে আরম্ভ করলো। আর সবাই দেখলাম বিনা প্রতিবাদে ন্যাপার হাতে এক আনা করে দিতে লাগল। ছেনোদা চার আনা দিলেন। "তা হলে টোটাল কত হলো?"

ন্যাপা বললে, "একটাকা চার আনা।"

"গুড," ছেনোদা বললেন।

বাড়ি ফেরার পথে হাওড়া স্টেশনে ছেনোদা পয়সাটা আমার হাতে দিলেন! আমার খুবই লজ্জা করছিল। কিন্তু ছেনোদা প্রচণ্ড এক বকুনি দিলেন।

টাইপপাড়ায় প্রায় রোজই যাতায়াত আরম্ভ করেছি। পাঁচুবাবুর কাছে আমাকে বসিয়ে রেখে ছেনোদা আবার বেরিয়ে গিয়েছেন।

সেদিন বিকেলের দিকে বেশী লোকজন ছিল না। পাঁচুবাবু শুধু একটা টাইপবুরুশের পিছন দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিলেন। পার্টির কাছ থেকে ঘুরে ঋষিবাবু এবার দোকানে এসে হাজির হলেন।

ঋষিবাবু কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "পাঁচুদা, কিছু ক্যাশ চাই। বউ-এর পেটে যেটি এসেচে নষ্ট হবে মনে হচ্ছে। দু'দিন তো হোমিওপ্যাথিক বড়ি দিলুম—কিন্তু কিছু সুফল দেখছি না।"

"নষ্ট হওয়াই ভাল। মরে বাঁচবে," পাঁচুদা বললেন।

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু এখন তো উদ্ধার পাওয়া দরকার। ডাক্তার না ডাকলে গাই-বাছুর দুই-ই যাবে। কিছু টাকা···।"

পাঁচুদার চোখদুটো এবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললেন, "সকালে কী মন্তর দিয়েছিলুম? ছিপে উঠলো কিছু?"

ঋষিবাবু তাঁর কাছে সরে গিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, "না উঠিয়ে উপায় ছিল না। তবে ন্যায্য দাম দিও।"

পাঁচুবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দু'জনে কি সব কথাবার্তা হলো। তারপর ঋষিবাবু শার্টের পকেট থেকে কাগজে মোড়া একটা জিনিস বার

করে পাঁচুবাবুর হাতে দিলেন। পাঁচুবাবু একখানা পাঁচটাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বললেন, "পাকা জরুরী।"

পাঁচুবাবু এবার আমার দিকে নজর দিলেন। বললেন, "ছেনোটা তো ডাকসাইটে গুণ্ডা, কিছু বলতে সাহস হয় না। রোজ এক আনা করে ফাইন আদায় করছে। সেই ফাইনের টাকা রোজ পাঁচসিকে তোমাকে দেবে, যতদিন না চাকরি হয়।" পাঁচুবাবু একটু থামলেন। তারপর তীব্র ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "তুমি কি ব্যাটাছেলে, না মেয়েমানুষ?"

আমি চমকে উঠেছি। পাঁচুবাবু তেড়ে উঠলেন। "লজ্জা করে না পরের কাছে ভিক্ষা নিতে? কেন, এই যে এতো জায়গায় টাইপের এস্টিমেট দিতে যাও—কাজ বাগিয়ে আসতে পারো না? ব্যাটাছেলে, মরদ! দুটো ফিড রোলারের দাম কত জানো?"

সেদিনের কথা ভাবলে আজও আমার মনে হয়, পাঁচুবাবু ঠিকই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ঠিকই আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। আজও কেউ যখন আমার প্রশংসা করে, প্রথমে খুব ভাল লাগে, বেশ মিষ্টি লাগে। কিন্তু তারপরই কেমন ভয় করতে থাকে। যদি আমাকে কেউ চিনে ফেলে? যদি আমার আর ছেনোদার শেষ অধ্যায়টুকু কেউ প্রকাশ করে দেয়!

চোখের সামনে দেখছি, ময়লা ছেঁড়া শার্ট পরে রাস্তার উপর একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে আছি। একটু পরে ছেনোদা ফিরে এলেন। সবার কাছ থেকে এক আনা ফাইন আদায় করলেন। তারপর ফেরার পথে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফাইনের পয়সাগুলো আমাকে দিলেন। আমার তখন ঘেন্নায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। ছেনোদা বললেন, "ছিঃ, তুই না গল্প লিখিস? তুই এখনি বাড়ি যা। কাল সকাল সকাল রেডি হয়ে থাকবি। চন্দননগরে একটা মেসিন দেখতে যাবো।"

পরের দিন হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠে বসেছি আমরা। ছেনোদা সব সময়ই আমার কাছে ছোট হয়ে থাকতেন। আমি যে ভাল ছেলে, আমার মুখ দিয়ে ভুলেও যে একটা খারাপ কথা বেরোয় না। আমি তো আর পরীক্ষার হলে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়িনি। কোনোদিন ভুলেও আমি কারুর খাতার দিকে তাকাইনি পর্যন্ত। চুরি করিনি, অন্য কাউকেও চুরি করতে সাহায্য করিনি।

ছেনোদা বললেন, "দোকানে ওইসব অসভ্য লোকগুলোর সঙ্গে বসে থাকতে তোর কষ্ট হয়, তাই না ?"

"না"—আমি উত্তর দিলাম।

চন্দননগরে আমরা একটা বিশাল বাড়ির সামনে হাজির হলাম। বাড়ির মালিক নামকরা মাড়োয়ারী ব্যবসাদার। তাঁরই ঘরের টাইপ-রাইটার।

শেঠজী তখন গেঞ্জী পরে হনুমানজীর ছবির সামনে মাথা ঠুকছিলেন। শেঠগিন্নী আমাদের বসতে দিলেন। চাকর টাইপরাইটার মেসিনটা আমাদের সামনে টেবিলে বসিয়ে দিয়ে গেল। শেঠজী এসে জানালেন, সেই মেসিনটা খুব পয়া। ভাঙা লোহার সামান্য দোকান থেকে আজ যে তিনি বাড়ি, গাড়ি, মিল করেছেন তার যত চিঠিপত্তর সব ঐ মেসিন থেকেই বেরিয়েছে।

ছেনোদাও অভিজ্ঞ শিকারীর মতো মেসিনটা একটু নেড়েচেড়ে বললেন, "একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। একটু রিপেয়ার করে নিলে নতুনের মতো কাজ দেবে। লছমী মাইয়া এবং ভগবতী মাইয়ার মতো মেসিনও সেবা পেলে সন্তুষ্ট হয়।"

ব্যাগ খুলে যন্ত্রপাতি বার করলাম। বিশেষ যত্নের সঙ্গে ছেনোদা ক্যারেজটা আস্তে আস্তে খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। অভিজ্ঞ চোখে তিনি এবার ঐ ধুলোপড়া বৃদ্ধা মেসিনের যৌবন রহস্য খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। আমিও দেখছি এক মনে। ছেনোদা মেসিনের দিকে চোখ রেখেই বললে, "টেক ডাউন।" প্যাড বার করে, একটা কার্বন লাগিয়ে টুকতে লাগলাম—ওয়ান ক্যারেজ ষ্ট্র্যাপ···ওয়ান এসকেপমেণ্ট হুইল···।

মাড়োয়ারী বললেন, "বুড়ীকে একেবারে ছুকরী বানিয়ে দিতে হবে।"

কালিঝুলিমাখা হাত দু'খানা ময়লা ঝাড়নে মুছতে মুছতে ছেনোদা হিসেব করতে লাগলেন। আর আমি মেসিনের মধ্যে একটা কাগজ চাপিয়ে টাইপের নমুনা নিতে লাগলাম। ছেনোদা বললেন, "শেঠজী, তিরিশ টাকা লাগবে।"

"ত্রিশ রূপেয়া!" শেঠজী জীবনে এমন আশ্চর্য কথা শোনেননি। মোটর গাড়ি মেরামতেও নাকি এতো লাগে না। শেঠজীর সোনা-বাঁধানো

দাঁতটা চক চক করে উঠলো। শেঠজীর ধারণা, দু'তিন টাকা খরচ করলে রেমিংটন কোম্পানি নিজেই ঐ মেসিন সেরে দেবে।

রাগে অপমানে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলছে। ছেনোদার মুখও লাল হয়ে উঠেছে। আমাদের দু'জনের গাড়িভাড়াই তো তিন টাকা।

ছেনোদা বললেন, "এতোদূর থেকে এলাম, তাহলে অয়েল করে দিয়ে যাই। দু'টাকা দেবেন।

"সামান্য এক ফোঁটা তেলের জন্য দু'টাকা!" শেঠজী লাফিয়ে উঠলেন। 'বেওসা' করতে নেমে আমরা নাকি একদম ডাকু বনে গিয়েছি। ছেনোদা তখনও শেঠজীকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, এর থেকে কমে কেউ অয়েল করে না—কিন্তু ওই ঝুনো নারকোল ভাঙা অত সহজ নয়। আমি তখন বেজায় চটে উঠেছি। দাঁড়াও, অনর্থক এইভাবে আমাদের খাটিয়ে নেওয়ার ওষুধ দিচ্ছি। ওঁরা দু'জনে কথা বলছেন, আমি ততক্ষণ মনস্থির করে টাইপ-রাইটারের উপর ঝুঁকে পড়েছি। আমার হাতদুটো কাঁপছিল, তবুও···। মিনিট দুয়েক মাত্র লেগেছিল। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ছেনোদাকে বললাম, "এমন কাজ দরকার নেই আমাদের, চলুন ফিরে যাই।"

ছেনোদার মতো গোঁয়ার, রগচটা লোক যে আমার কথাতেই মাড়োয়ারীকে ছেড়ে চলে আসবেন ভাবতেও পারিনি। অন্য সময় হলে হয়তো কাটাকাটি হয়ে যেতো। কিন্তু মেসিনটাকে সরিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম! আমার পা দুটো তখন বেশ কাঁপছে। হাত-দুটোও যেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। এ যেন অন্য কারও হাত, আমার নয়। কোনো অদৃশ্য ইনজেকশনে হাতদুটো নাড়াবার শক্তিও যেন অন্তর্হিত হয়েছে।

রাস্তায় নেমেই ছেনোদা আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন। তারপর আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন·····না না, সে চাহনির বর্ণনা করবার মতো শক্তি আমার নেই। সে চোখে কী ছিল? সে আমি নিজেই জানি না। কিন্তু আমি বুঝলাম আমি তাঁকে ফাঁকি দিতে পারিনি। আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। বজ্রাহত হলেও ছেনোদা এতো আশ্চর্য হতেন না। শুধু কানোরকমে বললেন, "এ কি করলি তুই!"

শুধু হাত-পা নয়, আমার সমস্ত দেহই ততক্ষণে অবশ হয়ে এসেছে।

মনে হলো এখনই হয়তো পথের মধ্যে লুটিয়ে পড়বো। বললাম, "দুটোমাত্র ফিড রোলার খুলে নিয়েছি।"

ছেনোদার তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। বললেন, "তুই না পদ্য লিখিস!"

হা ঈশ্বর, একি করলে! রাগের মাথায় শেঠজীকে শাস্তি দেবার জন্যে কেন আমার এই দুর্মতি হলো! ধরণী তুমি দ্বিধা হও। এই মুহূর্তেই আমার হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হচ্ছে না কেন, সব সঙ্কোচ থেকে মুক্তি পেতাম। ভয় হলো, ছেনোদা ঐ লোহার মতো কঠিন হাত দিয়ে হয়তো এক থাপ্পড় মারবেন। কিন্তু কই? কিছুই তো করলেন না। তাঁর মুখটাও একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। বোধহয় অনাগত ভবিষ্যতের ছবি তাঁর চোখের আয়নায় মুহূর্তের জন্য প্রতিফলিত হয়েছিল।

কানে কানে ছেনোদা বললেন, "ওরা বুঝতে পেরেছে।" তারপর আমাকে প্রায় হিড় হিড় করে টানতে টানতে স্টেশনের দিকে যেতে লাগলেন।

কিন্তু সত্যিই ওরা বুঝতে পেরেছে। হৈ হৈ করে দুটো দারোয়ান আমাদের দিকে ছুটে আসছে। সেই মুহূর্তে আমাদের চেতনা যেন হঠাৎ ফিউজ হয়ে গিয়েছিল। কিছু স্মরণ করতে পারছি না। শুধু মনে আছে, ছেনোদা চোরাই ফিড রোলার দুটো আমার হাত থেকে আচমকা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। বোধহয় আমি বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু ছেনোদা বলেছিলেন, "আমরা দাগী মাল, আমাদের কিছুই হবে না।" ফিড রোলার দুটো নিজের পকেটে পুরতে পুরতে বলেছিলেন, "তোর যে না হলে রেকর্ড খারাপ হয়ে যাবে।"

তারপর কি হয়েছিল আমি কিছুতেই মনে করতে পারি না। দারোয়ানরা আমাদের দু'জনের ঘাড় চেপে ধরেছিল। আমাদের পিঠেও কিল পড়েছিল দু'একটা। ছেনোদার নাক দিয়ে তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। তবু ছেনোদা বলেছিলেন, "ওকে ছেড়ে দিন, ওর কোনো দোষ নেই। আমি চুরি করেছি!"

ওরা সত্যিই আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর ছেনোদাকে থানায় পাঠিয়েছিল। একটা আধলাও ছিল না আমার কাছে। বিনা টিকিটে

ট্রেনে চড়ে বাড়ি ফিরে এসে সারা রাত কেঁদেছি। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছি, পুলিশ আমার কোমরে দড়ি বেঁধেছে। আমাকে রুল দিয়ে গুতো মারছে। হাজারখানেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চিৎকার করছে—চোর, চোর! আর ছেনোদা বলছেন, ওকে ছেড়ে দিন। ওর কোনো দোষ নেই, আমি চুরি করেছি।" চমকে জেগে উঠেছি। ঘামে সমস্ত দেহ ভিজে উঠেছে। একি করলাম আমি। একি করলাম!

ভোরের আলো পৃথিবীর মানুষদের জন্যে যে এতো সঙ্কোচ আর লজ্জা নিয়ে আসে জানতাম না। মনে হলো আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে জনবহুল চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সবাই দেখছে আমাকে। আবার চমকে উঠেছি। এবারও স্বপ্ন দেখছিলাম।

কেউ জানতে পারেনি। আমার জীবনের সেই অন্ধকার মুহূর্তের সংবাদ কারুর কাছেই প্রকাশিত হয়নি। কাগজে খবর বেরিয়েছিল—"টাইপ-রাইটারের অংশ চুরির দায়ে তিনমাস কারাদণ্ড।" ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রায়ে এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে যে তীব্র মন্তব্য করেছেন, তারও বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।

অন্য কেউ হলে হয়তো পাগল হয়ে যেতো। হয়তো সে আত্মহত্যা করতো। কিন্তু আমার মতো কাপুরুষ গর্দভের পক্ষে কোনো কিছু করাই সম্ভব নয়। শুধু মাঝে মাঝে চন্দননগরের দৃশ্যটা মনের একান্তে ভেসে উঠলেই অবশ হয়ে পড়তাম।

কতদিন গভীর রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি আর ভেবেছি, এ-লজ্জা আমি কেমন করে ঢাকবো? কেমন করে আমি পৃথিবীর মানুষদের কাছে আবার মুখ দেখাবো? কিন্তু দেখলাম লজ্জা আমার সত্যই ঢাকা পড়েছে। কেউ আমাকে চিনতে পারেনি।

তিন মাস পরে ছেনোদা জেল থেকে ফিরে এসেছেন! খবর পেয়েছি। কিন্তু দেখা করতে সাহস হয়নি। কোঁড়ারবাগান দিয়ে পথ হাঁটাই বন্ধ করে দিয়েছি। ছেনোদার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস নেই আমার।

কিন্তু আমার জন্যে ছেনোদার যে এমন হবে কে জানতো? ছেনোদার সব গিয়েছে। পাঁচুবাবু ছেনো মণ্ডলকে আর বেঞ্চিতে বসতে দেননি। জেল-খাটা টাইপরাইটার চোরকে দিয়ে কে আর মেসিন সারাবে?

তারপর? তারপর শুরু হয়েছে নিশ্চিত অধঃপতনের ইতিহাস। আমার কালব্যাধিভার নিজের দেহে ধারণ করে নিজের সর্বনাশকে ডেকে এনেছেন ছেনোদা। আমি খবর পেয়েছি ছেনোদা পকেটমার হয়েছেন। আমার বুকের মধ্যে কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছে। কিন্তু দেখা করবার সাহস হয়নি। তারপর চোর হয়েছেন ছেনোদা। শেষে ডাকাত।

আর আমার কথা? সে তো ক্রমশঃ সবই আপনাদের কাছে নিবেদন করবো। আমার জীবন-অঙ্কের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আপনাদের জানতে বাকি থাকবে না। আপনারা আজও আমাকে হয়তো চেনেন না, কিন্তু তখন আমাকে পরিপূর্ণভাবে চিনতে পারবেন।

মধ্যিখানেও অনেক কথা। সে সব বলবো বলেই আজ লিখতে বসেছি। কিন্তু আগে এই কাহিনীর শেষ করি। অনেক অগ্নিপরীক্ষার পর সংসারের দেবতা একদিন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে আমার উপর কৃপাবর্ষণ করলেন। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠতে শুরু করেছি। নামকরা দরদী সাহিত্যিক হিসেবে আমি পাঠক মহলে পরিচিত হয়েছি। আমার রেকর্ড যে শরতের আকাশের মতোই নির্মল। পৃথিবীর কোথাও, এমন কি চন্দননগরের পুলিশ খাতাতেও আমার সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই।

ঘটনাটা ঘটেছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে একটি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়ার সংবাদ ঘোষণা করবার পরই। একটি প্রখ্যাত মাসিকপত্রের বিশেষ প্রতিনিধি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আসছেন সেদিন। তিনি জানিয়েছিলেন আমার কয়েকটা ছবিও তুলবেন।

হাতে তখনও একটু সময় ছিল। তাই পাড়ার সেলুনে গিয়ে হাজির হলাম। সেলুনের মালিক গণপতিবাবু খাতির করে তাড়াতাড়ি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। বললেন, "আপনি যে এই বদ পাড়ায় এখনও রয়েছেন এইটাই সৌভাগ্য। এখানে থেকেও কত উচ্চ চিন্তা করছেন দিনরাত! লেখাপড়ার মধ্যেই তো সারাজীবন ডুবে রইলেন, আর কিছুরই তো খেয়াল করলেন না।"

এমন সময় বাইরে থেকে একটা বিকট চিৎকার কানে এল—বল হরি, হরিবোল। দেড়টাকা দামের বাঁশের খাটিয়ায় মাদুর দিয়ে মোড়া একটা মৃতদেহ চলেছে। বাহকরা আর একবার উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো—বল হরি, হরিবোল!

সাবান-মাখানো বুরুশটা আমার গালে মাখাতে মাখাতে গণপতিবাবু বললেন,—"গুণ্ডাটা তাহলে খতম হলো। অনেকদিন থেকেই ভুগছিল। কতই বা বয়েস হয়েছিল। কিন্তু ঐ যে বলে স্যার, যেমন কর্ম তেমনি ফল। সৎপথে থাকলে এখনো কতদিন বেঁচে থাকতিস। আর মরলেও পাঁচটা লোক নাম করতো; দশটা লোক খাটের পিছন পিছন যেতো। ফুল পড়তো, মালা আসতো। কিন্তু ঐ ছেনো মণ্ডলের মতো হলে মাদুর মোড়া হয়ে পকেটমার জোচ্চোরদের ঘাড়ে চেপে বাঁশতলাঘাটে যেতে হবে।"

আমার মাথাটা তখন ঘুরতে আরম্ভ করেছে। গণপতিবাবু বোধ হয় আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন, "সামান্য ছেনোর খবরেই আপনার মুখ নীল হয়ে উঠলো?" হা-হা করে হেসে বললেন, "এই জন্যেই বলে শিল্পীর মন। সব মানুষকেই আপনারা না ভালবেসে পারেন না। রবিঠাকুরও তো ঐ রকম ছিলেন শুনেছি—গরীবের দুঃখু একদম সহ্য করতে পারতেন না। ছেনোটা মরতে কিন্তু পাড়ার ইজ্জত রক্ষে হলো, স্যার। নাহলে তো এ-পাড়ার নামই হয়ে গিয়েছিল গুণ্ডাপাড়া। আপনার মতো লেখক যে এখানে থাকেন, তা কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। তা স্যার গুণ্ডা বটে! একটা ফুসফুস তো ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল, তখনও চুরি করে বেড়াতো। পুলিশের কাছে কত মার খেয়েছে, তবু শিক্ষা হয়নি। এই তো রবিঠাকুরের জন্মদিন (তারিখটা আমার কিছুতেই মনে থাকে না, কতই বৈশাখ যেন) মহাকালী বিদ্যালয়ের একটা মেয়ের গলা থেকে হার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে। বুঝুন একবার—কত বড়ো অমানুষ। রবিঠাকুরের গান গাইবার জন্য একটা মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, তাকেও নিস্তার দিলে না। এই কোঁড়ারবাগানের বদনামের কথা ভাবতে লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়।"

নিপুণ হাতে ক্ষুর চালাতে চালাতে গণপতিবাবু বললেন, "সব দোষই ছিল। শুধু কি আর চুরি ডাকাতি। কিন্তু আপনার মতো লোকের সামনে সে-সব আমি মুখে আনতে পারবো না।"

আমার শরীরটা তখন কেমন অবশ হয়ে পড়েছিল! কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই গণপতিবাবু বললেন, "শেষবারে

তো চুরি করে ঘোলাডাঙায় গিয়ে পড়েছিল। তার আগে দু'দিন সোনাগাছি আর হাড়কাটা গলিতেও ছিল। কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া কি আর অত সহজ? ওরা গিয়ে খারাপ বাড়ি ঘিরে ফেলে ছেনোকে বার করলে। আর বলব কী, আমার দোকানেও প্রায়ই এসে হামলা করতো। দাড়ি কামাবে, চুল ছাঁটবে। আবার হুকুম করবে মাথা টিপে দাও, স্নো লাগাও, চুলে লাইমজুস দাও। একটা ঘণ্টা খাটিয়ে উঠে চলে যাবে। অথচ একটি আধলা পর্যন্ত ঠেকাবে না। নেহাৎ গুণ্ডাপাড়ায় দোকান করেছি তাই, অন্য জায়গা হলে দেখিয়ে দিতাম।"

আমার মুখে আর একবার সাবান লাগাতে লাগাতে গণপতিবাবু বললেন, "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে স্যার। রোগে আর পুলিশে একসঙ্গে ধরলো।"

কথা বললেও তাঁর হাত চালানো বন্ধ ছিল না। আমার মুখে ডেটল লাগাতে লাগাতে বললেন, "আপনি তো বিবেকানন্দ ইস্কুল থেকে পাস করেছেন—তাই না?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

"একেই বলে প্রকৃতির খেয়াল। ছেনো তো ঐ ইস্কুলেই পড়েছিল! একই গাছে আম আর আমড়া ফললো।"

আরও বললেন, "মশাই, পাড়ার বদনাম। প্রতি রাত্রে সেপাই এসে ছেনোর খবর নিয়ে যেতো। হুকুম ছিল রাত্রে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। আবার প্রতি সপ্তাহে একবার থানায় হাজরে দিয়ে আসতে হতো।

"তা মশাই, রাত্রে সেপাই যেমনি চলে গেল, অমনি বেরিয়ে চুরি করেছে।

"তারপর টিবি ধরলে। কিন্তু তখনও কী রস!

"গ্যাসপোস্টে ঠং ঠং করে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সেপাই আসতো, চিৎকার করে বলতো, 'ছেনুয়া, তুম ঘর মে হ্যায়?"

"ছেনো ভিরমী মেরে চুপচাপ শুয়ে থাকতো। তখন সেপাইজী রেগে গিয়ে বলতো, 'শালে ছেনুয়া, তুম কেয়া কর রহা হ্যায়?"

"ছেনো তখন বলতো, ইধারই তো হ্যায় সিপাইজী। আপকো বহিন্‌কে সাথ নিদ যা রহা হ্যায়।"

গণপতিবাবু বললেন, "বুঝুন আস্পর্ধাটা। পুলিসের সঙ্গে রসিকতা। পুলিশের বোনকে নিয়ে টানাটানি। শেষের দিকে অবশ্যি রস শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন সরা সরা রক্ত উঠছে। কত নিরীহ লোকের সর্বনাশ করেছে।

"শেষের দিকে মশাই, সেপাই ডাকলেও ছেনো সাড়া দিতে পারতো না। আজকে ভোরে সাড়া না পেয়ে সেপাই ভাবলে, ছেনুয়া বোধ হয় আবার চুরি করতে বেরিয়েছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলে, মরে পড়ে রয়েছে।"

গণপতিবাবু এবার একটা ছোট আয়না আমার মুখের সামনে ধরে বললেন, "ও সব ছোটলোকদের কথা ছেড়ে দিন। আপনার নিজের মুখটা ভাল করে দেখে নিন।"

সেই প্রখ্যাত মাসিক পত্রের বিশেষ-প্রতিনিধি সেদিন যথাসময়ে আমার কাছে এসেছিলেন। সাক্ষাৎকারের শেষে আমার কয়েকটা ছবিও তুলেছিলেন তাঁরা। উঠে পড়বার সময় আমার পড়ার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো চারটে ছবির দিকে তাঁদের নজর পড়ে গেল। এঁরা হলেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, টলস্টয় ও ডিকেন্স।

বিশেষ-প্রতিনিধি বললেন, "একটা প্রশ্ন করতে ভুলে গিয়েছি—সাহিত্যজীবনে কার কাছে আপনি ঋণী? কিন্তু উত্তর দিতে হবে না—এই চারজনের ছবি দেখেই আমি জবাব পেয়ে গিয়েছি।"

আমি বোধ হয় তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে একটুও স্বর বার হয়নি। মাথাটা সেই মুহূর্তেই বোধ হয় ঘুরে গিয়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন বিশেষ-প্রতিনিধি চলে গিয়েছেন।

এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করা উপলক্ষে বাংলা দেশের বাইরের একটি সাহিত্য সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল।

তাঁদের দু'জন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে কথা পাকাপাকি করবার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। আমি যেতে রাজী হওয়ায়, তাঁদের একজন পকেট থেকে কয়েকখানা দশ টাকার নোট বার করে আমার দিকে এগিয়ে

দিয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছিলেন, "আপনার ফার্স্টক্লাসের ট্রেন ভাড়াটা রেখে যেতে চাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখান থেকে টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেন, তবে ওখানে আমরা আপনাকে নামিয়ে নেবো।"

আমি রাজী হইনি। বলেছিলাম, "না না, ওসব হয় না। টাকাটা নিয়ে রাখি, আর শেষে যদি আমার যাওয়া না হয়ে ওঠে?"

তাঁরা বলেছিলেন, "তাতে কী হয়েছে? তেমন যদি হয় টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেবেন।"

কিন্তু আমি বেশ বিরক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তাঁদের কেউ যদি কলকাতায় এসে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন, তবেই আমার যাওয়া হবে। ফার্স্টক্লাশের গাড়ি ভাড়া এখন থেকে আমি নিজের কাছে রাখতে পারবো না।

তাঁরা আর প্রতিবাদ করেননি। এবং শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে ডবল খরচ করে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের সাহিত্য সংস্থার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয় এবং কলকাতায় একটা বাড়তি লোক পাঠাবার জন্য কয়েক মাস নতুন বই কেনা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। আমার এই ব্যবহারের জন্য ভিতরে ভিতরে বেশ সমালোচনাও হয়েছিল।

কেউ কেউ নাকি বলেছিলেন, "লেখক হলে সব রকমের খামখেয়াল মানিয়ে যায়। লোকে একা একা পৃথিবী ঘুরে আসছে; আর উনি এমনই বড়ো ভাবুক শিল্পী হয়ে পড়েছেন যে, আমাদের দেওয়া কয়েকটা টাকা কয়েকদিন নিজের কাছে রেখে, তাই দিয়ে একখানা ফার্স্টক্লাস টিকিট কেটে গাড়িতে চেপে বসতে পারলেন না।"

একজন টিপ্পনী কেটেছিলেন, "ইনিয়ে বিনিয়ে যারা গল্প লিখতে পারে, আজকাল তাদের সাত খুন মাপ।"

ওঁদের অতিথি হয়ে থাকতে থাকতেই এইসব কথাগুলো আমার কানে এসেছিল। কিন্তু আমি মোটেই রাগ করিনি। বরং ভেবেছিলাম, কর্তাদের কাউকে ডেকে আমার অবস্থাটাও একটু বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করবো। অপরের দেওয়া ফার্স্টক্লাসের ট্রেন ভাড়া নিয়ে কাছে রাখতে কেন আমি ভয় পাই তা বলবো। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবুর কাহিনীটা তখন

আমি তাঁদের সামনে মুখফুটে বলতে পারিনি। এখন কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবুর কথাই লিখবো আমি। এই লেখা নিশ্চয় সাহিত্য সংস্থার দু-একজন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে এবং পড়া শেষ করে, তাঁরা হয়তো আমাকে ক্ষমা করলেও করতে পারেন।

ইট-কাঠ-পাথরের গড়া সভ্য মানুষের এই পৃথিবীতে কত অদ্ভুত সৃষ্টিকেই তো দেখলাম। সুদীর্ঘ দুর্ভাগ্যের কণ্টকময় পথে কত বিচিত্র মানুষের অযাচিত ভালবাসা পেয়ে ধন্য হলাম। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে সন্ধ্যার অলস অবসরে আজও তাঁদের কথা চিন্তা করতে আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয়, তাঁরা যেন আমার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর আমি যেন পথ ভুলে গিয়ে তাঁদের সঙ্গ অনুভব করছি।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবুকে আমার মোটেই ভালো লাগে না। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা, ময়লা ধুতি ও ছেঁড়া কেড্‌সের জুতো-পরা দক্ষিণেশ্বরবাবুর দেহটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলেই আমি ভয়ে আঁতকে উঠি। মনে হয়, দক্ষিণেশ্বরবাবুর ঐ রোগা ছোট্ট পঁয়তাল্লিশ বছরের দেহটা নড়তে নড়তে আমার খুব কাছে এগিয়ে আসছে। তাঁর নিরুপায় নিরীহ একজোড়া চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে দক্ষিণেশ্বরবাবু বলছেন, "তুমি? তুমিও এই কথা বললে? অথচ ব্ল্যাকমার্কেটে একপোয়া চিনি কেনবার জন্য আট আনা পয়সা আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু আমার জীবনের প্রথম সহকর্মী। ছেনোদা তখন জেলে। আমার বড়োই দুর্দিন। কাজের ধান্দায় সমস্ত কলকাতা শহর চষে ফেলেও কিছু সুবিধা করতে পারছিলাম না।

একজন উপদেশ দিয়েছিল, একখানা পুরনো টাইপরাইটার নিয়ে হাওড়া কোর্টের সামনে গাছতলায় বসে পড়ো। যদিও কম্পিটিশনের বাজার, তবুও দিনে দেড়টা-দুটো টাকা রোজগার হয়ে যাবে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড টাইপরাইটার কিনতে গেলেও বেশ কিছু টাকা লাগে; এবং সে-টাকা আমার কাছে ছিল না। বছর খানেক যে-কোনো কাজ করে শ' দেড়েক টাকা জমাতে পারলে, যদি আমার পক্ষে কোর্টের টাইপিস্ট হওয়া সম্ভব হয়।

সেই সময়েই শালকিয়া রামট্যাঙ রোডের এক পানওয়ালা আমাকে মিস্টার রাজপালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ঐ পানওয়ালা সন্ধ্যাবেলায়

লুকিয়ে বেআইনী মদ বিক্রী করতো, এবং সেই ব্যবসা সূত্রেই রাজপালজীর সঙ্গে তার পরিচয়। সাদা হাফ লার্ট, সাদা হাফ প্যান্ট, সাদা মোজা ও সাদা চামড়ার জুতো পরা ভদ্রলোককে দেখলে হঠাৎ মনে হবে বুঝি নেভির কোনো বড়ো অফিসার। কিন্তু শুনলাম, সুন্দরলাল রাজপাল কারুর চাকরি করেন না, নিজেরই ব্যবসা আছে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর জনৈক মাড়োয়ারীর প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে। ঐখানেই রাজপালজী থাকেন। শুনলাম, ঐ মাড়োয়ারী কলকাতা শহরে ঐরকম আরও খানদশেক বাড়ির মালিক। তা ছাড়াও বিরাট ব্যবসা। রাজপালজীর সঙ্গে মাড়োয়ারী নাকি আর একটা নতুন ব্যবসা খুলবেন।

ব্যবসা খুলুন, চাই না খুলুন, আমার একটা চাকরি হলে বেঁচে যাই। এবং রাজপাল বোধ হয় তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বললেন, "এখন মাসে উনিশ টাকা করে দেবো। তারপর যদি কাজ দিয়ে খুশি করতে পারো, তা হলে ঐ উনিশ টাকাই যে বেড়ে বেড়ে কোথায় দাঁড়াবে জানি না; হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তুমি মাসে চব্বিশ পঁচিশ টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করবে।"

রাজপাল সাহেবের কোম্পানিতে আমি টাইপিস্ট। মাড়োয়ারীদের ঐ বিশাল বাড়িটাতে আমাকে আসতে হয়, এবং সেইখানে প্রথম দিনেই তাঁর অ্যাকাউন্টেন্ট দক্ষিণেশ্বরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হলো। আমাকে বসিয়ে রেখে রাজপাল ডাকলেন, "ডাকিনবাবু!" সঙ্গে সঙ্গে এক ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন!

আমাকে দেখিয়ে হাতে ছোট্ট লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে রাজপাল ভদ্রলোককে বললেন, "এই নয়া আদমী লিয়ে লিয়েছি। এইবার থেকে তোমার কাজ কমে গেল।"

দক্ষিণেশ্বরবাবুর মুখের দিকে সেই প্রথম তাকালাম। মুখে সজারুর মতো খোঁচা খোঁচা সাদা-কালো মেশানো সপ্তাহখানেকের পুরনো দাড়ি। ভদ্রলোক বেশ রোগা, লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশী হবেন না।

রাজপালের সামনে দক্ষিণেশ্বরবাবু যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তাতেই বোঝা যায়, তিনি সায়েবকে বেশ ভয় পান। তাঁর সামনে আমার সঙ্গে

কথা বলতেও দক্ষিণেশ্বরবাবু ভয় পেলেন। ময়লা শার্টের হাতাটা কনুই পর্যন্ত গোটানো। হাতের শিরাগুলো ফোলা ফোলা। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে হাসলেন।

রাজপাল তাঁর বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার দিয়ে হিন্দীতে যা বললেন তার মানে দাঁড়ায়, "আরে ডাকিনবাবু, মেয়েদের মতো অমন মুখ বুজে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? কথা বলো। আদমী যদি পছন্দ না হয়ে থাকে, তাও বলো; একে ভাগিয়ে দিয়ে অন্য আদমী লিয়ে আসছি।"

বলে কি লোকটা! আমি তো চমকে উঠেছি। কিন্তু এর আগে কোনোদিন চাকরি করিনি, আমাদের বংশেও কেউ কখন চাকরির ধার দিয়ে যায়নি। মনকে বোঝালাম, আপিসে বোধহয় সায়েবরা এইভাবেই কথা বলেন, এতে দুঃখ করবার কিছুই নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয় হলো, ডাকিনবাবু যদি আমাকে পছন্দ না করেন? যদি সোজা বলে দেন, "না, ছোঁড়াটাকে আমার ভালো লাগছে না।" তা হলে? মাস মাস উনিশটা টাকা তাও বোধহয় গেল।

ডাকিনবাবু কিন্তু কিছুই বললেন না। যেমনভাবে লোকে বলির পাঁঠা যাচাই করে, সেইভাবে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়লেন।

রাজপাল এবার ছড়ি হাতে কাজে বেরিয়ে গেলেন। যাবার আগে তাঁর লাল এবং গোল গোল চোখ দুটো পাকিয়ে বললেন, "ডাকিনবাবু, পোস্টকার্ডগুলো আপনি তা হলে আজই লিখুন। রেশন আনতে আপনাকে যেতে হবে না, নয়া বাবু যাবে।"

রেশন আনা? হ্যাঁ, তাও করতে হবে। দু'খানা রেশন কার্ড দিয়ে ডাকিনবাবু বললেন, "খুব সাবধান কিন্তু। সায়েবের সন্দেহ হলেই দাঁড়ি-পাল্লায় মাল ওজন করবেন।"

শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকিনবাবুর বোধ হয় একটু মায়া হলো। বললেন, "আমার উপর রাগ করে লাভ নেই। লোকটাকে তো চেনেন না।"

ভয় পেয়ে ফিস ফিস করে বললাম, "কেন?"

"দুদিন থাকুন। সব বুঝতে পারবেন।" ডাকিনবাবু ঢোক গিললেন।

তারপর আরও আস্তে আস্তে বললেন, 'ডেঞ্জারাজ লোক—গুণ্ডা···" শেষ কথাটা তাঁর বলবার ইচ্ছা ছিল না, নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

আমার হাতটা দুহাতে চেপে ধরে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে তিনি বললেন, "দোহাই আপনার, যেন বলে দেবেন না। তা হলে আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।"

রেশন নিয়ে এসে দেখি ডাকিনবাবু এক মনে চিঠি লিখে যাচ্ছেন। বললাম, "ডাকিনবাবু, আমি এসেছি।"

উনি এবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। চশমাটা নাকের ডগা থেকে নামিয়ে বললেন, "আপনিও আমাকে ডাকিনবাবু বললেন? ও-বেটা পাঞ্জাবী না হয় উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু আমার আসল নাম দক্ষিণেশ্বর চাটুজ্যে।"

আমি বললাম, "আমার অপরাধ হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে আপনাকে দক্ষিণেশ্বরবাবু বলেই ডাকবো।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু এবার বেশ খুশি হলেন। বললেন, "ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। এখন গোটাকয়েক চিঠি লিখে ফেলো দেখি!"

চিঠি লিখতে বসলাম। কিন্তু এইসব চিঠিগুলোর কথা মনে পড়লে আজও আমার ভয় হয়। সেইসব চিঠির যে কোনো একটার জন্য আমাকে জেলে পচতে হতে পারতো। ভাগ্যিস আমার হাতের লেখা কেউ চিনতো না। আমার হাতে লেখা দু' একটা উড়ো চিঠি আজও বড়তলা কিংবা কটন স্ট্রীটের মাড়োয়ারীদের কাছে সযত্নে রাখা আছে কিনা কে জানে? থাকলে আজও আমার বিপদে পড়বার সম্ভাবনা রয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই সভয়ে আবিষ্কার করলাম রাজপালজী যা-তা বস্তু নন। সাধারণ লোককে ঠকিয়ে একশ্রেণীর মাড়োয়ারী পয়সা করে; আবার তাদের ঠকিয়ে পয়সা হাতাবার জন্য রাজপালের মতো ঘুঘু রয়েছেন! চোস্ত ইংরেজী বলিয়ে-কইয়ে। কথাবার্তায় যে কোনো ঝানু ব্যবসাদারকে গলিয়ে জল করে দিতে বেশীক্ষণ লাগে না। তাদেরই একজনকে পটিয়ে এই রাজপ্রাসাদে উঠেছেন তিনি। একটা পয়সাও ভাড়া লাগে না। উল্টে দারোয়ানরা ঢুকতে বেরোতে সেলাম ঠোকে।

কিন্তু বড়োবাজারের গদিওয়ালারা ঠকবার জন্যে বসে নেই। হাঁড়ি-কাঠের মধ্যে তাদের মাথা গলাতে বেশ উচ্চমার্গের বুদ্ধির প্রয়োজন।

সেইজন্যেই স্বনামে বেনামে বহু চিঠি লিখতে হয়। হয়তো রাজপালজীর নজর পড়লো ক-এর উপর। তাহলে প্রথমেই তিনি ক-এর কাছে যাবেন না; কাজ আরম্ভ করলেন ঙ-এর উপর। বেনামে তাকে লিখলেন আপনি 'ঘ' সম্বন্ধে সাবধান; কায়দা করে ঘ-এর সঙ্গে আলাপ করে রাজপাল হয়তো ক্রমশ গ-এর দিকে এগোবেন। তারপর কতরকমের সূক্ষ্ম জাল বুনে তিনি যে ক-কে ফাঁদে ফেলবেন, সে-এক সুদীর্ঘ রহস্য কাহিনীর বিষয়-বস্তু। সময় পেলে ভবিষ্যতে তা লেখা যাবে।

কিন্তু সে গল্পের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরবাবু বা আমার বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র। তাঁর কথা মতো হাতে কিংবা টাইপরাইটারে রোজ কয়েকখানা চিঠি লিখলেই আমার মাসের মাইনেটা জুটে গেল। বড়োজোর দু' একটা বেনামা টেলিফোন। তাও করেছি।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবু? তাঁর অনেক কাজ। সারাদিনই মুখ বুজে কাজ করেন, আর সায়েবের ডাক হলেই ভয়ে থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করেন।

দক্ষিণেশ্বরবাবু রাজপাল কোম্পানীর অ্যাকাউন্টেন্ট। কিন্তু মাইনে কত জানেন? তিরিশ টাকা। প্রথমে শুনে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার না হয় অভিজ্ঞতা নেই, তাই উনিশ টাকাতেই ঢুকে পড়েছি। তাও কিছু চিরকাল থাকবো না। টাইপে হাতটা একটু সরলেই অন্য জায়গায় পালাবো। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবু তো কাজ জানেন। উনি কেন পড়ে আছেন?

দক্ষিণেশ্বরবাবুকে আমি মোটেই বুঝতে পারতাম না। কখনো হাসতে দেখিনি তাঁকে। সারাক্ষণই গুম হয়ে বসে আছেন। আর সারা পৃথিবীকেই যেন ভয়ের চোখে দেখছেন। শুধু সায়েবকে নয়; আমাকে, এমন কি বাড়ির দারোয়ানদের পর্যন্ত তিনি ভয় করতেন। যেন ওরা এখনি তাঁকে ধরে মারবে। তাঁর ওপর অত্যাচার করবে।

আর রাজপাল সায়েবও যা ব্যবহার করতেন তাঁর সঙ্গে। রেগে উঠে একদিন বললেন, "উল্লু কাঁহাকা, রামছাগলের মতো একমুখ দাড়ি হয়েছে কেন?" এইখানেই শেষ নয়, তার পরের কথাগুলো কলমের ডগা দিয়ে লেখাও যায় না।

দক্ষিণেশ্বরবাবু কিন্তু কোনো প্রতিবাদই করলেন না। বরং তাঁর পায়ে ধরে কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করতে লাগলেন। বললেন, "এবারের মতো ছেড়ে দিন হুজুর। আমি এখনই দাড়ি কামিয়ে আসছি।"

রাজপাল সায়েবের রাগ তখনও কমেনি, দক্ষিণেশ্বরবাবুর মাথায় একটা চাঁটি মারলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

এ কোন্ পৃথিবীতে এলাম? আমার শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে! কিন্তু যাঁর জন্য এতো ভাবছিলাম, দেখলাম তাঁর কিছুই হয়নি। রাস্তায় ইটের উপর বসে দাড়ি কামিয়ে একটু পরে ফিরে এসেই দক্ষিণেশ্বরবাবু নিজের গালে হাত ঘষতে লাগলেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখো তো, কেমন কামানো হয়েছে। ছ' পয়সা নিয়ে নিল।" রাজপাল সায়েব যে তাঁকে চাঁটি মেরেছেন, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়েছেন, তা তিনি ভুলেই গিয়েছেন।

নিজের জামাটার দিকে তাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরবাবু বলেছেন, "যখন রেশন আনতে যাবে, তখন আমার জন্যে একটা দু' পয়সা দামের সাবান কিনে এনো তো ভাই।" নিজের জামাটা দেখিয়ে বললেন, "তিন হপ্তা কাচা হয়নি। কোন্‌দিন আবার সায়েবের নজরে পড়ে যাবো তখন গতবারের মত কান ধরে ওঠ-বোস করাবেন।"

দক্ষিণেশ্বরবাবুকে সত্যি আমি বুঝতে পারি না। যখন কাজ করেন, তখন কেমন সুন্দর কাজ করেন, কিন্তু অন্য সময় মনেহয় তিনি হাবা-বোবা। কোনো সর্বনাশা অসুখে যেন বুদ্ধিবৃত্তি ব্যক্তিত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণেশ্বরবাবুর বাড়ি ঘর নেই। সায়েবের ওইখানেই রাত্রি কাটান। কাজকর্ম সেরে আমি যখন বাড়ি ফিরে যাই, তিনি তখন চুপচাপ বসে থাকেন। এতো দুঃখ, এতো অভাব অনটনের মধ্যে তবুও আমার নিজের একটা সংসার আছে। সেখানে আমার বিধবা মা, আমার নাবালক ভাই-বোনদের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় গল্প করেও আনন্দ পাই। আমরা সবাই মিলে স্বপ্ন দেখি, চিরদিন কিছু আমাদের দুঃখ থাকবে না। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবু?

তাঁর তো কিছুই নেই। একবেলায় ছাতু, আর একবেলায় দারোয়ানদের কাছে খরচা দিয়ে চাপাটি আর একটা তরকারি খান। কোথাও বেরোন না তিনি। জিজ্ঞাসা করেছি, "সন্ধ্যাবেলায় তো কোনো কাজ থাকে না, তখন

কী করেন ?"

"কী আর করবো ভাই, তিনতলার ছাদে গিয়ে বসে থাকি। সেখান দিয়ে রেলওয়ে স্টেশনের গাড়িগুলো দেখতে পাওয়া যায়। ট্রেনের কামরাগুলোর দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকি।"

"আমাদের বাড়িতে যাবেন একদিন ?" আমি দক্ষিণেশ্বরবাবুকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছি।

তিনি রাজী হননি। বলেছেন, "না, কারুর বাড়িতে যাওয়া আমার অভ্যাস নয়।"

বাড়ি ফিরে গল্প করতে করতে মাকে একদিন বলেছিলাম, "দক্ষিণেশ্বর-বাবু যে কী খান। দেখলে বড্ড কষ্ট হয়।"

সেই শুনে মা আমার খাবারের সঙ্গে সিগারেটের কৌটো করে খানিকটা তরকারী আর গোটাকয়েক রুটি দিয়েছেন। সেদিন দুপুরে আমাদের সায়েবও বেরিয়ে গিয়েছিলেন। দুটোর সময় দক্ষিণেশ্বরবাবুকে জোর করে ধরে, আমার সঙ্গে টিফিনে বসালাম। কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না, প্রায় হাতে-পায়ে ধরে খেতে বসাতে হলো। কিন্তু কী আনন্দ করেই যে সেদিন তরকারী খেলেন। খেতে খেতে দক্ষিণেশ্বরবাবু কেঁদে ফেললেন। হঠাৎ বললেন, "তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই না ?"

আমার চোখেও জল এসে গিয়েছিল। ওই কেঁচোর মতো লোকটার মধ্যেও তা হলে অনুভূতি আছে। বলেছিলাম, "হ্যাঁ, দক্ষিণেশ্বরবাবু, আমি অন্তত আপনাকে ভালোবাসি !"

সেই দিন তাঁর দুর্বল মুহূর্তে দু-একটা কথা শুনেছিলাম। আবিষ্কার করেছিলাম, তিনি ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট।

শুনে আমি তো চমকে উঠেছিলাম। তিনি বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?" তারপর তড়াং করে নিজের চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ময়লা বিছানার মধ্য থেকে তিনি একটা তেল-চিটচিটে খাম বার করেছিলেন।

সেই খামের ভিতর থেকে একটা বি-এ পাশের সার্টিফিকেট বার করে আমার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। "পালিয়ে আসবার সময় আর নিতে পারিনি, কিন্তু ঐ সার্টিফিকেটটা ঠিক নিয়ে এসেছিলাম," দক্ষিণেশ্বর-

বাবু বলেছিলেন।

"পালিয়ে?" আমার ঔৎসুক্য বেড়ে গিয়েছিল। "কোথা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন?"

কিন্তু তার উত্তরে ঐ কেঁচোর মতো মানুষটা যে সাপের মতো ফণা তুলে তেড়ে উঠবে তা ভাবতে পারিনি। ঘুষি বাগিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে দক্ষিণেশ্বরবাবু বললেন, তাতে তোমার দরকার কি? এইটুকু এঁচোড়েপাকা ছোকরা, তোমার তাতে দরকার কি?"

আমি এমন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম যে, কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা হয়তো আরও গড়াতো যদি না রাজপাল সায়েব ঠিক সেই সময়েই বাইরে থেকে ফিরতেন। মেজাজটা সায়েবেরও খারাপ ছিল। আর তাঁকে দেখেই দক্ষিণেশ্বরবাবু একমনে নিজের কাজ করতে লাগলেন। যেন কিছুই হয়নি।

সেদিনটা আমারও খুব খারাপ ছিল। শুক্রবার যে রেশন আনার দিন তা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম। রাজপাল সায়েব তা জানতে পেরে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "তুমি লাট সাহেব হয়ে গিয়েছো, মনে করে রেশনের টাকাটা চেয়ে নিতে পারোনি?"

আর কোন কথা না বলে, ব্যাগ হাতে রেশন আনতে চলে গিয়েছি। কিন্তু সেইদিনই যে এমন বিপদ হবে, তা জানবো কী করে? চাল আর গম দুটো থলেতে ঢুকিয়ে, একপো চিনির ঠোঙাটা বাঁহাতে নিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ এক সাইকেলওয়ালা কোথা থেকে এসে এমন ধাক্কা দিল যে আমি উল্টে পড়লাম। চিনির ঠোঙাটা ঠিকরে গিয়ে খোলা নর্দমার মধ্যে পড়লো।

হাওড়ার খোলা নর্দমা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন অনেক খালও তার কাছে ছেলেমানুষ। ইচ্ছে করলে নৌকো চালানো যায়। সেই নর্দমা থেকে চিনির ঠোঙা উদ্ধার করা কোনো রকমেই সম্ভব হলো না। আপিসে শুকনো মুখে ফিরে এসেছি।

ভাগ্যে রাজপাল সায়েব তখন আবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বরবাবু শুনে বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে। সায়েব হয়তো তোমাকে মেরেই ফেলবেন।"

এখন উপায় ? একমাত্র ব্ল্যাকমার্কেটে চিনি পাওয়া যায়। কিন্তু এক পোয়ার দাম আট আনা। মাসের শেষে এতগুলো পয়সা আমি কোথায় পাবো ?

আমি তো ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছি।

আমার সেই অবস্থা দেখে দক্ষিণেশ্বরবাবু ধমকে উঠলেন। "ভয় কী। চুরি-জোচ্চুরি তো করোনি।"

তারপর কী ভেবে নিজের বিছানার ভিতর থেকে একটা সিগারেটের টিন বার করলেন। সেখান থেকে একটা আধুলি নিয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, "যাও, এখনি কিনে নিয়ে এসোগে যাও।"

আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। কৃতজ্ঞতায় তাঁর হাতটা জড়িয়ে ধরেছিলাম। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে তিনি বলেছিলেন, "তুমি এখনও ছেলেমানুষ।"

ব্ল্যাকমার্কেট থেকে চিনি কিনে এনে আমি চুপ করে বসেছিলাম। মনে মনে ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, আমার না হয় উপায় নেই, লেখাপড়া শিখিনি, কাজ জানি না। কিন্তু এই বি-এ পাশ করা লোকটা কেন এখানে তিরিশ টাকা মাইনেতে পড়ে রয়েছে ? আর ঐ যে পালিয়ে আসার কথা বললে, সে কোথা থেকে ?

দক্ষিণেশ্বরবাবু এসে আমার পাশে বসলেন। আস্তে আস্তে হাত দুটো আমার কাঁধে রেখে বললেন, "আহা, বেচারার দিনটা আজ খারাপ গেল। আমি জানতাম। যখনই আমাকে খাওয়াতে গিয়েছ, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আজ কিছু একটা হবেই।"

এইভাবেই জীবন চলছিল—বলবার মতো জীবনের কিছুই ছিল না। ইদানীং কিন্তু দক্ষিণেশ্বরবাবুর মধ্যে একটু পরিবর্তন দেখছিলাম। সারাক্ষণ গুম হয়ে থাকেন, সব সময়েই যেন কিছু চিন্তা করছেন। সায়েব একদিন ওঁকে গালাগালি করলেন, "উল্লু, শূয়ার কাঁহাকা।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু হঠাৎ রেগে উঠলেন। বললেন, "আমি তোমার চাকরি করবো না। আমি চলে যাবো।"

রাজপাল সায়েব এবার অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন। তাঁর হাঁড়ির মত গোল মুখের গোল গোল বসন্তের দাগগুলো চকচক করে উঠলো, "রুপেয়া ?

মেরা রুপেয়া লে আও।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু সঙ্গে সঙ্গে আবার কেঁচো হয়ে গেলেন। সাপের গায়ে কে যেন নাইট্রিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়েছে। কোনো কথা না বলে তিনি সুড় সুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের কাজ করতে আরম্ভ করলেন। সেদিন স্তম্ভিত হয়ে ওঁদের দুজনের নাটক দেখলেও, কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি। পরের দিন কাজ করতে এসে দেখি দক্ষিণেশ্বরবাবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি কান্না বন্ধ করে চোখ মুছতে লাগলেন। বললেন, "কি ভুলই যে করেছি ভাই।"

আমি বোকার মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি নিজের মনেই বললেন, "বোধ হয় কোনো দিনই ও টাকা আমি শোধ করতে পারবো না।"

"আপনি বুঝি টাকা ধার করেছিলেন সায়েবের কাছে?"

সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দক্ষিণেশ্বরবাবু বললেন, "আমি যা করেছি ভাই, তুমি যেন কোনোদিন অমনভাবে নিজের সর্বনাশ কোরো না। কখনো পরের পয়সায় ফার্স্ট ক্লাসের ট্রেনে উঠো না।"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে দক্ষিণেশ্বরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এবার তাঁর কাছে যা শুনলাম, তাতে অবাক না হয়ে উপায় ছিল না।

নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে দক্ষিণেশ্বরবাবু বললেন, "আমাকে দেখে তোমার নিশ্চয় পাগলা পাগলা বোধ হয়। তাই না? কিন্তু চিরকাল ভাই আমি এমন ছিলাম না। আমারও সংসার ছিল, ছেলে-মেয়ে ছিল। আমিও কোট, প্যান্ট, টাই পরে আপিস করতাম। পাঞ্জাবে থাকতাম তখন। কিন্তু ওখানকার রায়টে সব গেল। আমারই চোখের সামনে আমার ছেলে, মেয়ে, বৌকে কেটে ফেলেছে। আমি কোনো রকমে পালিয়ে স্টেশনে এসেছিলাম। আমার কাছে তখন একটা আধলাও ছিল না। পুরো একদিন কিছু খেতে পাইনি।

"ঐ স্টেশনেই তো রাজপালের সঙ্গে দেখা হলো। রাজপালও পালিয়ে আসছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তাঁর বোধ হয় দয়া হয়েছিল।" বলেছিলেন, তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

"ট্রেনে তখন বেজায় ভীড়। কোথা থেকে কী করে যে সায়েব দুখানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট যোগাড় করে নিয়ে এলেন। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দেখে আমার ভয় হলো। বললাম, "অতো দামের টিকিট কাটলেন, কিন্তু আমার কাছে যে কিছুই নেই।"

রাজপাল হেসে বললে, "ওতে কী হয়েছে, পরে শোধ করে দিও।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

দক্ষিণেশ্বরবাবু বললেন, "তারপর আর কী ভাই। সেই থেকেই ওঁর কাছে পড়ে রয়েছি। আর তিনি পাটনা, কলকাতা, কটক আর গৌহাটীতে মাড়োয়ারীদের সঙ্গে জাল-জোচ্চুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

"আমি বলেছি, আমি চলে যাবো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সায়েব ফার্স্ট ক্লাসের গাড়ি ভাড়া সুদ সমেত ফেরত চান। বলেন টাকা দিয়ে চলে যাও। যা পাই, তার থেকে না খেয়ে টাকা জমাচ্ছি। কিন্তু অতো টাকা কোথায় পাবো? ফার্স্ট ক্লাশে না এসে থার্ড ক্লাশে এলে এতোদিনে আমি সব টাকা শোধ করে দিয়ে চলে যেতে পারতাম।" দক্ষিণেশ্বরবাবুর চোখ দুটো ছলছল করছে, আমি বুঝতে পারলাম।

অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হচ্ছে আমার। আমার টাকা থাকলে সেই টাকা রাজপালের মুখের উপর ফেলে দিয়ে দক্ষিণেশ্বরবাবুকে চলে যেতে বলতাম। কিন্তু আমার কাছে দুটো টাকাই নেই, তা অতগুলো টাকা!

দক্ষিণেশ্বরবাবুকে জিজ্ঞেস করেছি, "সায়েব যে আপনার কাছে টাকা পায়, তা বুঝি লিখিয়ে নিয়েছে?"

দক্ষিণেশ্বরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না। লেখা-লিখির ভিতরে কিছু নেই।"

আমার মুখটা সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললাম, "দক্ষিণেশ্বরদা, তা হলে কিচ্ছু ভয় নেই।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু সাগ্রহে বললেন, "তোমার মাথায় কোনো বুদ্ধি এসে গিয়েছে বুঝি? আমার নিজের যে কী হয়ে গিয়েছে, ভাই। কিছুতেই মাথা খাটাতে পারি না।"

উৎসাহের সঙ্গে বললাম, "দক্ষিণেশ্বরবাবু, আপনি বুক ফুলিয়ে পালিয়ে যান, রাজপাল আপনার কিছুই করতে পারবে না।"

ভেবেছিলাম, আমার কথা শুনে দক্ষিণেশ্বরবাবু আনন্দে লাফিয়ে উঠবেন। কিন্তু ঠিক উল্টো হলো। ভয়ে তিনি আঁতকে উঠলেন। দুই কানে আঙুল দিয়ে চোখ বন্ধ করে বলতে লাগলেন, "কালী, কালী। মা, ব্রহ্মময়ী মা আমার, দেখিস আমাকে। আমার কোনো দোষ নেই। নেমক-হারাম নই আমি। ছোটো ছেলে, বুঝতে পারেনি, বলে ফেলেছে।"

আমি তাঁর হাবভাব দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তিনি চোখ খুলে গম্ভীরভাবে বললেন, "যা বলেছো বলেছো, অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না।"

সত্যি, এর পর তাঁকে আমি আর কিছু বলিনি। নীরবে তাঁকে রাজপালের সব অত্যাচার সহ্য করে যেতে দেখেছি। মানুষ ঠকিয়ে লোকটা বহু টাকা রোজগার করছে। সেই পয়সায় গাড়ি চড়ছে, মদ খাচ্ছে, সন্ধ্যা-বেলায় বাড়িতে মেয়েমানুষ এনে ফুর্তি করছে, তবু দক্ষিণেশ্বরবাবুর কাছে পাওনা গোটা কয়েক টাকা ছেড়ে দেবে না।

তবু দক্ষিণেশ্বরবাবু ওঁকে গালাগালি করতেন না। বলতেন "ওঁর দয়াতেই তো পালিয়ে আসতে পেরেছি। লোককে আমি ঠকাতে পারবো না।"

আমি বলেছি, "টাকাটা শোধ দিতে আপনার আর কতদিন লাগবে?"

তিনি ম্লান হাসলেন, "এমনভাবে চললে, এ-জন্মে শোধ হবে বলে মনে হয় না ভাই। সুদ বাড়ছে যে।"

আমারও খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল। বলেছি, "আপনার দোষ আছে। ফার্স্ট ক্লাশে আসা আপনার উচিত হয়নি। জানেনই তো ওসব আমাদের জন্যে নয়। ওসব বড়লোকদের জন্যে। যাদের অনেক টাকা আছে তারাই অমন গদিওয়ালা গাড়িতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আসতে পারে।"

"ঠিকই বলেছ ভাই। কিন্তু মানুষের যখন দুর্মতি হয়, তখন এমনি-ভাবেই হয়। না-হলে তখনই তো আমার ভাবা উচিত ছিল যে, ফার্স্ট ক্লাশে যেতে অনেক টাকা লাগে।" দক্ষিণেশ্বরবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বাড়িতে ফিরে এসেও দক্ষিণেশ্বরবাবুর কথা আমি ভুলতে পারতাম না। মা যখন যত্ন করে আমাকে জলখাবার, চা এনে দিতেন, তখনই মনে পড়ে যেতো গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বিশাল প্রাসাদে একটা অন্ধকার খুপরীতে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। আসলে বন্দী হয়ে আছেন। একবার ফার্স্ট ক্লাশের

ট্রেনে চড়ে, নিজেকে চিরদিনের মতো বন্ধক দিয়ে বসে আছেন। ফার্স্ট ক্লাশের গাড়িভাড়ার টাকা সুদে বাড়ছে। প্রতি মুহূর্তে বাড়তে বাড়তে পাওনা টাকার সেই অদৃশ্য বাণ্ডিল দক্ষিণেশ্বরবাবুর সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করছে। যদি সামান্য একটু কষ্ট করে থার্ড ক্লাশে আসতেন, দক্ষিণেশ্বরবাবু আজ তাহ'লে স্বাধীন হয়ে যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারতেন।

দক্ষিণেশ্বরবাবুকে বলেছি, "কেন আপনি পড়ে রয়েছেন? কেউ আপনাকে আটকে রাখতে পারে না। এটা বে-আইনী। ক্রীতদাস প্রথা আমাদের দেশ থেকে অনেকদিন উঠে গিয়েছে।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু মাথা চুলকোতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তারপরই বলেছেন, "মাথার উপর তো আর একজন রয়েছেন। তিনি কি বলবেন? কোন মহাপাপের ফলে তো এ-জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। আবার? আবার আমি একজনের পাওনা গণ্ডা ফাঁকি দেবো?"

রাত্রে শুয়ে শুয়ে আমি আবার চিন্তা করেছি। দক্ষিণেশ্বরবাবুর জন্যে অজান্তেই আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে। তারপর হঠাৎ মনে হলো মাথায় একটা নতুন চিন্তা আসছে।

পরের দিন আপিসে গিয়ে দেখি, সায়েব বেরিয়ে গিয়েছেন। সামান্য যা কাজ ছিল তা শেষ করে দক্ষিণেশ্বরবাবুকে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি তিনি চেয়ারে নেই।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, ময়লা কাঁথার উপর বসে সিগারেটের পুরনো কৌটো থেকে টাকা বের করে গুনছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এখনও অনেক টাকা লাগবে ভাই।"

তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। সেদিন সকালে বোধহয় সায়েবের বকুনি খেয়েছিলেন। বললেন, "তোমার তো অনেক বুদ্ধি আছে ভাই। আমাকে কোনরকমে মুক্তি দিতে পারো?"

উত্তেজনায় আমার বুকটা তখন দ্রুত ওঠানামা করছিল। বললাম, "কাল রাত থেকে একটা খুব সোজা কথা মনে হচ্ছে। এখানে থাকলে আপনি কোনোদিন ফার্স্টক্লাস টিকিটের দাম শোধ করতে পারবেন না। আপনি বি-এ পাশ! একটা ইস্কুল মাস্টারি পেলেও এর থেকে অনেক বেশী টাকা রোজগার করবেন। তখন সহজেই রাজপালজীর টাকাটা দিয়ে

দিতে পারবেন।"

দক্ষিণেশ্বরবাবুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই সোজা কথাটাও এতোদিন তাঁর মনে আসেনি। আমি বললাম, "আপনি তো আর টাকাটা মেরে দিতে চান না। অথচ এখানে থাকলে আপনাকে দেনা নিয়েই মরতে হবে। পরের জন্মে দেনাটা আরও বেড়ে যাবে।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু বেশীক্ষণ চিন্তা করতে পারেন না। একটু উত্তেজনা হলেই তাঁর মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। মাথাটা চেপে ধরে বললেন, "তুমি এখন যাও। আমার মাথার ভিতরটা কেমন করছে।"

আমি চলে এলাম। কিন্তু তারপরেই যে এমন হবে তা জানতাম না। পরের দিন সকালে আপিসে গিয়ে দেখি ভয়ানক অবস্থা। হাতের রুলটা ঘোরাতে ঘোরাতে রাজপাল আহত বাঘের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন।

আমাকে আসতে দেখেই রাজপাল আমার ঘাড় মটকাবার জন্যেই যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, "তুমি তাহলে এসে গিয়েছো। কিন্তু আর এক শয়তান কোথায়?"

"কে?" আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞাসা করলাম।

"ও, আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে! ডাকিনবাবু কোথায়? ব্যাটা কাল রাত থেকে ভেগেছে।"

এমন যে হবে আমি বুঝতে পারিনি। লোকটা যে এমন হিংস্র হয়ে উঠবে, তাই বা কেমন করে জানবো? এখনই হয়তো আমাকেও গালাগালি করবে।

তখন বয়স কম, তার উপর সংসারের অভাব। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব সেই মুহূর্তে লোপ পেয়ে গেল। হয়তো চাকরিটাও এখনি চলে যাবে। এ-মাসের মাইনেটাও দেবে না। তাহলে খাবো কী? মনিবকে করুণ ভাবে বললাম, "বিশ্বাস করুন, কোথায় গিয়েছেন, জানি না।"

রাজপাল আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "এখন সাড়ে নটা বাজে, বেরিয়ে পড়ো। বেলা একটার মধ্যে যদি ডাকিনবাবুকে ফিরিয়ে না আনতে পারো, তাহলে তোমার আজ দুর্দিন।"

রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাওড়ার বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে এসে দাঁড়ালাম। কত লোক নিশ্চিন্ত মনে নিজের নিজের কাজে যাচ্ছে। আর আমি? তাদের সৌভাগ্য দেখে আমার হিংসে হতে লাগল। পরমুহূর্তেই মনে হলো শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

একি খপ্পরে পড়লাম আমি? এর থেকে যে না খেতে পেয়ে মরা অনেক ভাল ছিল। আমার মা জানছেন, আমি আপিসে চাকরি করছি। এখন সামান্য মাইনে, পরে কাজ শিখলে বেড়ে যাবে। অথচ আমি কি করছি? ভাবলাম, ওখান থেকেই পালিয়ে যাই। কিন্তু রাজপাল? তিনি আমার বাড়ির ঠিকানা জানেন। আমায় রক্ষে রাখবেন না।

কিন্তু এই বৃহৎ কলকাতা শহরের কোথায় আমি দক্ষিণেশ্বরবাবুকে খুঁজে বেড়াই? কোনো সন্ধান না জানা থাকলে, এই শহরের কাউকে বার করা যায় নাকি? হাওড়া পুলের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলাম।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে যখন রাজপালের বাড়িতে ফিরে এলাম, তখন ঢুকতে ভয় করছিল। লোকটা আমাকে বিশ্বাস করবে না, হয়তো মারধোর করবে। কোনো রকমে সাহস সঞ্চয় করে ভিতরে ঢুকে বললাম, "খুঁজে পাইনি।"

অসন্তুষ্ট হয়ে রাজপাল আমাকে যা বললেন তার অর্থ হলো, আমি মানুষ নই ভেড়া। মানুষের বুদ্ধি থাকলে এই কলকাতা শহরের সবকিছুই খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু ভেড়া আর ছাগলরা রুলের গুঁতো না খেলে কিছুই করতে পারে না। তারপর মাথায় সোলার টুপিটা চড়িয়ে, নিজের জুতোটা বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে, রাজপাল বললেন, "চলো আমার সঙ্গে। ও-ব্যাটাকে কেমন না খুঁজে পাওয়া যায় একবার দেখি।"

প্রথমে আমরা হাওড়া স্টেশনে গেলাম। রাজপাল প্রত্যেকটা প্ল্যাটফরম, ওয়েটিং রুম, ওয়েটিং হল তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন। তারপর গঙ্গা স্নানের ঘাট। সেখানেও ছড়িটা ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এবার ব্রীজ পেরিয়ে আমরা ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে এসে পড়লাম।

নদীর ধারের ঘাটগুলো দেখতে দেখতে আরও আধঘণ্টা পরে আমরা

যেখানে এসে হাজির হলাম, সেখানে অখণ্ড হরিনামের পালা চলছে। গত কয়েক বছর ধরেই ধর্মভীরু মাড়ওয়ারীরা ওখানে বিরামহীন কীর্তনগানের ব্যবস্থা করেছেন। শিফট ডিউটিতে একদল লোক ঘুরে ঘুরে খোলকরতাল বাজিয়ে নাচগান করে চলেছেন।

এধারে মেরাপ বেঁধে আপিসও বসেছে। এতগুলো লোকের তদ্বির তদারক করাও তো কম কথা নয়। বিরাট হাণ্ডায় তখন খিচুড়ি রান্না হচ্ছে।

একদল গাইয়ে তখন পাতা পেতে বসে গিয়েছে। উপরে এক ঝাঁক কাক আর চিল গোল হয়ে ঘুরছে। সেইখানেই যে দক্ষিণেশ্বরবাবুর দেখা পাওয়া যাবে কী করে জানবো ?

যারা খাচ্ছিল রাজপাল হঠাৎ তাদের দিকে ছড়িটা তুলে বললেন, "ওই তো।"

সত্যি। আমি সভয়ে দেখলাম, দক্ষিণেশ্বরবাবু উবু হয়ে বসে খিচুড়ি খাচ্ছেন।

ছুটে গিয়ে রাজপাল দক্ষিণেশ্বরবাবুর ঘাড়টা চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকগুলো হৈ হৈ করে উঠলো। কী হয়েছে ? কী হয়েছে ? আওয়াজ শুনে ওখানকার ম্যানেজার বৃদ্ধ রাজস্থানী ভদ্রলোকও ছুটে এলেন। রাজপাল তখনও জামার কলার ধরে দক্ষিণেশ্বরবাবুকে টেনে তোলবার চেষ্টা করছেন।

ম্যানেজার এসে ছাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "ছিঃ বাবুজী, খাওয়ার মধ্যে মানুষকে জ্বালাতন করলে মহাপাপ হয়।"

অপ্রস্তুত হয়ে রাজপাল বললেন, "ব্যাটা পালিয়ে এসেছে।"

ম্যানেজার আস্তে আস্তে বললেন, "ঠিক আছে বাবুজী, ওর খাওয়া শেষ হোক, ততক্ষণ আপনি আমার দপ্তরে বসবেন চলুন।" দক্ষিণেশ্বরবাবুকে বললেন, "বেটা তোমার খাওয়া হলে. আমার এখানে এসো।"

দক্ষিণেশ্বরবাবুর আর খাওয়া হলো না। তখনই হাত ধুয়ে, চলে এলেন। রেগে গিয়ে বললেন, "কেন এখানে এসেছেন ? আমি আপনার চাকরি করবো না।"

তাঁর কথায় কান না দিয়ে রাজপাল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকটা এখানে কবে এসেছে ?"

ভাঙা চশমাটা নাকে লাগাতে লাগাতে বৃদ্ধ রাজস্থানী ভদ্রলোক বললেন, "কাল রাত থেকে। গরীব আদমী। দেখে বড়ো দয়া হলো, তাই টেম্পোরারি হরিনামের চাকরি দিয়েছি। এক টাকা রোজ, আর দুবেলা খাওয়া।"

রাজপাল বললেন, "লোকটা চোর। আমার বাড়ি থেকে কালকে চুরি করে পালিয়ে এসেছে।"

ম্যানেজার অবাক হয়ে গেলেন, "এ্যাঁ! অথচ লোকটাকে দেখে আমার ধার্মিক বলে মনে হয়েছিল।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু কাতরভাবে চিৎকার করে উঠলেন, "একেবারে বাজে কথা, আমি চোর নই। আমি ওঁর কাছে চাকরি করবো না, তাই চলে এসেছি।"

ম্যানেজারবাবু দক্ষিণেশ্বরবাবুকেই বিশ্বাস করলেন। বললেন, আমি এ-সবের মধ্যে নেই। ও বলছে, আপনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছে।"

রাজপালের শয়তানীতে-ভরা চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। বললেন, "পণ্ডিতজী, আমাকে বিশ্বাস না হয়, একে জিজ্ঞাসা করুন।" রাজপাল এবার আমাকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর আড়চোখে সকলের অলক্ষ্যে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, চোখ নামিয়ে না নিলে আমার পাঁজরের হাড়গুলো পর্যন্ত গলে যেতো।

"এ লোকটি কে?" ম্যানেজারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার আর একজন নোকর," রাজপাল উত্তর দিলেন।

কী করবো আমি? ম্যানেজারবাবু আমার মুখের দিকে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকাবাবু, এই লোকটা কি চুরি করে পালিয়ে এসেছে?"

দক্ষিণেশ্বরবাবুও যেন ভরসা পেয়ে বললেন, "বলুক, ওই বলুক আমি চুরি করে পালিয়ে এসেছি কিনা।"

হে ঈশ্বর কী করবো আমি? রাজপাল সায়েবের সর্বনাশা চোখ দুটো আমি আর একবার দেখতে পেলাম। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পেটানো শুরু হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরবাবুও আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু আমার নাবালক ভাইবোন, আমার বিধবা মাও আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এ-মাসের মাইনে আজও পাইনি; কী

করবো আমি ? চেষ্টা করেছিলাম আমি। কিন্তু পারলাম না। কিছুতেই বলতে পারলাম না, দক্ষিণেশ্বরবাবু চোর নন। আমার নীরবতাকে ওঁরা রাজপালের সমর্থন বলেই ধরে নিলেন। ওঁরা বিশ্বাস করলেন, দক্ষিণেশ্বরবাবু চোর।

এক মুহূর্তে রাজপালের রূপ পালটিয়ে গেল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ম্যানেজারকে বললেন, "তাহলে পুলিশের ব্যাপারে আপনাদেরও জড়াতে হয়। টাকা-কড়িগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে সার্চ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা আমি চাই না। বরং ওকে নিয়ে গিয়ে যা হয় করি।

নির্বিবাদী ভালোমানুষ ম্যানেজার ভয় পেয়ে গেলেন। "কী ক্যাসাদ ! আপনি বরং ওকে নিয়েই যান।"

দক্ষিণেশ্বরবাবু ততক্ষণে ভেঙে পড়েছেন। দু একবার বিড় বিড় করে বললেন, "আমি চোর ? আমি চোর ?" তাঁর হাতটা চেপে ধরে রাজপাল চলতে আরম্ভ করলেন। লজ্জায় ঘৃণায় আমি দক্ষিণেশ্বরবাবুর মুখের দিকে তাকাতে পারিনি।

বাড়িতে গিয়ে রাজপাল দক্ষিণেশ্বরবাবুকে একটা ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন। বললেন, "তোমার যা ওষুধ তা আমি ফিরে এসেই দেবো ! আমার সমস্ত দিনটা নষ্ট করে দিয়েছো।"

আমাকে বললেন, "আমি এখনি বেরোচ্ছি, ফিরতে দেরী হবে। তোমার কী কাজ আছে ?"

বললাম, "রেশন আনতে হবে।"

আমার উপর তিনি একটু খুশী হয়েই ছিলেন। বললেন, "বাঙালবাবুর পোলের তলা থেকে রেশন নিয়ে তোমাকে আর আপিসে ফিরতে হবে না। কালকে সকালে এখানে আসবার সময় মালগুলো নিয়ে এলেই চলবে।"

রাজপাল বেরিয়ে গেলেন। আমি ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে রইলাম। ভিতরের ছোট্ট বন্ধ ঘরটা দেখে আমার মনের যা অবস্থা হচ্ছিল তা বর্ণনা করবার মতো সামর্থ্য আমার নেই। কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম, দক্ষিণেশ্বরবাবু আমার নাম ধরে ডাকছেন, "শংকরবাবু আছেন নাকি ? লক্ষ্মীটি ভাই একবার জানলার দিকে আসুন না।"

আমার যেতে খুব ইচ্ছে করছিল, কিন্তু যেতে পারিনি। একটু পরেই দক্ষিণেশ্বরবাবুর কাতর স্বর আবার শুনতে পেয়েছি। "দয়া করে দরজাটা একবার খুলে দিন না। আমি পালিয়ে যাব না। শুধু একবার বাথরুমে যাবো।"

কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। আমার কাছে চাবি নেই। আর থাকলেও হয়তো সাহস করতাম না। আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। রেশন আনবার জন্য উঠে পড়লাম। দক্ষিণেশ্বরবাবুর গলার স্বর তখনও ভেসে আসছিল—"একবার দরজাটা খুলে দিননা। আমি পায়খানা যাবো।" কিন্তু সে ডাকে কে সাড়া দেবে? এই জনহীন বিশাল প্রাসাদের বাইরে দক্ষিণেশ্বরবাবুর স্বর গিয়ে পৌঁছবে না।

পরের দিন সাড়ে নটার সময় এসে দেখি বাইরের দারোয়ান আমাকে ডাকছে। কালরাত্রে সেই "পাগলা" বাবু নাকি নিজের ধুতিটা গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিস এসে গতরাত্রেই লাস নিয়ে গেছে।

রাজপাল সায়েবের কোনো ক্ষতিই হয়নি। পুলিসকে তিনি বলেছিলেন, "দেখুন না, লোকটার জন্যে এত করলাম, তবু রাখতে পারলাম না। রায়টের পর ওকে যখন উদ্ধার করে নিয়ে এলাম, তখন থেকেই মাথার ঠিক ছিল না।"

এতোদিন পরে আজও যখন সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, আমি তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখি দক্ষিণেশ্বরবাবু কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে আছেন কিনা। কারুর কাছে আগাম পয়সা নিয়ে ফার্স্ট ক্লাশের ট্রেনে চড়া আমার পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

এর পরেই বিবেকানন্দ ইস্কুল। রাজপালের রাজ্যে জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল, ঠিক সেই সময়েই হাওড়া বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশনের হেডমাস্টারমশায় শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছেই একদিন পড়াশোনা করেছি; প্রতিদিন প্রার্থনা করেছি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পবিত্র আদর্শে নিজেকে যেন গড়ে তুলতে পারি। সে-প্রচেষ্টা সে-স্বপ্ন আমার সফল হয়নি, কিন্তু তবু বলবো আমাদের সমগ্র ছাত্রজীবন

এক অসীম আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।

পৃথিবীর অনেক ছাত্র অপেক্ষা আমরা বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের ছাত্ররা ভাগ্যবান। আমরা কোনো শৈলাবাসের পাবলিক ইস্কুলে পড়িনি বটে, বেঁকিয়ে ইংরেজী উচ্চারণের রহস্যও আমরা হয়তো আয়ত্ত করিনি, কিন্তু সুধাংশু ভট্টাচার্য, ওরফে হাঁদ্দার কাছে পড়েছি।

হাঁদ্দা আমাকে ভালবাসতেন। পয়সার অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দেবার পরের অধ্যায়টা তিনি অবশ্য তেমন জানতেন না। ভেবেছিলেন—আমি চুপচাপ বেকার বসে আছি, এবং চাকরির চেষ্টা করছি। একদিন আমাকে ডেকে হাঁদ্দা বললেন, "ইস্কুলে মাস্টারি খালি আছে। যা মাইনে তাতে হয়তো তোমার অভাব মিটবে না। কিন্তু আনন্দ পাবে।"

সেদিনের সেই সামান্য চাকরিটা আমাকে কী ভাবে নরপশু রাজপালের হাত থেকে রক্ষা করেছিল তা হাঁদ্দা কখনও জানেননি। আমিও বলতে সাহস করিনি। ভয় হয়েছিল, কে জানে সব শুনে তিনি হয়তো আমার নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ করবেন। বুঝবেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আমাদের মানুষ করবার আজীবন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু চাকরিটি তখন আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অতীত সম্বন্ধে আমাকেও নীরব থাকতে হয়েছিল।

যে ইস্কুলে পড়াশুনা করেছি, সেই ইস্কুলের শিক্ষক হওয়ার মধ্যে এক বিশেষ আনন্দ আছে। সেই আনন্দ আমি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছিলাম। তার একটা প্রধান কারণ কানাইবাবু স্যার তখনও মাস্টারি করছিলেন। আর কানাইদার সান্নিধ্যে কে নিরানন্দ থাকতে পারে? বিশেষ করে কানাইদার কথা আজ মনে পড়ছে। কানাইদাকে আপনারা কেউ চেনেন না। তিনি খ্যাতিমান নন—স্ব বা ছন্দ কোনো নামেও তিনি ধন্য নন। তবু তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে হয়; আর অবাক হয়ে ভাবি, মানুষের ইতিহাসে এই সব 'সামান্য' জনদের কেন স্থান হয় না!

অতীতের সমস্ত ঘটনাকে কালানুক্রমে সাজিয়ে রাখতে পারছি না। সেই ভয়াবহ যুগটাকে ছেড়ে এই সামান্য কিছুদিন আগে চলে আসতে ইচ্ছে করছে। তাই করি। বিবেকানন্দ ইস্কুলের অতীত যুগের কাহিনী স্থগিত রেখে কাছের সময়ে চলে আসি।

কাজকর্ম সেরে সেদিন বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরছিলাম। পথে শুনলাম কানাইদা নেই। সেইদিন ভোরেই আমাদের এই অখ্যাত শহরের সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন বিবেকানন্দ ইস্কুলকে, কাসুন্দেকে, আশ্রমকে এবং আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে জলের পোকা চুপি চুপি আবার জলে ফিরে গিয়েছে।

বাস থেকে নেমে সোজা ইস্কুলে চলে গিয়েছিলাম। যা কোনোদিন দেখিনি তা এবার দেখলাম। ইস্কুলের দরজা জানালা সব বন্ধ। অন্যদিন এই সময় বড় রাস্তার উপরে অফিস ঘরটায় আলো জ্বলে। দোতলার কয়েকটা ঘরেও যে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির বিদ্যুৎ ব্যয়িত হচ্ছে তা রাস্তা থেকেই বোঝা যায়। এখন কিন্তু সব অন্ধকার—যেন কিছুক্ষণের জন্যে মেন-সুইচ ফিউজ হয়ে গিয়ে, বাড়িটা তরল অন্ধকার বোঝাই একটা বিশাল গামলার মধ্যে ডুবে গিয়েছে।

তবুও এগিয়ে যেতে পারিনি, কিছুক্ষণের জন্যে কানাইদার বহু স্মৃতি-বিজড়িত বাড়িটার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকেছি। এবার কাসুন্দের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ওইখানেই সবার হেডমাস্টারমশায় এবং আমাদের মতো কয়েকজনের হাঁদার বাড়ি। হেডমাস্টারমশায়ের উপর সহজবোধ্য কারণে অপ্রসন্ন কিছু ছাত্রের দল এই পথ দিয়ে যাবার সময় বলতো 'বাঘের খাঁচা'। আর রসিকজনেরা বলতো মর্ডান টোল—অর্থাৎ স্থানীয় অনেক সাধুজনের প্রাত্যহিক ও সান্ধ্য আড্ডার কেন্দ্রস্থল। কাসুন্দে রোডের এই বহু দিনের অবহেলায় মলিন বাড়িটা সম্বন্ধে একদিন হয়তো আমাকে অনেক কথা লিখতে হবে। এই বাড়িতেই সকাল বিকেল দু'বেলায় কানাইদার চা বরাদ্দ ছিল। এতো দীর্ঘ সময় কানাইদা এখানে থাকতেন, সময়ে অসময়ে তাঁকে এমন নিয়মিতভাবে বাইরের ঘরের নীচু তক্তাপোশটার উপর বসে থাকতে দেখা যেতো যে, বাড়িটাকে অনেকেই ভুল করে কানাইদার বাড়ি ভাবতো।

বাড়িটা আজ নিঝুম। ঠিক যেন একটা পোড়োবাড়ি। অনেকদিন আগে এই বাড়ির সবাই যেন একসঙ্গে কোনো দৈবদুর্বিপাকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল, তারপর কেউ যেন সাহস করে এর ত্রিসীমানায় আসতে সাহস করেনি।

না। ভুল করেছি আমি। ভেজানো জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে মনে হলো, কে যেন ভিতরে বসে রয়েছেন। হ্যাঁ, এই শীতের আমেজের মধ্যেও তিনি আস্তে আস্তে হাতের পাখাটা ঘোরাচ্ছেন। এই তক্তাপোশটার উপর কানাইদা রোজ এসে বসতেন, আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, দরকার হলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন; বলতেন, 'তোরা সকলে সবজান্তা হয়ে বসে আছিস্! এই যা বললুম, সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত চলে যাবে। মার্সি পিটিশন ছাড়া এখন তোদের কোনো গতিনেই।'

সেই তক্তাপোশটারই এক কোণে হাঁদ্দা নিশ্চল পাথরের মতো বসে আছেন—হাতের পাখাটা মাঝে মাঝে কোনো ভৌতিক শক্তির বলে যেন নড়ে উঠছে।

হাঁদ্দার সত্যিই যে কোনোদিকে খেয়াল নেই তা তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝলাম। প্রায় ডজনখানেক পরিপুষ্ট মশা তাঁর নিরাভরণ ঊর্ধ্বাঙ্গের উপর পরম নিশ্চিন্তে বসে রক্ত শোষণ করছে। পিঠে এবং কানে বসতেও তাদের দ্বিধা হয়নি। তবুও হাঁদ্দা নিশ্চল, মশা তাড়াবার কোনো আগ্রহ নেই। কয়েকটা এঁটো চায়ের কাপ সামনের টেবিলের উপরে ছড়ানো পড়ে রয়েছে। হাঁদ্দার সামনে একটা চা বোঝাই কাপও ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। উপরে পুরু সর ভাসছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে বুঝলাম—পোড়োবাড়ি নয়, আরও লোক রয়েছেন। হাঁদ্দার প্রাত্যহিক আসরের অন্যতম আজীবন সভ্য প্যাটারসনদা কানে কানে বললেন—"কানাই-এর কাপ।" ভুলে চা নিয়ে ফেলেছে হাঁদ্দা—অভ্যেসটা তো আজকের নয়। কিন্তু ঐ চায়ের ভাগ নিতে এবং চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলতে কানাই আজ আর আসবে না।

কোনো কথা বলিনি আমি। নিঃশব্দে পথে বেরিয়ে পড়েছি। দেখলাম, প্যাটারসনদা অর্থাৎ আমাদের রবীন্দ্রনাথ পাত্রদা-ও আমার পিছন পিছন আসছেন। একটু দাঁড়িয়ে রইলাম, প্যাটারসনদা আমার পাশে এসে পড়লেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের দিকে চলেছি আমরা। কিন্তু কোনো কথা হলো না। প্যাটারসনদা ও আমি যেন কোনো মূক বধির ইস্কুলের ছাত্র।

লোকে বলে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম। আমরা প্রথম দুটো শব্দ

ছেঁটে দিয়ে বলি আশ্রম। এই আশ্রমেরই কয়েকজন চিরকুমার উৎসাহী সভ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা আমাদের বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আশ্রম বলতে মনের মধ্যে যে ছবিটা সাধারণতঃ ভেসে ওঠে, আমাদের আশ্রমের পরিবেশ অনেকটা তাই। অহেতুক উত্তেজনা নেই সেখানে। সন্ধ্যাপূজা এবং আরতির পর, পরিবেশটা শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে ওঠে। নস্করপাড়া লেনের আশ্রমকে আজ আরও নিস্তব্ধ মনে হলো। আলোগুলোও জ্বলছে না আজ। দূরের রাস্তা থেকে ল্যাম্প-পোস্টের কিরণ এসে পড়েছে; তার মধ্যেই অস্পষ্ট ভাবে দেখলাম আশ্রম-বাসীদের কয়েকজন শূন্য নয়নে আশ্রমের পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন তাঁরা। কিন্তু কানাইদা থাকলে তা হতো না। স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতগতিতে আশ্রমে ঢুকেই তিনি চিৎকার করে উঠতেন—'কী ব্যাপার তোদের? মুখে সব সাইলেন্সার লাগিয়ে বসে আছিস নাকি? বুঝি না বাপু তোদের। কেমন করে যে বাবু সেজে বারান্দার বেঞ্চিতে বসে থাকিস তা তোরাই জানিস। ওটি চলছে না বাপু।' এই বলে দু' একজনের হাত ধরতেন কানাইদা, তারপর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতেন পুকুর ধারে। সান-বাঁধানো সিঁড়ির উপর ধড়াস করে বসে পড়তেন তিনি। তারপর শুরু হতো গল্প-গুজব।

কিন্তু এই সন্ধ্যায় কে গল্পগুজব করবে? আমাদের পিছনে ফেলে রেখে তাঁর সোনার তরী এখন কোন অজানা বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে কে জানে!

আশ্রমে বসে থাকা সম্ভব হলো না। উঠে পড়লাম। আমার সঙ্গী প্যাটারসনদাও দেখলাম কোনো কথা বললেন না, আমাকে একবার বসতেও অনুরোধ করলেন না। অন্যদিন হলে সবাই হাঁ হাঁ করতেন। বলতেন, 'ওটি হচ্ছে না। এর মধ্যে উঠবে কী?' আজ সবাই নিজের যন্ত্রণার মধ্যেই ডুবে রয়েছেন।

সোজা বাড়ি ফিরে এসেছি। এবং সেই থেকেই ভাবছি কি হারালাম। অন্ততঃ এই একদিন, শনিবারের এই সন্ধ্যাটা আমার কাছে কানাইদার সন্ধ্যা হয়ে থাক। মনে আজ সাহিত্য নেই, রাজনীতি নেই, অর্থনীতি নেই। শুধু আছেন কানাইবাবু স্যার, কানাইদা, কানাইলাল বাগ।

আমার সামনে টেবিলের উপর লেখার কাগজ রয়েছে। আমাদের সামান্য ইস্কুলের সামান্য পত্রিকায় কানাইদার তিরোধানের সংবাদ হাঁদা হয়তো আমাকে কিংবা শংকরীদাকে লিখতে বলবেন। কিংবা তিনি নিজেই হয়তো শেষপর্যন্ত কলম ধরবেন। তাঁর অভ্যস্ত সাধু বাংলায় কী লেখা হবে তা আমি এখনই বলে দিতে পারি। লেখা হবে :

"লোকান্তরিত কানাইলাল বাগ আমাদের বিদ্যালয় এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের সঙ্গে অতি বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষ পর্যন্ত সেবাসম্পর্কে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত এই উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক এত নিকট ও অঙ্গাঙ্গী ছিল যে, তাঁহার বিয়োগের ক্ষতিপূরণ হইতে পারে কিনা এই প্রশ্নও আমাদের নিকট অবান্তর। কানাইলালের মৃত্যু-শোক সান্ত্বনাহীন, নিরুপায়ে তাহা আমাদের সহ্য করিতে হইবে।

মাত্র ৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিলেন। আমাদের বিদ্যালয় হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৩২ সালে শিক্ষকরূপে বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি একবার মোটর ইঞ্জিনীয়ারিং শিখিতে গিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু জীবনের বৃত্তি নির্বাচনকালে বিবেকানন্দ স্কুলের শিক্ষকতাকেই বাছিয়া লইলেন। সম্ভবতঃ না লইয়া পারেন নাই, কারণ কাসুন্দিয়া অঞ্চলের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রণোদিত যে যুবকগোষ্ঠীর দ্বারা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আশ্রম ও বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের পত্তন হয়, শিশু সদস্যরূপে কানাইলাল সে দলের সহিত স্বাভাবিক ভাবেই মিশিয়া গিয়াছিলেন। স্বামী বিরজানন্দের মন্ত্রশিষ্য কানাইলাল শেষদিন পর্যন্ত দেশঋণ ও দেবঋণ শোধ করিয়া গিয়াছেন।

কানাইলাল সোজা ও সহজ মানুষ ছিলেন। আবেগের বশীভূত হইতে ভালবাসিতেন না, যত্ন করিয়া কাজ করার অভ্যাস তাঁহার ছিল, এবং এই নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর মানুষটি সযত্নে তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন। তীক্ষ্ণ ও সরল বাক-

পটুত্বের অধিকারী কানাইলালের সাহচর্য তাঁহার বন্ধু ও জ্যেষ্ঠদের নিকট পরম আনন্দদায়ক ছিল, ছাত্রগণ অবশ্য মাধুর্যের সঙ্গে তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইত!

তাঁহার আত্মার চিরশান্তি হোক, শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে ইহাই প্রার্থনা।'

কিন্তু আমাদের কাছে কানাইদার আরও পরিচয় আছে। কোনো দার্শনিক বলেছেন—সংসারে আমরা সবাই অন্ততঃ দু'বার রাজা হতে পারি—বিয়ের দিন বরবেশে; আর জীবনের শেষে নিদ্রিত রাজা যেদিন মরণ-সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কানাইদা কিন্তু মাত্র একবারই রাজা হলেন। প্রথমবার রাজা হওয়ার সুযোগটা চিরকৌমার্যের ব্রত নিয়ে কানাইদা স্বেচ্ছায় বর্জন করেছিলেন। আজ তিনি রাজা। কিন্তু একদিনকার সুলতান—আজকের রাজত্ব কেবল আজকেরই জন্যে। বার বার নিজের কক্ষপথে পাক খেতে খেতে এই পুরনো পৃথিবীটা সামনের বছরে যখন আবার আজকের দিনে ফিরে আসবে, তখন কেই বা তাঁকে মনে রাখবে?

সংসারের পাকা খাতায় যাঁরা নাম লেখাতে চান, তাঁদের কঠিন পরীক্ষায় পাশ দিতে হয়। হিসেবী সংসার সুদখোর এক বুড়োর মতো লালরঙের জমাখরচের খাতা নিয়ে বসে আছে। তোমার সুখের, তোমার দুঃখের, তোমার পাপের, তোমার পুণ্যের, তোমার গ্রহণের এবং ত্যাগের; তোমার মহৎ কর্ম আর অপকর্মের কড়াক্রান্তি পর্যন্ত হিসেব দাও। তারপর বুড়ো যোগ কষবে, বিয়োগ কষবে, গুণ কষবে, ভাগ কষবে। হিসেবের শেষে জমার দিকে যদি একটা বিরাট অঙ্ক পড়ে থাকে তবেই নাম উঠবে খাতায়।

কিন্তু কানাইদা কি সে হিসেব দিয়েছেন, না দিতে চেয়েছেন? এখন যদি আমি তাঁর হয়ে ওকালতি করতে যাই, সুদখোর সংসার-বুড়োটা হেসে গড়িয়ে পড়বে। সত্য কথা বলতে কি, সে-হাসিকে অবজ্ঞায় উড়িয়ে দেওয়ার মতো সাহসও আমার নেই। অথচ যেদিন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, সেদিন কি না করতে পারতাম।

বেশ মনে পড়ছে কথাগুলো। তখন সবেমাত্র ইস্কুলে ঢুকেছি। প্রতিদিন পাঁচপাতা হাতের লেখা দেখাতে না পারলে যাঁর হাতে নিশ্চিন্ত বিড়ম্বনা এমন একজন স্যারের ক্লাস। মুখ শুকনো করে বসে আছি আমরা কয়েক-

জন। টিফিনের সময় লুকোচুরি খেলা বিসর্জন দিয়ে, বড়ো বড়ো হরফের বোম্বাই মেল চালিয়েও দু'পাতার বেশী ভরাতে পারিনি। প্রয়োজনের সময় মাথায় উদ্ভাবনী বুদ্ধি আসে ; ঐ দুঃসময়ে আমার মনে হলো, হায়রে, যদি এমন একটা কল বার করা যেতো যাতে আপনি লেখা হয়ে যায়। তখন কে আর হাতের লেখার জন্যে ভয় পাবে ? ইস্কুলের বদমেজাজী মাস্টাররা সবাই এক সঙ্গে জব্দ হয়ে যাবে।

নিজের উর্বর মস্তিষ্কের তারিফ যখন নিজেই করতে যাচ্ছি, তখন পাশের বন্ধু ঠোঁট বেকিয়ে বললে, "ওরকম কল তো বহুদিন আগেই সায়েবরা বার করেছে।" আরও বললে যে, 'ওই কল দেখবার জন্য সায়েবদের কাছে যাবারও দরকার নেই। একটু ধৈর্য ধরে ইস্কুলের আপিস ঘরের দিকে নজর রাখলেই তার দর্শন মিলবে।"

বন্ধুর কথা প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু পরের দিনই দেখলাম অফিস ঘরে একটা অদ্ভুত কলের মধ্যে কাগজ পরিয়ে আমাদের ইস্কুলের এক ভদ্রলোক বোর্ডের উপর না তাকিয়ে বেমালুম লিখে যাচ্ছেন ! নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কল দিয়ে লেখা, তাও কিনা না দেখে ! ইনি কে ? ইনি কি মনুষ্য সন্তান, না শাপভ্রষ্ট দেবদূত ?

বন্ধু আঁতকে উঠলো। "চিনিস না, ছোটবাড়িতে দেখিসনি ?"

কি করে চিনবো ? ছোটবাড়িতে পড়বার সুযোগ তো আমার হয়নি। জয়নারায়ণবাবু লেনের প্রাইমারি সেক্শনের ঘোড়া ডিঙিয়ে একেবারে খুরুট রোডে হাই স্কুলের ঘাসে মুখ দিয়েছি আমি। বন্ধু কানে কানে বললে, "কানাইবাবু স্যার।"

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠেছি। চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কিন্তু সেই দুর্মূল্যের বাজারেও বিনা আয়েসে কানাইবাবুর গাঁট্টা পয়সায় আটটা পাওয়া যায় তা বহুমুখে বার বার শুনেছি। তাঁর চিমটির মূল্যও অতি সুলভ— প্রতি পয়সায় তিনটি। মনে মনে এক বিশালবপু ভয়াবহ কানাইবাবু স্যারের ছবিও এঁকে রেখেছিলাম। নিরাপদ আশ্রয় থেকে এক দুর্দান্ত বাঘকে দেখবার আনন্দ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ কানে এলো—"এই, ভিতরে শুনে যা।" ডাক শুনে বুঝতে দেরি হলো না যে বাঘ দেখতে এসে দুর্ভাগ্য-ক্রমে বাঘের খাঁচার ভিতরেই পা দিয়ে ফেলেছি। বন্ধুরা দে ছুট। কাঁদ-কাঁদ

মুখে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, "আমি স্যার দেখতে চাইনি। ওরাই তো আমাকে দেখতে বললে।"

গম্ভীরভাবে মেসিন থেকে কাগজ নামাতে নামাতে কানাইবাবু স্যার বললেন, "না, তুই কি দেখতে চেয়েছিস, তোর মাথা দেখতে চেয়েছে।"

পাশে রাখা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন স্যার। তারপর কলে আর একটা কাগজ পরালেন! আমি তখন সকালে ঘুম থেকে উঠে যাদের যাদের মুখ দেখেছি তাদের সবাইকে অভিসম্পাত করছি।

"কি নাম তোর?" কোনো রকমে নিজের নামটা বলে, আমি যে নির্দোষ সেটা আবার প্রমাণ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু চটাপট চটাপট আওয়াজ আরম্ভ হলো। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছি—স্যার নিশ্চয়ই তাঁর গাঁট্টা শানাচ্ছেন। কিন্তু নিজের মাথায় গাঁট্টা বর্ষণের কোনো অনুভূতি না হওয়ায় চোখ খুললাম। খুলেই অবাক। পৃথিবীতে যে বস্তুটি আমার সবচেয়ে প্রিয় সেই আমার নিজের নামটাই কলের মধ্যে পরানো কাগজটায় জ্বলজ্বল করছে। আমার বিস্ময়ের ঘোর পুরোপুরি কাটবার আগেই দেখি, নামের চারধারে ফুলকাটা বর্ডার বসে গিয়েছে।

সেই পরম মূল্যবান সম্পত্তিটি নিয়ে কি বিজয়গর্বে সেদিন বন্ধুদের কাছে ফিরেছিলাম তা আজও মনে আছে। আরও মনে আছে, সেই মুহূর্ত থেকেই অন্যান্য বাঘা বাঘা স্যারদের নিরীহ কীট পতঙ্গ মনে হতে লাগলো। আমার মানস আকাশে তখন মাত্র এক জ্যোতিষ্কের শোভা—সে জ্যোতিষ্ক কানাই বাবু। যুগলবাবু স্যার, হিমাংশুবাবু স্যার, মায় হেডমাস্টারমশায় পর্যন্ত কেউ কি পারেন এমন কল দিয়ে লিখতে, ফুলের নক্সা কাটতে?

সেইদিন থেকেই স্যারকে আবার ধরবার জন্য অপেক্ষা করেছি। কাসুন্দের মোড়ে স্যারের সঙ্গে একদিন দেখা। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললাম, "স্যার, আর একটা ফুলকাটা নাম লিখে দেবেন? হাতের লেখার খাতায় লাগাবো।" তিনি আমার নমস্কারে ভ্রূক্ষেপ করলেন না, কিন্তু বললেন, "এ আর কি শক্ত কাজ!"

বলেন কি। শক্ত কাজ নয়?

অবাক হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছি কাসুন্দে রোডের মোড়ে। আমারই চোখের সামনে দিয়ে কড়কড়ে করে কাচা সাদা হাফশার্ট

ও কাপড় পরা কানাইবাবু স্যার তাঁর স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেদিন, অর্থাৎ মে মাসের সেই সন্ধ্যেবেলায় যদি আমি লিখতে জানতাম এবং যদি কেউ আমাকে কানাইবাবুর কথা লিখতে বলতো, তাহলে আমি জোর করে বলতে পারি, আমার হাতে এমন একটা চরিত্রের সৃষ্টি হতো যাঁর কাছে বুদ্ধ, রামানুজ, শংকরাচার্য, আলেকজাণ্ডার, আকবর, নেপোলিয়ন সকলকেই ক্ষুদ্র আর অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। এঁদের কেউ কি এমন না-দেখে কল চালাতে পারতেন? আর চালাতে পারলেও কি এমন নিশ্চিন্তভঙ্গিতে একটি বালকের অপ্রতিভ নমস্কার উপেক্ষা করে বলতে পারতেন—ও আর কি।

হায়, তখন কি জানতাম—তারপরও আমার সঙ্গে পথে ঘাটে, ইস্কুলে ট্রামে বাসে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে; জীবন-প্রভাতের স্বপ্নমায়া আমারই জীবন-মধ্যাহ্নে হিসেবী সংসারের চাপে চৌচির হয়ে যাবে। এমন একদিন আসবে যেদিন আমি নিজেই কল চালাতে শিখবো। জানবো, টাইপিস্ট বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা সংসারের সার্থকনামা সফলদের দলে পড়েন না। নিতান্ত কিছুই যার হয় না, সে-ই শেষপর্যন্ত টাইপ শিখে 'বাক্স' বাজাতে শুরু করে। অথচ তখন ভাবতেও পারিনি যে, একদিন বিবেকানন্দ ইস্কুলের মাস্টার হিসেবে আমি কানাইদার লেভেলে উঠে যাবো; ইস্কুলের সেই একই অফিস ঘরে বসে কানাইদা বললেন, "আমরা হাতুড়ে টাইপিস্ট, তেমন সুবিধা করতে পারি না। শংকর, এটা তুমি টাইপ করো, অনেক তাড়াতাড়ি অনেক ভালো জিনিস হবে।"

কিন্তু সেসব কথা আজকের রাত্রে ভেবে কী লাভ? সারাজীবন ধরে যিনি আমাদের হাসিয়ে এলেন, একসঙ্গে হৈ-চৈ হল্লা করলেন, তাঁর জন্যে হা হুতাশ করলে তাঁর পরলোকগত আত্মা নিশ্চয়ই সুখী হবে না। পেঁচায়-পাওয়া ছিঁচকাঁদুনে ছেলেদের কানাইদা মোটেই দেখতে পারতেন না। বলতেন, "কান্না-কান্না বুঝি না বাপু। হৈ চৈ করবে, গণ্ডগোল করবে, জিনিস-পত্তর ভাঙবে, গুরুজন বা মাস্টারে মারলে মাথা নীচু করে মার খেয়ে, পরের মুহূর্তে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে আবার খেলাধুলো করবে, দরকার হয় আবার ভাঙবে, তবে তো ছেলে। যারা মিন মিন করে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদে, তাদের আমি বুঝতে পারি না বাপু।"

সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, "আপনার গাঁট্টা কি সত্যিই শায়েস্তা খাঁর আমলের চালের মতো সুলভ ?"

"এই গাঁট্টা খেয়েছিস বলেই তো ব্রেনটা তোর অতো খুলেছে, এটা বুঝিস না কেন ?" বেশী আলোচনা বা চিন্তার ধার ধারতেন না কানাইদা। তাই বললেন, "তোর সঙ্গে বকবক করে কি আমার পেট ভরবে ?"

একটু পরেই দেখি, তিনি ক্লাস ফোরের ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ইঁটের উইকেটের সামনে ক্রিকেট খেলছেন। কানাইদার সমবয়সী আশ্রমের কর্মীরা ডাকছেন, "কানাই, চলে আয়, ঠাকুরঘরের কাজ আছে।"

কানাইদার খেয়াল নেই, তিনি তখন একটা বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে, ছেলেদের বলছেন, "এ-সব কব্জির জোর আলাদা ! সারাদিন বল করেও আউট করতে পারবি না।"

নীচু ক্লাস থেকে বড় ক্লাসে উঠে যখন একটু চালাক হয়েছি, তখন অন্য সকলের সঙ্গেই জানলাম, কানাইবাবু স্যার আসলে কানাইলাল বাগ। প্রাইমারি সেকশনে পড়ান এবং উঁচু ক্লাসের ছেলেদের মাইনে জমা নেন। প্রতিমাসে ওই মাইনে দেওয়ার দিনই তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ, কাজ-কারবার। আমাদের ইস্কুলের অফিস ঘরের কাউণ্টার ছিল না। একটা জানলার ভিতর কানাইদা বসতেন, আর আমরা বাইরে থেকে জানলা গলিয়ে মাইনের বইটা তাঁর সামনে ফেলে দিতাম। চশমার কাঁচের মধ্যে দিয়ে কানাইদা বিলটার উপর চোখ বুলিয়ে নেন, লাল পেন্সিলের দাগ কাটেন, এবং তারপর একটা রবারস্ট্যাম্প মেরে বিলের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে বইটা ফেরত দেন।

কারও কারও বিলটা হাতে নিয়েই কানাইদা রেগে ওঠেন। "এটা আর মানুষ হলো না। ক্লাস ফোরেও যেমন বাঁদর ছিল, এখনও ঠিক তেমনি রয়ে গেল। এগজামিন ফি-র ঘরে ম্যাগাজিন ফি, ম্যাগাজিন ফি-র ঘরে পাখা-ফি বসিয়েছে। গার্জেনকে রিপোর্ট করতে হবে দেখছি।"

যাকে বললেন, সেই বেচারার মুখ তো চুন। বিল বইটা নিয়ে সে যখন ফিরে যাচ্ছে, তখন কানাইদা হাসতে হাসতে বললেন, "দেখিস, মনে মনে গালাগালি করিস না যেন। শেষে চা খাবার সময় বিষম খেয়ে মরবো। সত্যিই কিছু তোর গার্জেনকে বলে দিতে যাচ্ছি না !"

লাইনে দাঁড়িয়ে, এইসব কথাবার্তা শুনে আমি ততক্ষণ ফিক করে হেসে ফেলেছি। স্যারের চোখ এড়াতে পারিনি। বললেন, "কী? দাঁত বার করে অত হাস্য হচ্ছে কেন! নিজের তো ওই কাকের ঠ্যাঙ বকের ঠ্যাঙ লেখা।"

অনেকদিন পরে এই কথা শুনে কানাইদার এক বাল্যবন্ধু বলেছিলেন, "কানাই-এর ঐ স্বভাব। মুখে রাগ করে, কিন্তু ও রাগ বুকে পৌঁছায় না। শুধু কি তাই। সব কিছুতেই একটু মজা না করতে পারলে ওর ভাত হজম হয় না। ওই যে অঙ্ক না পারলে ছোট ছেলেদের ও চোখ রাঙায়, ওটাও ওর মজা। আবার ওকে নিয়ে তোমরা মজা করো, কিছু বলবে না। বরং খুশী হবে। যার যত গুল, যত বানানো ঘটনা আর কেচ্ছা নির্ভাবনায় কানাই-এর নামে চালিয়ে দিতে পারো। এই বিবেকানন্দ ইস্কুলের হিসেবে ওর নামে যে কত মজার ঘটনা রটানো হয়েছে!"

কানাইদার বন্ধু বলেছিলেন, "একবার আমাদের ক্লাসে ট্রানস্লেশন জিজ্ঞাসা করা হলো—"মহৎ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ মহৎ পরিবার হইতে আসেন।" কে একজন পেছন থেকে এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বললে, 'Great men come from reliable source।' সবাই হো হো করে হেসে ফেললেন—কিন্তু কে বলেছে ধরা গেল না। মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'চেম্বারসায়েবের ডাইপো এই Reliable সায়েবটি কে?' সায়েবকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন অগতির গতি কানাই আছে। ছেলেরা হৈ হৈ করে তারই নাম করলে "Reliable Source!"

বন্ধু একটু থামলেন, তারপর বললেন, "কিন্তু একটুও রাগ করতো না কানাই। খেলাধুলোর ব্যাপারটা ধরো। ওকে ছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, হকি কোনো টীমই তৈরি করা যেতো না। অথচ গোলখাবার যত দোষ, হেরে যাবার যত দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে ওর ঘাড়েই চাপানো হতো। ভলি খেলায় তো একটা ভুল মারের নাম আশ্রমে 'কেনিয়ান' ষ্ট্রোক বলে এখন পরিচিত।"

ছাত্রাবস্থায় ক্লাসে কানাইদা কোন্ বেঞ্চিতে বসতেন জানি না। কিন্তু কর্মজীবনে কখনও প্রথম সারিতে আসতেন না। অথচ, ইস্কুল এবং আশ্রমে সব কাজের সবচেয়ে গোলমেলে এবং খাটুনির অংশটুকু বেছে নিয়ে তিনি খুশী হতেন।

সংসারে এমন এক ধরনের মানুষ থাকে যারা ঠিক নুনের মতন। কোনো কিছুতেই তারা সামনে থাকে না ; অথচ যারা না থাকলে সবকিছুই বিস্বাদ হয়ে পড়ে। এরা ফিষ্টিতে ময়দা মাখে, লুচি ভাজে, অথচ খেতে বসে সবার শেষে। এরা খেটে মরে, কিন্তু ধন্যবাদ কুড়োয় না। সভা-সমিতি উৎসবে তারা বেঞ্চি বয়ে নিয়ে আসে, চেয়ার সাজায়, চিঠি বিলি করে ; কিন্তু ধোপভাঙা পাঞ্জাবী পরে অতিথিদের অভ্যর্থনা করে না। নাটকে পাদপ্রদীপের অন্তরালে থেকে তারা প্রম্পট্ করে, অথচ ঢাল-তরোয়াল নিয়ে কখনও রাজা সাজে না। কেউ এদের মেডেল দেয়না, এদের নামও কাগজে ছাপা হয় না। অথচ এদের না হলে ফিস্টি হয় না, সভা হয় না, থিয়েটার হয় না—আসলে এদের না হলে জীবনই চলে না।

কিন্তু পৃথিবীর তাতে কিছু এসে যায় না। নরকুলের মনোমন্দিরে যে ঢুকতে চায় তাকে নির্ধারিত সেলামী দিতেই হবে। আর সেইজন্যেই তো আমার ভয়। বুড়ো সংসার নিষ্প্রাণ পাথরের মতো জিজ্ঞাসা করবে—যার জন্যে এতো লেকচার ছাড়ছো, কে তিনি ?

কে তিনি ? আমাকে বলতে হবে, তিনি এম-এ নন, পি এইচ-ডি নন— সামান্য ম্যাট্রিক পাশ। টাইপ জানতেন, ড্রাইভারি জানতেন, অথচ মাষ্টারি করতেন প্রাইমারি সেকশনে। পৃথিবী জানতে চাইবে জগৎকে কী দিয়েছেন তিনি ? আমাকে নত মস্তকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তখন করুণাভরে হয়তো আমাকে প্রশ্ন করা হবে, অন্তত এক-আধটা সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে ছোটবেলায় পড়িয়েছেন কি ? আমাকে তখনও মাথা নীচু করে থাকতে হবে।

কিন্তু সে লজ্জা কানাইদার নয়। সে লজ্জা কেবল তাদের যারা তাঁর কাছে পড়তো। সে-লজ্জা কেবল তাদের যারা তাঁকে জানতো, কাছে থেকে দেখতো—যারা জানে আজ ভোরবেলায় তারা কি হারিয়েছে। কারণ এ হারানোর জের তো একদিনে মিটবে না। যখনই ইস্কুলে সরস্বতী পুজো হবে, মাস্টারমশায়েরা ছুটোছুটি করবেন, ছেলেরা হৈ চৈ বাধাবে, তখনই মনে হবে, কাকে যেন তারা হারিয়েছে।

কানাইদার আর এক রূপ দেখেছি দুর্গাপূজার সময়। আশ্রমের দুর্গা-পূজা আমাদের জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করে আছে, তা যে না

দেখেছে সে হয়তো বুঝবে না। আশ্রমের দুর্গোৎসবের রূপটাই যেন আলাদা চারদিন ধরে সব কিছু ভুলে একদল আনন্দলোভী লোক দিনরাত এইখানেই পড়ে থাকে। পরিচিত অপরিচিতের দীর্ঘ দল তখন আসে আর যায়। তারা ঠাকুর দেখলো কিনা, দেখলেও প্রসাদ না নিয়ে চলে গেল কিনা, বেঞ্চিতে তাদের বসবার জায়গা আছে কিনা, না চ্যাংড়া ছেলেরা সেগুলো দখল করে বসে আছে—এ সব দেখবার জন্যেই তো কানাইদা ছিলেন।

আমাদের আশ্রমে আর একটা জিনিস আছে। কখনও পুজোর জন্যে চাঁদা চাওয়া হয় না। কিন্তু বহুজনেই কিছু দিয়ে যেতে চান।

তাঁদের জন্য, এবং খরচের টাকা পয়সার হিসেব রাখবার জন্যে বাক্স সামনে নিয়ে যাঁকে হাসিমুখে বসে থাকতে দেখতাম তিনি কানাইদা। রাত এগারোটার সময়েও তাঁকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখেছি—'বলা যায় না যদি কেউ এসে পড়ে!'

তাছাড়াও আরো কত। সকালে বাদলবাবু স্যার রেগে বলেছেন, "কানাই, দেড়ঘণ্টা ধরে বসে আছি, আমরা এখনও চা পাইনি। এই তোমাদের ম্যানেজমেণ্ট!" চা তৈরি বা বিতরণের দায়িত্ব তাঁর নয়, তার জন্যে অন্য লোক আছেন, তবুও দোষ মাথায় নিয়ে, অথচ রাগে গজগজ করতে করতে কানাইদা চায়ের সন্ধানে বেরোলেন।

আশ্বিনের মাঝামাঝি কোনো সোনা-ঝরা ভোরবেলায় যখন ঢাকের আগমনী আওয়াজে নস্করপাড়া লেনটা ভরে উঠবে, প্রসাদের আশায় ফুল হাতে করে কাসুন্দের লোকেরা যখন আশ্রমের লাল পথটা মাড়িয়ে টালির বারান্দায় এসে বসবেন, যখন প্যাটারসনদা নাড়ু আর চা বিলোতে আসবেন, তখনই মনে হবে কার যেন এখানে থাকা উচিত ছিল, কিসের যেন অভাব, কে যেন এখানে নেই।

সব গুলিয়ে ফেলেছি। কোনটা যে যোগ, আর কোনটা বিয়োগ তাই ঠিক থাকছে না। ছেনোদা, ডাকিনবাবু এঁরা আমার জীবনের কোন্ অঙ্ক? যোগ? না আমি অত্যন্ত অভাগা বলেই তাঁদের বিয়োগ করে বসেছি? অঙ্কের এই দুর্বলতার জন্যেই ছাত্রাবস্থায় কিছু করে উঠতে

পারিনি। কিন্তু বিবেকানন্দ ইস্কুল ছেড়ে, বিভূতিদার হাত ধরে, অম্বা ষ্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে যেদিন হাইকোর্টে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেদিন আমার হিসেবের খাতায় যে শুধু গুণই করা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের সান্নিধ্যে আমি যে বিচিত্র জীবন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তারই কিয়দংশ আমার প্রথম গ্রন্থ কত অজানারে-তে বর্ণনা করেছি। সে কাহিনীর যে অংশটুকু অলিখিত আছে, তা আজও প্রকাশের সময় আসেনি। যেদিন সে সময় আসবে, সেদিন বেঁচে থাকবো কিনা কে জানে? কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা—তিনি যেন ততদিন আমাকে জীবিত রাখেন। না হলে আমার আত্মা মৃত্যুতেও শান্তি পাবে না।

সেই অনাগত দিনের জন্য আমি প্রতীক্ষায় রয়েছি। ইতিমধ্যে 'কত অজানারে' পড়ে, কিছুটা অভিযোগের সুরে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, "হ্যাঁ মশায়, আপনার বইতে ব্যারিস্টার সায়েব সম্বন্ধে এতো কথা লিখলেন, কিন্তু ওঁর স্ত্রী সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি কেন?"

কেউ কেউ এইখানেই থেমে গিয়েছেন; দু' একজন আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, "আপনার বই পড়লে মনে হয়, তিনি যেন বিয়েই করেননি।"

প্রতিবাদ করে বলেছি, "একটু নজর দিলেই দেখতে পাবেন আমার বইতে কয়েকবারই ওঁর স্ত্রী প্রসঙ্গে আলোচনা আছে।"

প্রশ্নকর্তারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলেছেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে। কিন্তু তাহলেই দেখুন, লেখক হিসেবে এটা আপনার কতো বড়ো ব্যর্থতা। জিনিষটাকে এমনভাবে ঢুকিয়েছেন যে, কারও নজরেই পড়লো না।" আবার কেউ কেউ আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, "হয়তো ইচ্ছে করেই আপনি ঐরকম করেছেন। সায়েব-সুবোদের ব্যাপার তো! ওঁদের প্রাইভেট লাইফ সব সময় আমাদের মতো যাকে-বলে কিনা পীসফুল হয় না।"

কথা শুনে কানে আঙ্গুল দিয়েছি। যা লিখেছি তার সমর্থনে কয়েকটা কথা জোরগলায় বলেওছি।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, প্রকৃত রহস্যটা এতোদিন আমি কারুর কাছে প্রকাশ করিনি। আসলে শ্রীমতী বারওয়েলকে আমি চিনতাম না! যতদিন ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের আদালতী বাজারে বাবুগিরি করেছি, সকাল-সন্ধ্যায় খাতা বগলে করে সায়েবের বাড়িতে যাতায়াত করেছি, ততোদিন শ্রীমতী বারওয়েলের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। শুনে অনেকেই হয়তো আশ্চর্য হবেন যে, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় সায়েবের মৃত্যুর পর। স্বামীর মৃত্যুর পরে কুমায়ুনের শৈলাবাস থেকে শ্রীমতী বারওয়েল কলকাতায় নেমে আসেন। পার্ক স্ট্রীটের এক ইংরেজ-বান্ধবীর বাড়িতে এসে তিনি উঠেছেন খবর পেয়েছিলাম, এবং সেইখানেই আগস্টমাসের এক বর্ষামুখর সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

কিন্তু সেই সাক্ষাতের অনেকদিন আগে থেকেই শ্রীমতী বারওয়েলের একটা কাল্পনিক ছবি মনের মধ্যে এঁকে নিয়েছিলাম। বলতে লজ্জা নেই, সে ছবিটা ছিল ধোঁয়াটে এবং চারিদিকে গোমড়া মেঘের সমারোহ। ভোরের রৌদ্রের মতো হাস্যোজ্জ্বল সায়েবের মুখের সঙ্গে কোনোরকমেই তার ছন্দ মেলাতে পারতাম না।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলি। সায়েব কর্মক্ষেত্র কলকাতায় পড়ে রয়েছেন, আর মেমসায়েব রয়েছেন রাণীক্ষেতে। সুতরাং তাঁর বাসস্থানে—ক্যালকাটা ক্লাবের এক-নম্বর সুইটে—আমাদের রামরাজত্ব। কলকাতার সংসারে আমি এবং বেয়ারা দেওয়ান সিং দুজনেই রাজাধিরাজ। বুড়োসায়েব যেন আমাদের মুঠোর মধ্যে। আমাদের কাজকর্ম এবং ক্ষমতার উপরও খবরদারি করবার যে কেউ থাকতে পারেন, তা চাকরিতে ঢোকার মাস খানেকের মধ্যেই একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিলাম, তখন আমি নিতান্তই ছেলেমানুষ। সায়েব থাকলেই মেম থাকতে হয়, এবং তাঁদের যে একসঙ্গে থাকা দরকার, এ-সব স্বতঃসিদ্ধ আমার মাথায় আসতো না। তাই চাকরিতে ঢুকে নিজের মনেই কাজ করে যাচ্ছিলাম। সায়েবের মেম আছেন কিনা, এবং থাকলেও কোথায় আছেন—এই ধরনের স্বাভাবিক কৌতূহলও কখনো মনের মধ্যে উদিত হয়নি।

তখন কিছুদিন ধরে কাজ করছি। বেশ মনে আছে, একদিন সন্ধ্যাবেলায়

সায়েব আমাকে ডাকলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি একটা গল্পের বই পড়ছিলেন। খালি গা, পরনে কেবল একটা সেলাই না-করা সিল্কের লুঙি। বললেন, "শংকর, তোমার শর্টহ্যাণ্ডের খাতাটা নিয়ে এসো। আমার পুওর ওয়াইফকে একটা চিঠি লেখা যাক।

পৃথিবীর অনেক গোপনতম এবং গুরুত্বপূর্ণ চিঠিই স্টেনোদের হাত দিয়ে বেরোয়। কিন্তু তা বলে, নিজের স্ত্রীকে ডিক্টেশনে লেখা! তাঁর কথা শুনে লজ্জায় (ওই বস্তুটি তখন বোধহয় একটু বেশী পরিমাণেই ছিল) আমার কান দুটো টমাটোর মতো লাল হয়ে উঠলো। কলকাতার অনেক বাঘা বাঘা স্টেনোদের নিতান্ত প্রাইভেট এবং কনফিডেন্সিয়াল গল্প শোনবার সৌভাগ্য ইতিমধ্যে আমার হয়েছিল। কোনো একজন বিলেত-ফেরত চৌধুরীসায়েব তাঁর বাবাকে ডিক্টেশনে চিঠি লিখেছিলেন বলে স্টেনো মহলে চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল। আর আমাকে কিনা স্ত্রীকে লেখা চিঠি ডিক্টেশন নিতে হবে! ভাবলাম, হয়তো বুঝতে ভুল করেছি। নিশ্চয় চিঠির প্যাড চাইছেন, নিজেই লিখবেন। চিঠির প্যাড ও কলমটা এগিয়ে দিতেই তিনি মিটমিট করে হাসতে হাসতে হঠাৎ যেন আঁতকে উঠলেন। বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, আমার বউটাকে আমি খুবই ভালবাসি। এই বুড়ো বয়সে যদি সে আমার হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে আমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো?"

উত্তর শুনে আমার ভয়ে নীল হয়ে যাবার অবস্থা। কিছু অন্যায় করে ফেললাম নাকি! কি জানি!

সায়েব এবার খুব আস্তে আস্তে বললেন, "তোমাকে একটা গোপনীয় কথা বলে রাখি। খবরদার! ভুলেও কাউকে যেন বোলো না। আমার ডেঞ্জারাস শত্রু ছাড়া আর কাউকেই আমি নিজের হাতে চিঠি লিখি না। আমার হাতে লেখা দুটি পাতা পড়লে শত্রুর চোখ হয় অন্ধ হবে, নয়তো মাথার শিরা কেটে যাবে!"

এবার আমার হাসিতে গড়িয়ে পড়বার পালা। ওঁর সহজ ব্যক্তিত্বে তখন যে সব পার্থক্য একেবারে ভুলে গিয়েছি, খেয়ালই ছিল না। জিজ্ঞাসা করেছি, "তাহলে, আপনি কি কোনোদিনই ওঁকে নিজের হাতে চিঠি লেখেননি।"

"সে আর বলো কেন। যখন শ্রীমতীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন লণ্ডনের এক পাবলিক টাইপিস্টের কাছে গিয়ে চিঠি টাইপ করতাম। একপাতা টাইপ করতে এক শিলিং খরচা লাগতো। তখন যা অবস্থা। কলেজের ছাত্র রোজ রোজ অতো পয়সা পাব কোথায়! শেষে অন্য পথ ধরলাম। হাতে চিঠি লিখে, চিঠির সঙ্গে আমি নিজেই গিয়ে হাজির হতাম, যাতে পাঠোদ্ধারে কোনো অসুবিধা না হয়! একবার শুধু যেতে পারিনি। আর সেবারেই তো উনি ভয় দেখালেন যে, হাতে চিঠি লিখলে আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখবেন না!"

হাসি-ঠাট্টার পালা শেষ করে সেদিন সত্যই তিনি ডিক্টেশন দিয়েছিলেন। সেই ডিক্টেশনের পাঠোদ্ধার করে আমি যে চিঠি টাইপ করেছিলাম তাতে অনেকগুলো ভুল হয়েছিল। কিন্তু বিশ্রী ভাবে টাইপ করা চিঠি দেখেও সায়েব একটুও চটলেন না বরং পি এস মার্কা করে চিঠির তলায় স্বহস্তে যা লিখে দিলেন তার সারমর্ম হলো—"টাইপে গোটা-পনেরো ভুল করেছে বটে, কিন্তু এমন ছেলে ভূভারতে মেলা দায়। আর এও বলে রাখলাম, খুব শীগগির ছেলেটি তোমার থেকেও ভালো টাইপ করবে।"

সায়েবের বেয়ারা দেওয়ান সিং কিন্তু আমাকে নিজে থেকেই সাবধান করে দিল। সে খাস কুমায়ুনের লোক। ইংরেজ মেজাজের সব রকম রহস্য তার জানা আছে। তার উপর মেমসাহেবকে সে বহুবার দেখেছে, তাঁর কাছে কাজও করেছে। সে বললে অন্য সমস্ত চিঠি আমি যেমন ভাবে খুশি টাইপ করতে পারি। কিন্তু মেমসাহেবের চিঠি হলেই আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মেমসাহেব নাকি কোনোরকম নোংরামো কিংবা কাটাকাটি পছন্দ করেন না। তিনি সাহেবের মতো আত্মভোলা শিব ঠাকুরটি নন। ঠিক তার উল্টো। সাক্ষাৎ মা কালী। ওঁর পুজোয় অনাচার হলে আর রক্ষে নেই। শুনে তো আমার বেজায় ভয় বেড়ে গেল। মনে মনে বলেছি, রোজ রোজ রাণীক্ষেতে চিঠি লেখার কী দরকার? কোন দিন শেষে ওই বদমেজাজী ভদ্রমহিলা লিখে দেবেন, 'তুমি একটা অপদার্থ টাইপিস্ট পুষছে।'

দেওয়ান সিং বলেছিল, "মেমসায়েবের বহুত গোঁষা।"

"খুব বকে বুঝি?" আমি জিজ্ঞাসা করেছি।

শুনলাম তিনি বকেন না ; কেবল কাজ অপছন্দ হলে, কাছে ডেকে মিষ্টি করে বলেন, কাল থেকে আর এসো না।

একদিন দেওয়ানের মুখে শুনলাম মেমসায়েব নাকি কলকাতায় আসছেন। সেই রাত্রে ঘণ্টাদুই চোখ বুঁজে একাগ্রমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম—হে সর্বশক্তিমান, পাঁচসিকে দেড়টাকা যা বলবে তাই পুজো দেব কিন্তু ঐ খাস বিলিতি মেম-সাহেবটির কলকাতায় আসা বন্ধ করো। আমরা যে ভাবে রাম রাজত্ব চালাচ্ছি তা নিজের চোখে দেখলে তাঁর লিপষ্টিক মাখা লাল ঠোঁটজোড়া একেবারে ব্লটিং কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত সবেগে মাথায় গিয়ে উঠবে। সেই অবস্থায় ড্রইংরুমে বসে আড়চোখে আমার টাইপ করা দেখবেন। ডিক্টেশনের মধ্যে পঞ্চাশ বার বেগ-ইওর-পার্ডন বলে কি ভাবে সায়েবের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে দিই তাও দেখবেন। এবং তখন সাহেবের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই মিষ্টি হেসে ভদ্রভাবে বলবেন, "কাল থেকে এসো না।"

মনে মনে দুঃখ করেছি, পৃথিবীতে এই হয়। ঈশ্বর সবকিছু মনের মতো দেবেন না। যদি বুদ্ধি দেন তো রূপ দেন না, রূপ দেন তো সাচ্ছল্য দেন না। কপালগুণে যদি বা সায়েবটা ভালো জুটলো, তা মেমটা হলো একেবারে মা মনসা! ভগবানের উপর খুব রাগও হয়েছিল। এই সায়েবের এমন একটা মেম দিলেন না কেন যিনি রেগে যান না ; আর নেহাত রাগ করলেও মিষ্টি হেসে বলেন না, কাল থেকে কাজে আসতে হবে না।

সেবার ওপরের বড়ো কর্তা কিন্তু সত্যই কৃপা বর্ষণ করেছিলেন—আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। রাণীক্ষেত থেকে চিঠি এলো শ্রীমতী বারওয়েল আসছেন না।

না আসবার কারণটা কিন্তু যা জানা গেল, তাতে আমার এতোদিনের ধারণায় একটু বাধা পড়লো। পাহাড় থেকে নেমে আসবার ব্যবস্থা যখন ঠিকঠাক, তখন ওঁদের অনেকদিনের পুরনো ভৃত্যটি অসুখে পড়লেন। সুস্থ অবস্থায় তিনি যেমন প্রভুদের একচেটিয়া সেবা করে বেড়ান, অসুস্থ হলে তেমনি তিনি নাকি ওঁদের ছাড়া আর কারও সেবা গ্রহণ করেন না।

চাকরের অসুখের জন্য হাজার মাইল দূরে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ

রইল ভাবতে আমি বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাঁর আশ্চর্য হওয়া উচিত ছিল, তাঁর কোনো পরিবর্তনই লক্ষ্য করলাম না। তিনি আগেকার মতোই স্বাভাবিক ভাবে আমাকে চিঠির ডিক্টেশন দিয়ে যেতে লাগলেন। ও-দিক থেকেও ঘন ঘন উত্তর আসতে লাগল। ওঁদের সেই সময়কার চিঠিপত্রের শতকরা নব্বই ভাগ অংশে প্রিয় ভৃত্যের জ্বরের সুদীর্ঘ বিবরণ ও আলোচনা থাকতো।

স্টেনোদের উপর পিটম্যান সায়েবের মাথার দিব্যি আছে, কর্তাদের চিঠির একটি অক্ষরও নিজের বউকে পর্যন্ত বলতে পারবে না। তুমি এবং তোমার রেমিংটন মেসিন ছাড়া আর কাউকে কনফিডেন্সে নিতে পারবে না। পিটম্যান সায়েবের আইন এতোদিন মেনে আসছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে এমনই চিন্তিত করে তুললো যে সায়েবের বেয়ারা, আমার লোকাল গার্জেন এবং এডভাইসার দেওয়ান সিংকে সমস্ত বিষয়টা নিবেদন করলাম।

দেওয়ান সিং এবার তার পুরনো মত সামান্য সংশোধন করে, গম্ভীরভাবে বললে, "ব্যামারী আদমীদের মেমসাব কিছু বলেন না!" আরও শুনলাম, একবার ওঁদের বাগানের মালীকে নাকি তিনি জবাব দিয়েছিলেন। মালী এসে সায়েবের কাছে কেঁদে পড়লো! ঝানু ব্যারিস্টার উভয় সঙ্কটে পড়লেন। একদিকে ওয়াইফ-এর অধিকারে হস্তক্ষেপ, অন্যদিকে একটা লোকের চোখের জল। শেষে আইনের বুদ্ধি বেরলো। আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, "মেমসায়েবকে বলগে যা যে তোর অসুখ করেছে।"

তিরিশ মোহরফী-ওয়ালা ব্যারিস্টারের কূটবুদ্ধিতে মন্ত্রের মতো ফল হলো। চাকরি তো রইলই, উপরন্তু খোদ কর্তাগিন্নীর সেবাযত্ন।

দেওয়ান সিং-এর কাছে শোনা এই গল্পের সত্যতা সায়েবের কাছ থেকে যাচাই করে নেওয়ার সাহস আমার কোনো দিনই হয়নি। তবে তার গল্প শুনে ওইটুকু ভরসা পেয়েছিলাম যে, তেমন বিপদে পড়লে আমার এই প্রায়ই-বিকল-হওয়া শরীরটা হয়তো আমাকে রক্ষা করবে।

পুরাতন ভৃত্যের রোগটা সারতে সেবার কিছুদিন সময় লেগেছিল। এবং ইতিমধ্যেই হাইকোর্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাহেব নিজেই রাণীক্ষেত রওনা হয়ে গেলেন।

রাণীক্ষেত থেকে সায়েবের যে চিঠি পেয়েছিলাম তা অতি সুন্দর ভাবে টাইপ করা। চারিদিকে যেমন সমান মার্জিন, তেমনি ঝকঝকে তকতকে টাইপ। কোথাও কাটাকাটি বা রবারের দাগ নেই। চিঠির প্রথমে লেখা: "আমার পতিগতপ্রাণা স্ত্রীটি যদি এতো কাজের মধ্যেও টাইপ করবার দায়িত্ব না গ্রহণ করতেন, তাহলে হয়তো তোমাকে এই চিঠি লেখাই হতো না।"

চিঠির শেষে সায়েবের নিজের হাতে লেখা ফুট নোটটা পড়েই কিন্তু আমার চক্ষু চড়ক গাছ। সায়েব লিখেছেন, "তোমার অনুপস্থিতি খুবই অনুভব করছি! অন্য কাউকে ডিক্টেশন দিয়ে তেমন সুখ হয় না।"

প্রভুর প্রশংসায় আনন্দ হওয়া তো দূরের কথা, আমার ভয় বেড়ে গেল। মেমসায়েব অত সুন্দর টাইপ করবার পরও সায়েবের এই মতামত যদি কোনোভাবে দেখে থাকেন, তাহলে আমার কপালে অনেক দুঃখ লেখা আছে।

কিন্তু আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা আমার উপরে এমনই সদয় যে, তাঁরা আমাকে সর্বসময় রক্ষা করে গিয়েছেন—তাঁদের নেপথ্য তদ্বিরের ফলে আমাকে শ্রীমতী বারওয়েলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো না। কোনো না কোনো কারণে তাঁর কলকাতায় আসা প্রতিবারই বন্ধ হয়েছে।

ভগবান সম্বন্ধে সায়েবের কোনো-রকম আগ্রহই ছিল না। মানুষ আর পৃথিবী নিয়েই সারাক্ষণ এতো মেতে থাকতেন যে, এর বাইরের কোনো অভিজ্ঞতা লাভের সামান্যতম আগ্রহও তাঁর ছিল না। মেমসায়েব ঠিক উল্টো। ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে তিনি আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন। এই নিয়ে সায়েব প্রায়ই রসিকতা করতেন। বলতেন, "আমাকে কাবু করতে না পেরে, তোমাদের গড এবং গডেসরা আমার বউ-এর উপর ভর করেছে! নিজের কথা ভেবে আমার দুঃখ হয়। শেষ জীবনটা হয়তো আমাকেও সংসার ত্যাগ করে, সরু একফালি কাপড় কোনোরকমে কোমরে জড়িয়ে রিভার গ্যাঞ্জেসের ধারে চোখ বন্ধ করে কাটাতে হবে।"

মেমসায়েবের কলকাতা আসা সম্বন্ধে সায়েব বলতেন, "ওঁর পক্ষে রাণীক্ষেত ছেড়ে হঠাৎ চলে আসা খুবই শক্ত ব্যাপার। কারণ রাণীক্ষেত তো আর যা-তা জায়গা নয়, গড্‌স এবং গডেসরা নিজেদের ডেরায় যাবার

পথে ওইখানে ব্রেক জার্নি করেন। তাছাড়া কোন এক মস্ত সাধুকে একশ বছর আগে ঐখানেই শেষ দেখা গিয়েছিল। তিনি যে-কোনো মুহূর্তেই আবার আবির্ভূত হতে পারেন। তখন যদি ঐখানে মেমসায়েব না থাকেন, তাহলে কী অবস্থাটা হবে, তা ভেবে দেখেছো কী?"

আমি ওসম্বন্ধে আর মোটেই মাথা ঘামাইনি। তবে এই ভেবে খুশী হয়েছি যে, তাঁর এখন কলকাতায় আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে সায়েবের অবজ্ঞা যে আমার খুব ভালো লাগতো তা নয়। মানুষকে যেমন ভালোবাসেন, ধর্ম সম্বন্ধে তেমন অবহেলা। এক এক সময় মনে হতো যে, কোনো এক পূর্বজন্মে তিনিই হয়তো এই কলকাতাতে হেনরী ডিভিয়ান ডিরোজিও হয়ে জন্মে বাংলাদেশের একজন প্রতিভাবান যুবকের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন!

শেষ যেবার তিনি রাণীক্ষেত বেড়াতে গেলেন, সেবার তাঁকে সেখানে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। কলকাতায় তেমন কাজের তাগিদ ছিল না, সেই সঙ্গে তিয়াত্তর বছরের পুরনো শরীরটাও নানা অজুহাতে গোলমাল শুরু করেছিল। কিন্তু তাই বলে চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা তাঁর কোষ্ঠিতে লেখা ছিল না। ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়েও হৈ চৈ হট্টগোলে মেতে থাকতেন! এবং সেই সব পকেট-সাইজ এডভেঞ্চারের সকৌতুক বিবরণ আমাকে সুদীর্ঘ আকারে রাণীক্ষেত থেকে লিখে পাঠাতেন।

কলকাতায় তখন আমার প্রায় কোনো কাজই নেই। একবার শুধু চেম্বারে গিয়ে হাজিরা দেওয়া, এবং কোনো চিঠিপত্র থাকলে তা রিডাইরেক্ট করে কুমায়ুন পাহাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া। সেই অখণ্ড অবসরে তাঁর চিঠিগুলো পড়তে কি যে ভালো লাগতো। দূরদৃষ্টি বলে বস্তুটি আমার বুদ্ধির ভাঁড়ে বোধ হয় কোনোদিন ছিল না। থাকলে সেই চিঠিগুলো নিশ্চয় যত্ন করে রেখে দিতাম। আজ কিংবা, আরও অনেকদিন পরে সেই সব দিনগুলো যখন সুদূর অতীতের গর্ভ থেকে অস্পষ্ট মোমবাতির মতো টিম টিম করে জ্বলতে থাকবে, তখন পুরনো চিঠিগুলো পড়ে আনন্দ পাওয়া যেতো। কিন্তু সে আমার নিজেরই নির্বুদ্ধিতা, বর্তমানকে নিয়েই এতো মেতেছিলাম যে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন বোধ করিনি।

সায়েবের শেষ দিকের একটা চিঠিতে কিছু নতুন খবর পাওয়া গেল।

লিখেছেন, এবার শীঘ্রই কলকাতায় ফিরছেন। বেশ আশ্চর্য হয়েই লক্ষ্য করলাম, সে-চিঠিতে তাঁর পাখীর গান শোনবার জন্য পাইনবনের মধ্যে দুঘণ্টা চুপচাপ বসে থাকা, কিংবা প্রজাপতির পিছন পিছন ফুলবাগানে ছোটাছুটি করা ইত্যাদি এ্যাডভেঞ্চারের কোনো বর্ণনা ছিল না। লিখেছিলেন, "কোনোরকম বাদ-বিচার না করে লোভী গোরুর মতো বাড়ির যতো বই ছিল এই ক'মাসেই হজম করে ফেলেছি। আর কিছু হাতে না থাকায়, আমার স্ত্রী সুযোগ বুঝে অরবিন্দের লাইফ ডিভাইনখানা গুঁজে দিয়েছেন।"

এই ক'টা লাইনের গুরুত্ব তখনও বুঝিনি। বুঝলাম ক'দিন পরেই সায়েব যখন কলকাতায় ফিরলেন।

কোর্ট থেকে ক্লাবে ফিরে এসেই নিজের বিছানার বালিসের তলা থেকে তিনি যে বইটা বার করলেন, তার নাম 'লাইফ ডিভাইন'। দৃশ্যটা আজও চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। নীল রঙের একটা লুঙি কোনো রকমে শরীরে জড়িয়ে নিয়ে, পায়ে একটা রবারের বাথরুম-স্লিপার চড়িয়ে তিনি সোফাতে এসে বসলেন। পিছনে দাঁড় করানো লাইটটা জ্বেলে দিলাম। ইশারায় তিনি অন্য আলোগুলো নিভিয়ে দিতে বললেন। চোখে চশমা লাগিয়ে, সোফার এক কোণে ঈষৎ হেলে পড়ে তিনি যেন ধীরে ধীরে সমাধি-মগ্ন হয়ে পড়লেন। কাছে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে দেখেছি, শরীরে কোনো স্পন্দন নেই। মাঝে মাঝে শুধু চোখের দৃষ্টি ডানদিক থেকে দ্রুত বাঁদিকে ফিরে আসছে। ঝালরদেয়া মানুষ-সমান উঁচু স্ট্যাণ্ডলাইটটা ঘরের মধ্যে আলোছায়ার এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আর তিনি একমনে পড়ছেন, আমাকে বাড়ি যেতে বলতেও ভুলে গিয়েছেন।

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে চিন্তার কোন্ অতলান্ত সাগরের তলদেশ থেকে তিনি উঠে এলেন। ঐ অপার্থিব পরিবেশের মাদকতায় আমিও কখন যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম। টেলিফোনে কথা শেষ করে, আমাকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। "তোমাকে কি বাড়ি ফিরে যেতে বলিনি? I am sorry my dear boy."

বইটা বন্ধ করতে করতে বলেছিলেন, "আই মাস্ট রাইট টু মাই ওয়াইফ। আজই লেখা উচিত।"

খাতা নিয়ে এগিয়ে গেলাম। সেদিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কী সব

ভাবলেন। বললেন, "না, ডিক্‌টেশনে হবে না, আমি নিজের হাতেই লিখবো।"

নিজের হাতে অনেকক্ষণ ধরে যে চিঠিটা সেই রাত্রে তিনি লিখেছিলেন, সেটি আমাকে দেখাননি। কিন্তু সে-চিঠি আমি দেখেছিলাম কিছুদিন পরেই। চিঠির লেখক তখন আর ইহজগতে নেই। তার কিছুদিন আগে রেলওয়ে রেট্‌স্ ট্রাইবুনালের এক কেস করতে গিয়ে মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে এক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দক্ষিণ ভারতের এক শতাব্দী-প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে আমাদের প্রভুকে চিরদিনের মতো শুইয়ে রেখে দেওয়ান সিং যখন কলকাতায় ফিরে এল, তখন তার চোখে জল। আমরাও নিজেদের সংযত রাখতে পারিনি।

আমার হাতে হলদে মলাটের একখানা বই দিয়ে দেওয়ান বলেছিল, "বাবুজী, অসুস্থ অবস্থায় সায়েব যখন কোর্ট থেকে নার্সিংহোমে চলে এলেন, তখন ব্যাগ থেকে আমাকে ওই বইটা বার করে দিতে বললেন। আমি মানা করেছিলাম—'মাস্টার নো বুক গুড ফর ইউ। টেক্ রেস্ট।' মাস্টার শোনেন নি। বেয়ারার ভাঙা ভাঙা ইংরিজির উপর রসিকতা করে বলেছিলেন, "মাই ডিয়ার বয়, at least that book is good for me."

তাঁর সেই সামান্য কয়েকদিনের রোগশয্যায় ঐ বইটি তিনি কখনও হাতছাড়া করেননি। সেই পরম মূল্যবান স্মৃতিটুকু দেওয়ান সযত্নে আমার জন্য কলকাতায় ফিরিয়ে এনেছে। সে বই-এর নাম লাইফ ডিভাইন।

সেই বই আমি আত্মসাৎ করিনি। যথাসময়ে শুনলাম, শ্রীমতী বারওয়েল কুমায়ুনের শৈলশিখর থেকে কলকাতায় নেমে আসছেন। কিন্তু আর আমাদের ভয় নেই। ঐ বদমেজাজী দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইউরোপীয়ান মেমসায়েবের হাতে আমাদের আর চাকরি যাবার ভয় নেই। চাকরি হারিয়ে, চাকরি যাবার ভয় থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি।

তবু প্রথম সাক্ষাতের উদ্বেগ থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না। কী প্রশ্ন করবেন, কী কথা বলবেন, কে জানে। আর তাঁর মনের অবস্থার কথা ভেবেও দুঃখ হচ্ছিল। এই বিদেশে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অনেকদিন আগে সুদূর ইংলণ্ড থেকে তিনি যে একা কলকাতায় এসেছিলেন, সে-কথা সায়েবের কাছে শুনেছিলাম। সেই বিবাহ

স্বাভাবিক ভাবে সুখের হলেও, সন্তানের আবির্ভাবে সফল হয়নি ; সুতরাং এবার কোথায় ? হুগলী নদীর মোহনায়, অথবা বোম্বাই কিংবা কোচিন বন্দরে নোঙর-বাঁধা কোনো যাত্রীজাহাজ এই স্বামী-শোকাতুরা ইংরেজ-নন্দিনীকে আবার সাগরের ওপারে স্বগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে কে জানে !

অবশেষে দেখা হলো। আগস্ট মাসের শেষ দিন বোধ হয় সেটা। সুযোগ পেয়ে বরুণদেব কলকাতার পথে আমার মতো অসহায় ও বেকার বঙ্গসন্তানকেও তাঁর প্রবল প্রতাপের সামান্য একটু নমুনা বিতরণ করতে দ্বিধা করলেন না। ফলে যখন পার্ক স্ট্রিটে শ্রীমতী বারওয়েলের সাময়িক আস্তানায় এসে উঠলাম তখন সমস্ত জামাকাপড় ভিজে গিয়েছে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপতে গিয়ে হাতটা থমকে গেল। এমন অবস্থায় কোনো অপরিচিতা মেমসায়েবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হওয়া কি এটিকেট-বিরোধী হবে না ? কিন্তু দু'দিন আগে ঠিক করা এ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখাও বোধকরি ইংরিজি ভদ্রতার ব্যাকরণ অনুযায়ী ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। আমার তখন সত্যই কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। এতোদূর এসে কি ফিরে যাবো ?

পালিয়ে আসবার জন্য যখন প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি, তখন হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। স্বয়ং শ্রীমতী বারওয়েল বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর শান্ত সমাহিত মুখশ্রী দেখে কে বলবে যে, মাত্র কয়েক দিন আগে তিনি স্বামীকে হারিয়েছেন। চোখের চশমাটা ঠিক করে বললেন, "আরে, শঙ্কর যে ! তোমার কথাই ভাবছিলাম, তোমার জন্যেই তো দরজা খুলে আকাশের অবস্থটা দেখতে বেরিয়ে আসছিলাম।"

একটা হাত ধরে শ্রীমতী বারওয়েল প্রায় জোর করেই আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। তাঁর নিজের তোয়ালে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "যা ভয় করেছিলাম তাই হলো। জলে সমস্ত জামাকাপড় ভিজিয়ে ফেলেছ।"

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। "আমিই যে শংকর জানলেন কি করে" জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি স্নিগ্ধ হাস্যে বললেন, "তোমার বর্ণনা এতো শুনেছি যে, হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের মধ্যেও তোমাকে চিনতে পারতাম।" শ্রীমতী বারওয়েল

একটু থামলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, তিনি তোমাকে খুব ভালোবাসতেন।"

আমি তাঁর মুখের দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বলতে লজ্জা নেই, আমি চোখের জল আটকে রাখতে পারি না। অনুভূতির রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে, অশ্রুর বিন্দুরা অতি সামান্য কারণেই আমার চোখের কোলে এসে জড়ো হয়। সেদিনও তাই হলো। চেষ্টা করে চোখের জল আটকে রাখতে পারলাম না।

তোয়ালেটা দেখিয়ে মেমসায়েব বললেন, "তাড়াতাড়ি শরীরটা মুছে ফেল! তোমার শরীর সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। বলতেন, একটু ঠাণ্ডা লাগলেই তোমার নাকি সর্দি হয়।"

মনে মনে সেদিন দেওয়ানের আদ্য-শ্রাদ্ধ করেছি। এমন মেমসায়েবকে এতোদিন আমি ভয় করে এসেছি? মনে মনে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন কলকাতায় না আসেন? হা ঈশ্বর!

সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। ভিজে শার্টটা, হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রেখে, একটা গেঞ্জি পরে মেমসায়েবের সামনে বসেছিলাম—অর্থাৎ বসতে বাধ্য হয়েছিলাম। তারপর তাঁর হাতে তৈরি চা খেতে খেতে কখন যে সব পার্থক্য ভুলে গিয়েছি খেয়াল করিনি। মনে হচ্ছিল কতদিন থেকে তাঁকে দেখছি, কত বছর ধরে যেন এইভাবে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি।

তিনি স্বামীর প্রতিদিনের কাজের খুঁটিনাটি বর্ণনা চেয়েছেন। আমি দিয়েছি—কখন উঠতেন, কখন চা খেয়ে কাজে বসতেন, দু'জোড়া চশমার কোনটা সর্বদা ব্যবহার করতেন, ইদানীং চা-এর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন না কি। আমার সামর্থ্যমতো সমস্ত দিনের একটা ছবি তাঁর সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। সেই সময়ই বইটার কথা মনে পড়লো। আমার শান্তিনিকেতনী ঝোলানো ব্যাগের ভিতর থেকে বইটা বার করে তাঁর হাতে দিলাম। বৃষ্টির জলে সামান্য-ভিজে যাওয়া বইটার সঙ্গে সায়েবের জীবনের শেষ ক'দিনের সম্পর্কের কাহিনী শুনে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে বললেন, "আমি কোনোদিন বিশ্বাসই করতে পারিনে যে, Noel will take that book seriously."

কতক্ষণ যে নির্বাক হয়ে বসেছিলাম জানি না। শ্রীমতী বারওয়েল

ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে সায়েবের একটি চিঠি বার করলেন। চিঠিটা চিনতে আমার মোটেই কষ্ট হয়নি। সেইদিন রাত্রে লাইফ ডিভাইন পড়তে পড়তে নিজের হাতে লিখেছিলেন, স্টেনোগ্রাফারের শরণাপন্ন হননি। লিখেছেন, "ডার্লিং, তিয়াত্তর বছরের বহু দিন ও রাত্রি অজস্র অসার বই পড়ে অপচয় করেছি। কিন্তু তুমি তো আমাকে অনেকদিন থেকেই জানতে। আরও অনেকদিন আগে তোমার এই বইটা আমাকে পড়তে দেওয়া উচিত ছিল।" চিঠির শেষে আবার পুনশ্চ—"পড়তে পড়তে কখন যে ভোর হয়ে গিয়েছে খেয়াল হয়নি। সারারাত ধরে তিরিশ পাতা পড়েছি। এবং যতদূর মনে হচ্ছে, ঐ তিরিশপাতার মানে আমি বুঝতে পেরেছি।"

"বইটা শেষ করবার জন্য মাদ্রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন, শেষ হয়েছিল কিনা কে জানে!" আমি বললাম!

বইটা খুলতে গিয়ে শ্রীমতী বারওয়েল শেষের দিকে রাখা একটা বুক-মার্ক (নিশানা) পেলেন। সেইটা দেখিয়ে বললেন, "তিনি শেষ অধ্যায়ের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন।"

আমি কোনো উত্তর দিইনি। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী বারওয়েল কি বুঝলেন কে জানে। গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "Don't be disappointed my dear boy—হতাশ হয়ো না। এই তো আমাদের শেষ নয়। আমরা সবাই আবার এই পৃথিবীতে আসবো। তিনিও আসবেন। তাঁর কোনো উপায় নেই, তাঁকে এই ভারতবর্ষেই জন্ম নিতে হবে।"

একটু থেমে মেমসায়েব বললেন, "আমরা সবাই প্রতীক্ষা করবো সেদিনের জন্য, যেদিন আমরা সবাই আবার ফিরে আসবো।"

আমি পূর্বজন্মে বিশ্বাস করি না। মৃত্যুর পর আত্মা নতুন রূপে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে কিনা তা নিয়ে বৃথা মাথা ঘামিয়ে কোনোদিন সময় নষ্ট করিনি।

কিন্তু তবুও সেদিন কোনো প্রতিবাদ করতে পারিনি। মনের অতি গভীর গহ্বর থেকে কে যেন আমাকে আস্তে আস্তে বললে, "ক্ষতি কী? পাও না পাও, আশা করতে ক্ষতি কী?"

কথার মোড় ফিরিয়ে সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি কি দেশে ফিরে যাবেন ?"

"না না, মোটেই না। তোমাদের সেই ফেমাস বাংলা কবিতা মনে পড়ছে, যার মানে—আমার এই দেশেতে জন্ম, আমি যেন এই দেশেতে মরি। আমি অবশ্য এই দেশে জন্মাইনি, কিন্তু জীবনের শেষ ক'টা দিন এখানে কাটিয়ে এইখানে মরতে ক্ষতি কী ?"

তারপর অনেকদিন কেটেছে। শোকের তীব্র অনুভূতির মধ্যে যে সঙ্কল্প তিনি আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন, তা পরিবর্তন করে জীবন-সায়াহ্নে পিত্রালয়ে ফিরে গেলে পৃথিবীর কেউ এই নিঃসঙ্গ মহিলাকে দোষ দিত না। কিন্তু সত্তরের কাছাকাছি এসেও ইংরাজ-নন্দিনী আজও ভারতের মাটি আঁকড়ে পড়ে রয়েছেন। অপেক্ষা করছেন সেইদিনের জন্য, যেদিন ওপারের আহ্বানে তাঁকে সোনার তরীর পাল খুলে দিতে হবে।

আর কেউ না হোক, এতে আমি উপকৃত হয়েছি। তাঁর সান্নিধ্যে আমি এক আশ্চর্য ঐশ্বর্যময় ভুবনকে আবিষ্কার করেছি। অবাক বিস্ময়ে নিজের অসীম সৌভাগ্যের জন্য নিজেই ঈর্ষান্বিত হয়েছি। কিন্তু সে তো অন্য কথা।

১৯৫৯ সালে শরৎকালের এক সন্ধ্যায় কুমায়ুন-উপত্যকার বুকে আমরা দু'জনে মুখোমুখি বসেছিলাম। হঠাৎ বললাম, "আপনাকে কেউ চিনলো না, জানলো না। আমার বই পড়ে অনেকের ধারণা হলো, কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ-ব্যারিস্টার বিয়ে করেননি।"

আমার কাঁধে তাঁর প্রায় সত্তর বছরের পুরনো হাতখানা রেখে স্নিগ্ধ হাস্যে তিনি বললেন, "তোমার দোষ কী ? উনি যত দিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তুমি তো আমাকে জানতে না।"

"কিন্তু এখন ? এখন তো আপনাকে আমি জানি।"

পশ্চিম আকাশের অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "ইয়েস, মাই বয়, এখন তুমি আমাকে জানো। এবং কে বলতে পারে একদিন তোমাকে এইখানে রেখে আমিও যখন জীবন-সাগরের ওপারে চলে যাবো, তখন তুমি আবার এই কুমায়ুন পাহাড়ে বেড়াতে আসবে না, আর এই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আমার কথা ভাববে না ? কে জানে রাণী-ক্ষেতের ডাকবাংলোতে ফিরে

এসে সেই রাত্রে আলো জ্বেলে হয়তো তুমি আমাদের কথাই আবার লিখতে বসবে।"*

আইনের জগতে সায়েবের পরেই যাঁকে আমার মনে পড়ে তাঁর নাম ছোকাদা। যখন শুনি হাইকোর্টের বাবু ছোকাদা কত অজানারে-র পাঠক পাঠিকাদেরও প্রিয় চরিত্র, তখন আমার আনন্দের অবধি থাকে না।

অনেকদিন পরে সেদিন ছোকাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। শনিবারের ভোরবেলা থেকেই সেদিন বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। কাজে বেরুতে পারিনি। আর আকাশের কান্নার সুযোগ নিয়ে, মনের মাটিতেও কখন যে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল খেয়াল করিনি। হঠাৎ পুরনো দিনের শুকিয়ে যাওয়া কথাগুলো বৃষ্টিতে ভেজা গাছের পাতার মতো সজীব সবুজ হয়ে চোখের সামনে নড়তে লাগল। মনে পড়ে গেল, আমি নিজেরই অজ্ঞাতে কখন অতীতকে ত্যাগ করে এসেছি; ভালবাসার বৃক্ষশিশুদের অবহেলায় এবং অযত্নে আমি মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিয়েছি।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি থামলো, সূর্য আপিসের লেট-করা বাবুদের মতো সলজ্জভাবে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। মনের মাটিতে কেন জানি না তখনও বর্ষণের বিরতি হলো না। মনে হলো, একবার আইন-পাড়ায় যাওয়া প্রয়োজন। যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেন, তাঁরাও মাঝে মাঝে জন্মভূমি দর্শন করতে আসেন, কিন্তু আমি তাও করিনি। সেই যে ছেড়েছি আর হাইকোর্ট-মুখো হইনি।

শনিবারটা হাইকোর্টে প্রায়-ছুটির দিন, ওদিন কোর্ট বসে না। ব্যারিস্টার সায়েবরা কালো কোট না চাপিয়েই বার-লাইব্রেরিতে আসেন, বাবুদেরও অতো ব্যস্ত থাকতে হয় না। ছোকাদার ভাষায়, "কাজের আঠাটা হঠাৎ যেন একেবারে জোলো হয়ে যায়—কেবল হড় হুড় করে, কিছুতেই চ্যাট চ্যাট করে না।

---

*কৌতূহলী পাঠক India Without Sentiment, Marion Barwell (New Age Publishers) বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

ওইখানেই বার-লাইব্রেরির সামনের বেঞ্চিগুলোতে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাজের তাড়া নেই, কোর্টে হাজিরা দেবার তাগিদ নেই; সায়েবদের ঘন ঘন সেলামে বেঞ্চি ছেড়ে ওঠার প্রয়োজনও নেই। তাই যেন আড্ডাটা বেশ জমাট হয়ে উঠেছে আজ। বিড়ির ধোঁয়ায় সমস্ত বারান্দাটা যেন শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফরম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছনের বেঞ্চিগুলো ছোকরারা কাছে টেনে এনেছে। কারণ আজ ছোকাদা এসেছেন—তাই সর্বদলের এই রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স।

ছোকাদা বেশ আসর জমিয়েই গল্প করছিলেন। এতো জমাট যে একটা বাইরের লোক কোন সময়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা ওরা দেখতেই পেল না।

আমি শুনলাম, ছোকাদা হাত-পা নেড়ে বললেন, "ওরে, এর নাম কলকাতা হাইকোর্ট। মরা হাতীও যাকে বলে কিনা, লাখ টাকা!"

"মানে?" একজন বাবু ফোড়ন কাটলো।

"মানে, এর আর তুলনা নেই। যেমন 'বার', তেমন 'বেঞ্চি'। যতো বড়ো আইনের কেষ্টবিষ্টু হও না কেন, এই কলকাতা হাইকোর্টেশ্বরের কাছে ছুঁচ বিক্রি করতে এসো না।"

"ওরা বুঝি সবাই ছুঁচের ব্যবসা করে?" একজন ছোকাদাকে চটিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলে।

"পাকামো করিসনি বিশে। ছুঁচ বিক্রি না করুক চান্স পেলে আমাদের এই আবাগী কলকাতার পিছনে ছুঁচ ফোটাতে কেউ ছাড়ে না। দেখছিস না, যে পাচ্ছে সেই গলা ফাটিয়ে বলছে শহর না ট্যাঁড়স—আসলে একটা দুঃস্বপ্ন; দুনিয়ার ওঁছা নোংরাতম এবং ত্যাঁদড়তম জায়গা। এমন বদমেজাজী এবং কিচেল শহর পাঁচটা মহাদেশের ম্যাপে আর একটাও পাওয়া যাবে না।"

ছোকাদার কলকাতা প্রীতি সম্বন্ধে লেকচার হয়তো আরও অনেকক্ষণ চলতো, কিন্তু ঠিক সময়ে আমার উপর তাঁর নজর পড়লো এবং আমাকে দেখেই তাঁর বক্তৃতায় বাধা পড়লো। "আরে, এই যে ভায়া এসো। সূর্য কী আজ পশ্চিমে উঠলো?"

লজ্জায় কান দুটো গরম হয়ে উঠলে। ছোকাদা বেঞ্চিতে বসবার

জায়গা করে দিয়ে বললেন, "তা, ভায়া আমাদের এখন শরৎ চাটুজ্যের দলে নাম লিখিয়েছেন, এখন আর এ-সব জায়গায় আসতে ইচ্ছে করবে কেন ?"

বললাম, "ছোকাদা, আপনিই তো বলেছিলেন দাঁড়কাক শত চেষ্টা করলেও ময়ূর হতে পারবে না।"

আমার পুরনো বন্ধুরা কিন্তু আমাকে আক্রমণ করবার এমন সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। বললেন, "কিন্তু আঙ্গুলের কলাগাছ হতে আপত্তি কী ?"

বন্ধুরা আরও বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছোকাদা রক্ষে করে দিলেন। বললেন, 'সব শর্মাকে ছেড়ে দিয়ে তোরা শেষ পর্যন্ত গোবেচারা ছেলেটাকে ধরলি! তোদের মরণ আর কি। চোখের সামনে কত আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ কেন, তালগাছ হয়ে গেল, তাদের তো কিছু বলতে সাহস করিস না। এখন যাঁরা রাজত্ব করছেন, তাঁরা কোনোদিন স্বপ্নেও এসব ভেবেছিলেন ? ওরে, এ যুগে জন্মালে তোদের এই ছোকা ঘোষও বাবু না হয়ে সায়েব হয়ে যেতো।"

"অ্যাডভোকেট কেন, তুমি অ্যাডভোকেট-জেনারেল হয়ে যেতে। স্রেফ কথার জোরে যেভাবে তুমি দিনকে রাত আর রাতকে দিন করো তাতে বাবুদের এই বেঞ্চিতে না বসে তোমার কোর্টের বেঞ্চে বসা উচিত ছিল।"

"পটলা, বচ্ছরকারদিন মিছিমিছি জ্বালাসনি! সেদিনের ছোকরা, কথার মূল্য তোরা কি বুঝবি ?" ছোকাদা বললেন, "এ পাড়ায় সবাই তো কথা বেচে খায়। কথাই তো এখানকার মূলধন—তাছাড়া এখানে আর কী কলকব্জা আছে ?"

আমি বললাম, "কেন ছোকদাকে বিরক্ত করছো তোমরা ?"

"বিরক্ত করবার মুরোদ যদি থাকে, তবে গবরমেণ্টকে বিরক্ত করগে যা না; আমার উপর ঝাল ঝাড়ছিস কেন ?" ছোকাদা হাসতে হাসতে বললেন।

এবার সুযোগ পেয়ে বললাম, "ছোকাদা, আগে যা বলছিলেন তাই বলুন। আনন্দ করে শোনা যাক।"

ছোকাদা বললেন, "হাজার হোক আইনবুদ্ধিতে কলকাতা চিরকালই কলকাতা। দুনিয়া ঢুঁড়লে এমন বার-লাইব্রেরি আর কোথাও পাবে না।

আমরা দেখেছি—লর্ড সিন্‌হা, স্যর এন, এন, সরকার, বিনোদ মিটার, এস. এন. ব্যানার্জী, এল. পি. ই. পিউ, ল্যাংফোর্ড জেমস্। অথচ তখনই শুনেছি, বনোয়ারীবাবু বলতেন "সে বার নেই, সে বেঞ্চিও নেই।"

"যেমন তুমি এখন দুঃখ করো, সে রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই, একজন ব্যঙ্গের সুরে বললে।

ছোকাদা একটু রেগে উঠলেন। "যা বলছি, তার উপর কোনো আপিল নেই। এ একেবারে সুপ্রীম কোর্টের রুলিং।" একটু থেমে ছোকাদা বললেন, "আমার কথা তোরা এখন শুনছিস না। পরে যখন এইগুলোই জড় করে কেউ লিখে দেবে, তখন হুমড়ি খেয়ে পকেট থেকে পাঁচটি টাকা খরচ করে বই কিনে পড়বি। তোদের স্বভাবই এই।"

এবার সবাই আমরা হাঁ হাঁ করে উঠলাম। বললাম, যে এবার ছোকাদার কথার স্রোতে বাধা দেবে তাকে খরচার ডিক্রি দিতে হবে। এতগুলো লোককে চা-সিঙাড়া খাওয়াতে হবে তাকে।"

ছোকাদা আরম্ভ করলেন—

"গল্পটা তোদের বলি। শুনলে যদি তোদের চৈতন্যোদয় হয়। যদি বুঝতে পারিস, এ শর্মা যা বলে, তা ভেবে-চিন্তেই বলে। এতোদের আজকালকার কাউন্সেল নয়, ছাই ভস্ম মুখে যা এল তাই বলে গেল; কষ্ট হবে বলে ব্রেনটাকে একবারও খাটালো না।"

আমরা বললাম, "দাদা, গল্প যদি শুনতেই হয়, তবে এখানে কেন? তার থেকে পাঞ্জাবীর চায়ের দোকানে চলুন না কেন। সামনেই বাবা হাইকোর্টেশ্বর থাকবেন। ত্রি-কাল ধরে তিনি হাইকোর্টকে রক্ষা করে এসেছেন, আমাদের সুবিধা-অসুবিধাটাও বুঝবেন। আর শনিবারের এই অসময়ে দোকানটা ভরিয়ে রাখলে পাঞ্জাবীও খুশী হবে।"

"ওর তো খুশী হওয়ারই কথা," ছোকাদা বললেন। দোকানের ওই ঢিবিটাতে উবু হয়ে বসে সর্দারজী এতোদিন ধরে যা আইনের গল্প শুনেছে, তাতে আমার ভয় হয় কোনদিন না দোকানে তালা দিয়ে আদালতে প্র্যাকটিস শুরু করে দেয়। আর একথাও তোদের বলে রাখলাম, প্র্যাকটিস যদি আরম্ভ করে, নেহাৎ খারাপ করবে না। এটা জেনে রাখিস, এ-লাইনে এক্সপিরিয়েন্সটাই সব। ওল্ডরাইস সব সময়েই ভাতে বাড়ে। যেমন এই

কলকাতা হাইকোর্ট ধর না। ওল্ড রাইস যতই অন্য জায়গায় বড়ো বড়ো বাড়ি করো, যতোই মোটা মোটা কেতাব নিয়ে বেঁকিয়ে ইংরিজীর ফোয়ারা ছোটাও, বুড়ী ক্যালকাটা ইজ্ বুড়ী ক্যালকাটা।"

এবার অধৈর্য হয়ে বললাম, "আপনার গল্পটা আমরা শুনতে চাই।'

"বেশ, তোমরা তাহলে খরচার ভয়ে এখানে বসেই গ্যাঁজাতে চাও! চায়ের দোকানে যেতে চাও না।" ছোকাদা বললেন। "এখানেই তাহলে গল্প শুরু করছি।"

আমরা সবাই একসঙ্গে বললাম, "শুরু করুন।"

"কিন্তু ওয়ান কণ্ডিশন। আমি যখনই তোমাদের কোনো কোশ্চেন করবো, তখনই উত্তর দিতে হবে। আর যদি তোমরা মেঠো উকিলের মতো বোকা জবাব দাও, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গল্প বন্ধ করে আমি উঠে চলে যাবো। মনে রেখো, এটা যা-তা কেস নয়, ইণ্ডিয়ার সব নামকরা আইন রথী মহারথীরা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন—তেজবাহাদুর সপ্রু, মতিলাল নেহেরু, এমন কী তোদের জওহরলালও।"

"উনিও বুঝি মস্ত ব্যারিস্টার ছিলেন?" আমাদের শম্ভুচরণ দাস প্রশ্ন করলেন।

ছোকাদা রেগে উঠলেন। "একি তোদের শেয়ার-বাজার যে, আজকের ব্যাঙের ছাতা কালকে বোটানিকাল গার্ডেনের বটগাছ হয়ে যাবে। এর নাম কোর্ট। উনি আর প্র্যাকটিস করলেন কই যে বড়ো হবেন? হ্যাঁ, তবে বাপের বহু ব্রীপ ছিল, গান্ধীজির পিছনে না ঘুরে একটু বুঝে-সুঝে যদি চালাতেন, তা হলে হয়তো বাপকেও ছাড়িয়ে যেতেন।" ছোকাদা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ব্যারিস্টারের বাইরেও যে বিরাট জীবন আছে, ছোকাদা কিছুতেই তা বুঝবেন না। পুত্র নেহরু যে পিতার গৌরবকে কবে ম্লান করে দিয়েছেন, ছোকাদা কিছুতেই স্বীকার করবেন না। প্রোফেশনকে যাঁরা অবহেলা করেছেন ছোকাদা কিছুতেই তাদের ক্ষমা করেন না—সে তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ, মোহনদাস গান্ধী বা জওহরলাল নেহরু যে-ই হোন না কেন।

যা-হোক, ছোকাদা এবার শুরু করলেন—

"এ-গল্পের আরম্ভ এখানে হয়। এ-কেসের গোড়াপত্তন যখন শুরু

হয়েছে, তখন এই হাইকোর্টের জন্ম হয়নি। তোমরাও কেউ জন্মগ্রহণ করনি। তোমরা কেন, তোমাদের বাবারাও তখন পৃথিবীর আলো দেখেছেন কিনা সন্দেহ। চলো আমরা পিছিয়ে যাই। পিছোতে পিছোতে ফিরে যাই গত শতকের মাঝামাঝি, যখন সিপাইরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ইংরেজের প্রেষ্টিজের টায়ার ফুটো হয়ে গিয়েছে, রাজত্বও যায় যায় অবস্থা।

ইংরেজের সেই দুর্দিনে সহায়তা করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের যশোবন্ত সিংহ। কিছু জমিজমা ছিল যশোবন্ত সিংহের, আর সামান্য কিছু লোকবল। সেই নিয়েই তিনি ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। ইংরেজরা তারপর অনেক কষ্টে সিপাইদের হারালেন, পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা হিন্দুস্থানের রাজত্বটাও রক্ষে পেয়ে গেল।

অবস্থা আয়ত্তে আসতে পুরনো মনিবরা বিপদের দিনের বন্ধুদের কিন্তু ভুললেন না। ইংরেজরা পুরস্কারের হিসেব-নিকেশ করতে বসলেন। যশোবন্ত সিং বাদ গেলেন না। তিনি পেলেন মস্ত জমিদারী। এক-আধ টাকার সম্পত্তি নয় হে। সে যুগে একটা টাকার কত দাম ছিল জানো তো? সেই যুগেই যখন এই এস্টেট নিয়ে মামলা বাধলো তখন তার দাম ধরা হয়েছিল পঞ্চান্ন লাখ টাকা!

ও-হরি, প্রথমেই মামলার কথা তুলছি কেন? সবে তো সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করেছি। ওই আমার বদস্বভাব—শেষের কথা আগে এসে যায়, আগের কথা শেষে চলে যায়, ফলে গল্প রক্ষে হয় না। তবে ভায়া, রাণী কিশোরীর এই কেসটাকে তোমরা গল্প বলে ভুল কোর না। ভূ-ভারতে এমন অদ্ভুত ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে তো শুনিনি। এমন ঘটনা একমাত্র ঘটলেও ঘটতে পারতো কাজীদের সময়ে। তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, স্রেফ ছাপানো ল' রিপোর্টার খুলে দেখিয়ে দেবো। এতে জেলা-কোর্টের জজ ছিলেন, হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিস ছিলেন, প্রিভী-কাউন্সিলের বাঘা বাঘা বিচারক ছিলেন, তেজবাহাদুর সপ্রু, মতিলাল নেহরু, স্যার জন সাইমন (ওই গো, তোমাদের সাইমন কমিশনের সাইমন—যাকে কালো পতাকা দেখিয়ে বলেছিলে—গো ব্যাক সাইমন), কাটজু সাহেব, এমন কি তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার নেহরুও ছিলেন। তখন অবশ্য উনি এ-সব

নিয়ে…" আরও কি সব ছোকাদা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন।

"ওহো, আসল গল্পকে রাস্তায় বটতলায় বসিয়ে রেখে আমি কতদূর চলে এসেছি। যা বলছিলাম, যশোবন্ত সিংহের দিকে লক্ষ্মী তো মুখ তুলে চাইলেন। তিনি তখন রাজা যশোবন্ত। রাজা থাকলেই রাণী থাকতে হবে। তাঁর এক রাণীর নাম রতন কুয়ার। রতন কুয়ারের গর্ভে জন্ম নেন তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান বলবন্ত সিং! বলবন্ত সিংহের জন্ম হলো অবশ্য সিপাহীবিদ্রোহের অনেক আগে—১৮৪১ সালে। অর্থাৎ, যে-সালে কিনা বিদ্যাসাগর মশায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাস্টারি করতে ঢুকলেন।"

"দাদা আবার হিস্ট্রি-ফিস্ট্রির মধ্যে কবে থেকে ঢুকলেন? আমাদের একজন বন্ধু টিপ্পনী কাটলেন।

আর তা শুনেই, ছোকাদা বেজায় চটে উঠলেন। "কেন? কুঁজো বলে চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে না? হাইকোর্টে বাবুগিরি করি বলে কি হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির সঙ্গে আমাদের জুডিসিয়াল সেপারেশন হয়ে গিয়েছে? ঠিক হ্যায়, তোমরা তোমাদের রেসের ঘোড়া, থিয়েটারের মেয়েছেলে, আর সাহেবের ব্রীফ নিয়ে থাকো। এ শর্মা আর তোমাদের সামনে কোনোদিন মুখ খুলছে না। মুখে গডরেজের তালা লাগিয়ে চাবিটা এই সমুদ্রের জলে ফেলে দিলুম।"

বলবার সঙ্গে সঙ্গে ছোকাদা এমনভাবে হাত ঘোরালেন যেন অদৃশ্য একটা চাবি দিয়ে তালা লাগিয়ে সত্যই চাবিটাকে রেলিঙের উপর দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছেন। আর একজন ছোকরা বাবুও মুহূর্তের মধ্যে এমন ভাবে হাত নাড়লেন, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মূল্যবান চাবিটাকে কোনো-ক্রমে লুফে নিলেন। তারপর আবার সাধাসাধির পালা! আর কখনও হবে না। এই শেষ। আপনি আবার মুখ খুলুন। যদি আর কেউ কিছু বলে, তাহলে আপনার কাসুন্দের সবচেয়ে ঘেয়ো কুকুরটাকে আমার নাম ধরে ডাকবেন, ইত্যাদি।

"বেশ, এই তোমাদের লাস্ট চান্স দিচ্ছি। তবে মনে রেখো, আপিল করতে করতে এবার সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত তোমাদের শেষ হয়ে গেল।" এই বলে ছোকাদা আবার আরম্ভ করলেন—

"রাজা যশোবন্ত সিংহের একমাত্র পুত্রসন্তান বলবন্ত সিংহ। রাজার নয়নের মণি। কিন্তু স্বভাবে যেন সাউথ পোল আর নর্থ পোল। অমন ধর্মভীরু, সৎচরিত্র বাবার অমন ছেলে! ছেলেকে সংশোধন করবার জন্য রাজা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন—ছেলের বিয়ে দিলেন। কিন্তু অমন অব্যর্থ পেনিসিলিনেও কাজ হলো না। ছেলের চরিত্র যেমন তেমনিই রয়ে গেল।

কেউ বললে, 'ভাগ্য, বাপের কপালে কষ্ট লেখা না থাকলে এমন ছেলে হয়।'

আবার কেউ আড়ালে বললে, 'সিপাইদের নিষ্পাপ রক্তে হিন্দু স্থানের জমি এখনও ভিজে রয়েছে। উপরের উনি যতোই উদাসীন হোন, কিছুই কি আর দেখছেন না?'

এদিকে মনের দুঃখে রাজার ঘুম হয় না। হা ঈশ্বর, আমার কপালে এই ছেলে ছিল?

তারপর একদিন মহারাজা খবর পেয়ে চমকে উঠলেন। তাঁর ছেলে খুনের দায়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। এমন যে হতে পারে, তা ভেবে অনেক দিন রাত্রে তিনি শিউরে উঠেছেন। খুন! পুলিস! আদালত! তারপর ফাঁসি-কাঠ, না জেল—কে জানে।

পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না।

কর্মচারীদের তলব হলো। সেরা উকিলদের ডাক পড়ল। 'আমার ছেলেটাকে রক্ষে করবার জন্য যা হয় করুন। আপনাদের মাথায় আইনের যতো কূটবুদ্ধি আছে সব প্রয়োগ করুন। অনুগ্রহ করে ছেলেটাকে প্রাণে বাঁচান। আমার বংশের একমাত্র পুত্রসন্তান—আমার এই রাজত্বের একমাত্র উত্তরাধিকারী। আপনারা কোনো রকম লজ্জিত হবেন না—আমার রাজকোষে অনেক টাকা আছে। আপনাদের যোগ্য সম্মানমূল্য দিতে আমি একটুও দ্বিধা করবো না।' রাজা যশোবন্ত সিং, কাতর অনুনয় করলেন।

কিন্তু বাপু, এর নাম ইংরেজ রাজত্ব। টাকা দিলেই কি আর আইনের হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া যায়! উকিলরা খুব লড়লেন, রাজা যশোবন্ত সিংহ প্রচুর অর্থব্যয় করলেন। তারপর একদিন আদালতের রায় বেরুলো। বলবন্ত সিংহের গলাটা তেলমাখানো দড়ির ফাঁস থেকে কোনোরকমে বেঁচে গেল; কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বলবন্ত সিংহ মুখ নীচু করে যেদিন নিজের দণ্ডাদেশ শুনলেন, তখন তাঁর বয়স তিরিশ বছর।

শোকে মুহ্যমান রাজা যশোবন্ত রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ১৮৭১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। তাঁর জীবনের পঞ্জিকা ওইখানেই এসে যেন চিরকালের জন্যে থেমে গেল। যশোবন্ত সিংহের ছেলে খুনি! জেলখানার পাতায় একজন ঘৃণ্য অপরাধীর নামের পাশে লেখা আছে—কয়েদীর বাবার নাম রাজা যশোবন্ত সিংহ!

মর্মবেদনার একটা গুণ আছে। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে। নিজের বেদনায় কাতর হয়ে, নিজেকে অনেকদিন ভুলে ছিলেন রাজা যশোবন্ত সিংহ। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি যেন আবার মনকে দৃঢ় করে বাইরের দিকে চোখ মেলে তাকালেন। ভাগ্যদেবতা তাঁকে ঐশ্বর্যে মুড়ে রাখলেও আঘাত কম দিলেন না। পুত্রের সংবাদ সহ্য করতে না পেরে বড়োরাণী একদিন চিরশান্তির সাগরে ডুব দিলেন।

বলবন্তের সুন্দরী স্ত্রী নারায়ণী। পুত্রবধূর দিকে তাকাতে সাহস করতেন না রাজা। রাজপ্রাসাদের নির্জন কক্ষে পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে সে চোখের জল ফেলছে; আর তার স্বামী জেলখানার সেলে কয়েদীর পোশাক পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আর একটা রাত্রি অতিবাহিত করছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাজা যশোবন্ত নিজের অন্তর্যামীকে প্রশ্ন করছিলেন, 'আর যে সহ্য হয় না। বলো কী করবো?'

রাজা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। হিসেব করতে বসলেন তিনি। তাইতো, তিন বছর আগেই তো তিনি ষাট বছরের সীমানা পেরিয়ে এসেছেন! তাঁর আর কোনো আশা নেই। পুত্রের মধ্যে দিয়ে বংশধারা রক্ষা করবার আশা চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছে।

হয়তো উন্মত্ত হয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু পুত্রভাগ্য খারাপ হলেও স্ত্রীভাগ্যে তিনি গর্বিত। তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী রাণী কিশোরী। সত্যি কিশোরী। তাঁর সঙ্গে অনেক বয়সের পার্থক্য ওই অলোকসামান্যা রূপসীর। রূপসী তিনি অনেক দেখেছেন। কিন্তু এ রূপসী যেন স্বয়ং লক্ষ্মী—প্রখরা বুদ্ধিমতী এবং কর্তব্যপরায়ণা। তাঁরই স্নেহ প্রচ্ছায়ে এই অসহনীয় দিনগুলো কোনোক্রমে সহ্য করে চলেছেন রাজা।

রাজা বলেন, 'রাণী, তুমি না থাকলে আমার কী যে হতো ! নিজের সুখের কথা কখনও চিন্তা করলে না তুমি, সর্বদা শুধু নিজের কর্তব্যই করে গেলে।'

রাণী কিশোরী মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকেন। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমার কর্তব্য তো করতে পারিনি। আপনাকে দ্বিতীয় বংশধর দিতে পারিনি। আপনার রক্তধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য একটি কন্যাসন্তানকে পৃথিবীতে এনেই চুপচাপ বসে আছি।'

রাজা যশোবন্তের সুবিশাল দেহটা এবার কেঁপে উঠলো। দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'না রাণী, তোমার কর্তব্যের এখনও শুরু হয়নি। তোমাকে আরও অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।'

'দায়িত্ব ?' রাণী যেন চমকে উঠলেন। আমি স্বল্পশিক্ষিতা গৃহবধূ। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনোদিন পরিচিত হইনি। আমি কী দায়িত্ব পালন করতে পারি মহারাজ।'

'এই রাজ্যের দায়িত্ব। আমার অবর্তমানে এই রাজ্যের সব দায়িত্ব তোমাকেই তো গ্রহণ করতে হবে।'

রাণী কিশোরী এসবের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অমঙ্গলের আশঙ্কায় মুখে আঁচল চাপা দিলেন। 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে এ-বিষয়ে চিন্তা করার অনেক সময় পাবেন, প্রভু। এখন থেকে অযথা নিজেকে কেন যন্ত্রণা দিচ্ছেন ?'

'যন্ত্রণা !' রাজা যশোবন্ত সিংহ ম্লান মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলেন। 'যন্ত্রণাকে আর ভয় পাই না কিশোরী। আমি জেনেছি, আমার কোনো পুত্রসন্তান নেই। এটওয়ার জেলে যে লোকটা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে, সে আমার কেউ নয়। সে আমার বংশধর নয়।'

'সে কি মহারাজ, এ-সব কী বলছেন আপনি ?' রাণী কাতরভাবে প্রশ্ন করলেন।

'ঠিকই বলছি রাণী, তাকে আমি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবো ঠিক করেছি। আমার সম্পত্তিতে তার কোনো অধিকার থাকবে না। আমার যা থাকবে তা সবই তোমার—তোমার যেমন খুশি তেমনভাবে ওগুলো পরিচালনা করবে।'

'কিন্তু মহারাজ, যাবজ্জীবন মানে তো আর যাবজ্জীবন নয়। আপনিই তো সেদিন বললেন, পনেরো-ষোলো বছর পরে সে আবার ফিরে আসবে।'

'হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। কিন্তু তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য রাজপ্রাসাদে সেদিন আমি দাঁড়িয়ে থাকবো না। আর রাজপ্রাসাদের মালিক হিসেবে প্রহরীরা যে তাকে সেলাম করবে, আমার বিদেহী আত্মা তাও সহ্য করবে না।'

রাণীর চোখে জল। রাজার চোখে কিন্তু জল নেই। দেহটাকে ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে তাঁর মনটা যেন কোথায় পালিয়ে গিয়েছে।

রাণী ফিসফিস করে কী বললেন।

উত্তরে নিজের মনেই যশোবন্ত সিংহ বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমারই পুত্র-সন্তান। আমারই একমাত্র পুত্রসন্তান। কিন্তু আমি জানবো সে নেই।'

আইনজ্ঞদের কাছে খবর গেল। তাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন যশোবন্ত সিংহ। 'আপনারা সময় ব্যয় না করে দলিল প্রস্তুত করুন।'

দলিলের খসড়া নিয়ে আইনজ্ঞরা আবার এলেন। 'আপনার নির্দেশমতো সব কিছুই আপনার অবর্তমানে রাণী কিশোরী পাবেন। সেই ভাবেই দলিল তৈরি হয়েছে।'

'হ্যাঁ', যশোবন্ত সিংহ কোনো রকমে উত্তর দিলেন।

কিন্তু একি, রাজাকে যেন কেমন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে! 'আপনি কি অন্য কোনো বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করছেন?' তাঁরা প্রশ্ন করলেন।

'আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে, চিন্তার ভাণ্ডার আমি শূন্য করে ফেলেছি। আমার পুত্রসন্তানকে আমি কোনো অধিকারই দিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু ধরুন আমার পুত্রের সন্তান—আমার নাতি?'

'আপনার পুত্রের আবার সন্তান কোথায়? আপনার পুত্রবধূ রাজ-প্রাসাদে, আর পুত্র কারাগারে, কবে সে ফিরবে?'

'যদি', মহারাজ কোনোরকমে শব্দটা উচ্চারণ করলেন। 'যদি। পৃথিবীতে কত যদিই তো সম্ভব হয়েছে, যদি আমার ছেলে ফিরে আসে, যদি তার সন্তান হয়?'

'কোনো যদি তো অন্তহীন নয় মহারাজ', আইনজ্ঞরা বললেন। 'কোথাও তো আপনাকে সীমারেখা টানতেই হবে।

'হ্যাঁ, তা তো বটেই।' মহারাজ বললেন। ষোলো বছর। এই দানপত্রের ষোলো বছরের মধ্যে যদি বলবন্তের কোনো বৈধ পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সে-ই আমাদের রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। রাণী কিশোরী তার হাতে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।'

আইনজ্ঞরা মাথা নাড়লেন। দলিল তৈরি হলো; রাজা সই করলেন, সরকারী শিলমোহর পড়লো।

তখন ১৮৭৫ সাল। রাজার বয়স তেষট্টি, বলবন্তের চৌত্রিশ। তখনও কেউ কী জানতো যে, এমন হবে!—ছোকাদা নিজেই অবাক হয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন।

তারপর বললেন, "আসল গল্পে আমরা এখনও তো আসিনি। এবার সেই অংশটা শোনো।

১৮৭৯ সালের ২৪শে আগস্ট রাজা যশোবন্ত সিংহ তাঁর প্রিয় কিশোরী এবং প্রজাদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন।

শোকের প্রথম আঘাত কাটিয়ে রাণী কিশোরী জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এবং তারপরও আরও অনেকদিন অতিবাহিত হলো।

সেও আগস্ট মাস। কারাগারের লৌহকপাট একদিন ভোরে উন্মুক্ত হয়ে কাকে যেন বাইরে বার করে দিল। দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং দীর্ঘদিনের অবহেলাও তাঁর জন্মের আভিজাত্যকে ঢাকতে পারছে না। লাখনা স্টেটের উত্তরাধিকার নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর যে এমন হবে কেউ কি জানতো? প্রৌঢ় বলবন্ত সিংহ নিশ্বাসে মুক্ত পৃথিবীর বায়ু গ্রহণ করলেন। ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর আপন মনে হাঁটতে শুরু করলেন।

কিন্তু জেলের দরজার কাছে যেন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে! হ্যাঁ, লাখনা স্টেটের ফিটন গাড়ি! রাণী কিশোরী তাঁর সতীনের বিপথগামী সন্তানকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন।

গাড়ীতে চড়েই প্রাসাদে ফিরে এলেন বলবন্ত সিংহ। অভ্যর্থনা এবং আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি করলেন না রাণী। সময়মতো তাঁকে স্বামীর দানপত্রের কথাও জানালেন। 'তবে তাতে কিছু এসে যায় না। অনেকদিন

কষ্ট সহ্য করেছ। বিনা অপরাধে বৌমাও বহু কষ্ট সহ্য করেছেন। এবার দুজনে মিলে সংসার করো, শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করো।'

কোনো উত্তর দিলেন না বলবন্ত সিংহ। বয়স তাঁরও কম হলো না! স্ত্রী নারায়ণীর চোখের জলও যেন বাধা মানতে চাইছে না। জীবনের বাকী ক'টা দিন বিনা উত্তেজনায় এবং বিনা অশান্তিতেই কাটিয়ে দেবেন। রাণী কিশোরী তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ত্রুটিই করবেন না। বাবা তাঁকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে গিয়েছেন, কিন্তু বলবন্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কিছু আছে। ভালোভাবেই চলে যাবে।

কিছুদিন সত্যই ভালোভাবে চললো। তারপর বলবন্ত সিংহের রাজকীয় রক্ত আবার উষ্ণ হয়ে উঠলো। অসম্ভব। বাবার ত্যাজ্যপুত্র সে। অসহ্য এ অপমান। বিমাতার করুণাভিখারী হয়ে রাজা যশোবন্ত সিংহের একমাত্র পুত্রকে বেঁচে থাকতে হবে! কিছুতেই নয়।

সব বাজে। কে বললে, ঐ দানপত্রের কোনো মূল্য আছে? আইনের কাছে, অন্তরাত্মার কাছে, একটুকরো ঐ কাগজের কোনো মূল্য নেই। রাজা যশোবন্তের দানপত্র বে-আইনী। সম্পূর্ণ মূল্যহীন। লাখনা এস্টেটের যদি কেউ মালিক থাকে, সে আমি—রাজা যশোবন্তের একমাত্র পুত্র বলবন্ত সিংহ। শান্তভাবে বিধবা রাণী কিশোরী সপত্নীপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'বলবন্ত, তোমার সবরকম অনুরোধ রক্ষা করতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমার বা বৌমার সুখের জন্য কোনোরকম ব্যয় করতেও আমি কার্পণ্য করবো না। কিন্তু মনে রেখো, তোমার বাবার শেষ ইচ্ছা পালন করবার দায়িত্ব আমার উপর। সেখানে আমি পর্বতের মতো অটল, কোনো আঘাতই আমার কিছু করতে পারবে না।'

হা হা করে হেসে উঠলেন বলবন্ত সিংহ।

শান্তভাবে স্বামীর ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন রাণী কিশোরী। ঠাকুরকে বললেন, 'আমায় শক্তি দাও। আমাকে দৃঢ় করো প্রভু।'

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন বলবন্ত সিংহ। মামলা দায়ের করলেন—যশোবন্ত সিংহের দলিল আইনগত অসিদ্ধ। রাণী কর্মচারীদের ডাকলেন, মামলার তদ্বিরে যেন কোনোরকম গাফিলতি না হয়। এ-যুদ্ধে এক পা

পিছিয়ে আসতে তিনি প্রস্তুত নন। আইনের লড়াই যখন শুরু হয়েছে, তখন 'তা ভালোভাবেই চলুক।

এ তো আর হাতে-হাতে যুদ্ধ নয়। আইনের কুস্তি—ফয়সালা হতে সময় লাগে। বিশ্বযুদ্ধও এর অনেক আগে শেষ হয়ে যায়। এক আদালতে হেরে গিয়ে বলবন্ত আর এক আদালতে যান। রাণী কিশোরীও পিছন পিছন ছোটেন, আবার হারিয়ে দেন। আইন যে তাঁর পক্ষে—যশোবন্ত সিংহের দলিল করবার ক্ষমতা ছিল না, এ-কথা কে বিশ্বাস করবে?

প্রতিবারে রায় বেরোয়—রাণী হাসেন, এবং বলবন্ত সিংহ আরও জ্বলে উঠেন। ছাড়বেন না তিনি। কিছুতেই ছাড়বেন না। রাণী কিশোরীকে সমুচিত শিক্ষা দেবেনই তিনি।

সব আদালতে হেরে গিয়েও দমলেন না বলবন্ত সিংহ। বললেন, 'ওস্তাদের মার শেষরাত্রে। রাণী কিশোরী এবার বুঝতে পারবেন।'

'কী বুঝতে পারবেন?'

'শিগ্‌গীরই বুঝতে পারবেন। এখনও দানপত্রের ষোলবছর পেরিয়ে যায়নি। আমার প্রথমা স্ত্রীর আর সন্তান সম্ভাবনা নেই। আমি আবার বিয়ে করছি।'

'বিয়ে! কেন, আমি কী অপরাধ করেছি? কোন অপরাধে আমার সমস্ত যৌবন নিষ্ফল অপেক্ষায় অতিবাহিত হয়েছে? কী অপরাধে তুমি এখন আমাকে আবার অপমান করবে?' নারায়ণীবাঈ প্রতিবাদ করেছিলেন।

বলবন্ত সিংহ উত্তর দেননি। কর্মচারীদের বলেছিলেন, 'ঘোড়া সাজাও, নহবত বসাও। উৎসবের আয়োজন করো—আটঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বলবন্ত সিংহ বিবাহ-বাসরে যাবেন।

আঠারোশো নব্বই সালের সে বিয়ের বর্ণনাও তোমাদের দিতে পারতাম। রাজা-রাজড়ার বিয়ের গল্প তোমাদের ভালোও লাগতো। কিন্তু, আমাদের আসল গল্প এখনও শুরু হয়নি। সবে তো বিয়ে হলো। একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলে তবে আমরা নায়কের জন্মদিনে এসে হাজির হতে পারব।

এ-গল্পের নায়ক নরসিংহ রাও-এর জন্মদিন আঠারোশো চুরানব্বই

সালের ২রা মার্চ। আকাশে হাউই উড়লো ; বলবন্ত সিংহের বাড়ির অঙ্গনে বাজী ফুটলো। আশেপাশের গ্রামের লোকদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরিত হলো।

'কী ব্যাপার ?'

'পরম সৌভাগ্য। ঈশ্বরের কৃপায় আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমার প্রথমা স্ত্রী যা পারেনি, আমার বধূ তুন্নাজু তা পেরেছে। লাখনারাজের বংশধারা এবার সুদৃঢ় হলো !'

রাণী কিশোরীর কাছেও যথাসময়ে খবর গেল। রাণী হাসলেন। 'বলবন্তের ঔরসে তুন্নাজুর গর্ভে লাখনারাজের বংশধর জন্মগ্রহণ করেছে ! বটে ! তাই বুঝি এতো উৎসব, নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীতের আয়োজন !'

রাণীর বিশ্বস্ত চররা ইতিমধ্যে গোপন অনুসন্ধান শেষ করে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। রুদ্ধদ্বার-কক্ষে সভা বসলো। রাণীর সঙ্গে সেখানে তাদের কী আলোচনা হলো কে জানে। কিন্তু, সভার পরই রাও যশোবন্ত সিংহের মূল দানপত্রের খোঁজ পড়লো। মন দিয়ে সেই ঐতিহাসিক দলিল রাণী সাহেবা আবার পড়লেন। দলিলের দু'টি নকল তৈরি করা হলো।

তারপর রাণীর দুজন বিশ্বস্ত প্রতিনিধিকে সেই নকল দু'টি নিয়ে লাখনা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল। রেল-স্টেশনে এসে তাঁরা ট্রেন ধরলেন। তাঁরা কোথায় গেলেন জানো ?"—ছোকাদা আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমরা কি জান-বাড়ির জান যে, টিকিট না দেখেই কে কোথায় যাচ্ছে বলে দেবো ?" একজন বাবু রেগে উত্তর দিলেন।

ছোকাদা কিন্তু রাগ করলেন না। হেসে বললেন, "তাঁদের একজন এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে গেলেন। তিনি দেখা করবেন ব্যারিস্টার মতিলাল নেহরুর সঙ্গে। আর একজন সোজা চললেন কলকাতায়।"

মতিলাল নেহরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ? রাণীসাহেবার খবর ভাল তো ?'

'আজ্ঞে, বলবন্ত সিংহ ঘোষণা করেছেন, তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। দানপত্রের মেয়াদ শেষ হবার কয়েক মাস আগেই। কিন্তু রাণীসাহেবা বিশেষ সূত্রে সংবাদ পেয়েছেন, খবরটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। একেবারে সাজানো। নরসিংহ রাও বলে যে শিশুটিকে বলবন্ত সিংহ বুকে করে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন তার জন্মের পিছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। নরসিংহ রাও আর যাই হোক, বলবন্ত সিংহ এবং দুন্নাজুর সন্তান নয়।'

মতিলাল নেহরু কাগজপত্তর ঘাঁটলেন। ছোকরা ব্যারিস্টার মতিলাল, তখন মাত্র তেত্রিশ বছর বয়েস। ফাইল থেকে মুখ তুলে মতিলাল বললেন, 'তাই তো, খবরটা মোটেই ভালো নয়। এখনই এই ষড়যন্ত্র ফাঁস না করলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘটতে পারে।'

মতিলাল নেহরু তাঁর মতামত লিখলেন—'আমার মনে হয়, রাণী-সাহেবা এখনই আদালতে মামলা করুন। আদালতকে ঘোষণা করতে বলা হোক নরসিংহ রাও বলবন্ত সিংহের সন্তান নয়।'

এদিকে কলকাতায়, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল রাণীর প্রতিনিধিকে বললেন, 'আপনার কাছে সমস্ত ঘটনা তো শুনলাম। দলিলটা আজকের মত রেখে যান।'

কয়েকদিন পরে রাণীর প্রতিনিধি আবার খোঁজ নিতে এলেন। বললেন, 'বলবন্ত সিংহের ষড়যন্ত্র কি সর্বনাশা বুঝুন। তাকে বুদ্ধি দেবার জন্য অনেক বাছা বাছা আইনের মাথা খাটছে, আমরা এখন থেকে সাবধান না হলে, ওরা আমাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে।'

অ্যাডভোকেট-জেনারেল ব্যস্ত মানুষ। তাঁর কানে যেন কোনো কথাই পৌঁছল না। একটা কাগজে লিখে দিলেন, 'দলিলটা মন দিয়ে পড়লাম। অনেক গণ্ডগোল আছে। রাণী কিশোরীর বর্তমানে নিজেকে ব্যস্ত করবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

দুটি মতামতই রাণী শুনলেন। তাঁর নিজেরও তখন কোর্টে যেতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। একটি নবজাত শিশু তার তথাকথিত পিতা-মাতার সন্তান নয়, এই অভিযোগ নিয়ে আদালতে যেতে তাঁর মন কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

কর্মচারীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করবেন?'

রাণী বললেন, 'মনস্থির করে উঠতে পারছি না। আরও কিছুদিন যাক।'

লাখনা এস্টেটের মৃত্যুবাণ এদিকে বলবন্ত সিংহের কোলে তিলে তিলে বেড়ে উঠছে। বলবন্ত ডাকেন—রাও নরসিংহ! নবজাত শিশু কেমন করে যেন বলবন্তের নয়নের মণি হয়ে উঠলো। সর্বদা তাকে সঙ্গে নিয়ে

ঘোরেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্যও সঙ্গছাড়া করতে চান না। উৎসব অনুষ্ঠানে ইংরেজ কলেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আমার একমাত্র বংশধর। এই শিশু, সে যারই হোক না কেন, বলবন্তের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এল। যে বলবন্ত পঁচিশ বছর আগে জেলে গিয়েছিল, এই বলবন্ত যেন সে নয়।

সে বুঝি ১৮৯৯ সালের কথা। নরসিংহ রাওয়ের মায়া কাটিয়ে রাজা যশোবন্ত সিংহের হতভাগ্য পুত্র বলবন্ত সিংহ ওপারের উদ্দেশে রওনা হলেন। আবার গোলযোগের সূচনা হলো।

রাণী কিশোরীর আশ্রিতা, বলবন্তের প্রথমা পত্নী নারায়ণী বললেন, 'আমি আর সহ্য করবো না। বলবন্তের কোনো পুত্রসন্তান নেই।'

কর্তৃপক্ষের কাছে নারায়ণী আবেদন করলেন, মৃত বলবন্তের সম্পত্তি দু'জন অপুত্রক বিধবা—নারায়ণী এবং দুন্নাজুর মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া হোক। নরসিংহ রাও এর মধ্যে আসেনই না।

দুন্নাজু বললেন, 'বলবন্ত সিংহের সম্পত্তিতে আমাদের দু'জনের কোনো অধিকার নেই। সে অধিকার একমাত্র আমার নাবালক পুত্রের।'

নারায়ণী জানালেন, 'আর লোক হাসিও না। ও-ছেলে যে তোমার নয়, তা আমাদের জানতে বাকী নেই। যদি সে তোমারই সন্তান তবে ডাক্তার ডাকছি, তার কাছে পরীক্ষা দাও।'

রেভিনিউ কোর্টের কাছে দুন্নাজু কাতর আবেদন জানালেন। "আমি বাচ্চা ছেলে নিয়ে স্বামী হারিয়েছি। সুযোগ পেয়ে ওরা হিন্দু ব্রাহ্মণের বিধবার সম্মান নিয়ে টানাটানি করছে।'

রেভিনিউ কোর্ট নারায়ণীর অভিযোগে কান দিলেন না। নরসিংহ রাওকেই উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নিলেন তাঁরা; বংশগত 'রাও' উপাধি ব্যবহারের অধিকারও এই ছ' বছরের বালককে দেওয়া হ'লো। তার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হলো।

কোর্ট অফ ওয়ার্ড নরসিংহকে ভালো ইস্কুলে পাঠালেন। সেইখানে সে পড়াশোনা করতে লাগলো। অনেকে রাণী কিশোরীকে বললেন, 'আপনার নাতিটিকে আপনিই দেখাশোনা করুন।'

'নাতি ? আমার কোনো নাতি নেই।' রাণী ঘৃণাভরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

আর বালক নরসিংহ রাও দিন গুণতে লাগলো, কবে সে সাবালক হবে।

১৯১৫ সালে নরসিংহ রাও একুশ বছরে পড়লেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাণী কিশোরী নোটিস পেলেন—"আমি বলবন্ত সিংহের পুত্র নরসিংহ রাও। আমার পিতামহ রাজা যশোবন্ত সিংহের ব্যবস্থা মতো, লাখনা স্টেট বর্তমানে আমার। কয়েকদিন আগে আমি বয়োপ্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং রাজ্যের দায়িত্ব এবং হিসেব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুঝে নিতে চাই।'

রাণী কিশোরী স্তম্ভিত। এতোদিন পরে এমন যে হতে পারে তা তাঁর কল্পনাতেও আসেনি।

রাও নরসিংহ সময় নষ্ট করলেন না। আদালতে মামলা দায়ের করলেন। সে মামলার সংবাদ যখন কাগজে প্রকাশিত হলো, সমস্ত উত্তর ভারত তখন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিচারকের রায়ের উপর পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার জমিদারী এবং অগাধ সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এমন অদ্ভুত মামলার কথাও কেউ কখনো শোনেনি। মনে রেখো, ভাওয়াল মামলা তখনও শুরু হয়নি। ভাওয়ালের মেজোকুমারকে তখনও সকলে মৃত বলেই জানে। দার্জিলিং-এর স্টেপ-অ্যাসাইড থেকে তাঁর মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাঁর দেহের সৎকার হয়েছে বলেই তখনো লোকে জানে।"—ছোকাদা আমাদের মনে করিয়ে দিলেন।

আমাদের কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ছোকাদা আবার আরম্ভ করলেন—"মতিলাল নেহরু সমস্ত ব্রীফটা পড়লেন। সঙ্গে জুনিয়র জওহরলালকে নিয়েছেন। ব্রীফটা মুড়তে মুড়তে বললেন, 'তখনই বলেছিলাম। একুশ বছর আগে রাণী কিশোরীকে মামলা করতে উপদেশ দিয়েছিলাম।'

রাণী প্রথমে চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'আমি স্থির জানি, নরসিংহ ওদের সন্তান নয়। দুন্নাজু কোনো সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেনি।'

মতিলাল নেহরু হাসলেন। 'একুশ বছর আগে ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করবার

চেষ্টা করলে কতো ভাল হতো। তখন অনেক প্রমাণও হয়তো পাওয়া যেতে পারতো। এখন কঠিন লড়াই।' পাশের একজন জুনিয়রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী বলো?'

'তা তো বটেই!' জুনিয়র উত্তর দিলেন। বিশেষ করে যখন অপর পক্ষে ডক্টর তেজবাহাদুর সপ্রুর মতো ব্যারিস্টার রয়েছেন, তখন আমাদের সময়টা খুব সুখে অতিবাহিত হবে বলে মনে হয় না।'

'আমি জানি. আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য, তার বাবার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য বলবন্ত এই বিষবৃক্ষ পুঁতেছিল। বলবন্ত আজ আর নেই। কিন্তু তার চারাগাছে এতোদিনে ফল ধরেছে। কিন্তু আমিও রাণী কিশোরী।'

'কিন্তু আমাদের কী বক্তব্য হবে? নরসিংহের দাবির বিরুদ্ধে আমাদের কী বলবার আছে?' আইন-উপদেষ্টারা প্রশ্ন করলেন।

'বলবার একটি মাত্র বিষয় আছে। বলবন্ত সিংহের ঔরসে কোনোদিন কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। সে অপুত্রক অবস্থায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।' রাণী উত্তর দিলেন।

'তাহলে. এমন অদ্ভুত ষড়যন্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে বড়ো একটা হয়নি।' ওঁরা বললেন।

জেলা আদালত লোকে লোকারণ্য। আইনজগতের এতোগুলো তারকার আকস্মিক আবির্ভাবে এই সামান্য আদালত নতুন রূপ ধারণ করেছে।

ডক্টর তেজবাহাদুর সপ্রু তখনও বড়লাটের ল' মেম্বার হননি। সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর প্রতিপত্তি। যেখানেই দুরূহ মামলা, যেখানেই আইনের চুল-চেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন, সেখানেই সপ্রুসায়েবকে দেখা যায়। তোমাদের এই কলকাতা হাইকোর্টেও।

ডক্টর সপ্রু বললেন, 'ইওর অনার, আমার ক্লায়েন্টের কেস খুবই সহজ। এক ভদ্রলোক এক দলিল করেন। তাঁর পুত্রসন্তানকে বঞ্চিত করে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্ত্রীর উপর দেন—যতো দিন না তাঁর পুত্রের কোনো সন্তান হয়। সেই পুত্রটি একুশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করে; এখন সে বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে এবং লাখনা রাজের মালিকানা দাবি করছে।'

নেহরু বললেন, 'কেস্ এত সোজা হলে, ইওর অনার, আমাদের দু'জনের কেউই আজ এখানে উপস্থিত থাকতেন না। এই কেসের পিছনে যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা আলোচনা করবার স্থান দুর্ভাগ্যক্রমে এই আদালত নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা মৃত বলবন্ত সিংহের কনিষ্ঠা স্ত্রীর কোনোদিন কী সন্তান-ধারণের সৌভাগ্য হয়েছিল? যদি হয়েই থাকে, তবে সে-বিষয়ে বাদীপক্ষ কোনোরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে কেন কুণ্ঠাবোধ করছেন?'

সত্যি, ঐ বিষয়ে প্রমাণ হাজির করবার কোনো উৎসাহই বাদীপক্ষ দেখাচ্ছিলেন না। জেলা জজ একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন।

তখন সবার সহানুভূতি রাণী কিশোরীর দিকে। তিনি বলছেন, 'কোথাকার কে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের হাতে জমিদারী তুলে দেবার জন্য আমার স্বামী আমাকে দায়িত্বভার দিয়ে যাননি।'

এই রহস্যে একমাত্র যিনি আলোকপাত করতে পারেন, তাঁর নাম দুন্নাজু। একমাত্র তিনিই জানেন নরসিংহ রাও কার সন্তান তাঁর এবং বলবন্ত সিংহের? না, কোনো গভীর রাত্রে, লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্য কোনো শিশুকে গোপনে প্রাসাদে আনা হয়েছিল? ঘোষণা করা হয়েছিল —'বার্থ: টু বলবন্ত সিং অ্যাণ্ড দুন্নাজু, এ বয় অন সেকেণ্ড মার্চ, এইটিন নাইনটিফোর। বোথ মাদার অ্যাণ্ড সন ডুইং ওয়েল।

এই কাহিনীর চাবিকাঠি যাঁর কাছে তিনি কিন্তু পর্দানশীন। অর্থাৎ রাজদ্বারে সবার সমক্ষে হাজির হতে কেউ তাঁকে বাধ্য করতে পারেন না। যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, আদালত তাঁর অন্তঃপুরে যাবেন। পর্দার আড়ালে তিনি বসে থাকবেন আর অন্যদিকে বসবেন বিচারক এবং দু'পক্ষের ব্যারিস্টার।

এই দীর্ঘ মামলায় সাক্ষ্য নিতে এবং লিখে রাখতে সময় লাগে। তাঁর পিতৃত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করবার জন্য বলবন্ত সিংহ আজ বেঁচে নেই। যাঁর মাতৃত্ব সম্বন্ধেও গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করতেও সময় লাগছিল। মাতৃত্বের প্রমাণ দেবার জন্য বলবন্তের স্ত্রী ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে রাজী নন। সে-কথা উঠলেই গম্ভীর হয়ে ওঠেন; উত্তর দেন না।

মতিলালের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আর ডক্টর সপ্রুর মুখের দিকে তাকাতেই দুর্যোগের ঘনঘটার ইঙ্গিত পাওয়া পায়।

'তাহলে আপনি ডাক্তারী পরীক্ষাতে রাজী নন?' অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মতিলাল আর একবার জিজ্ঞাসা করেন।

তখন যে এমন উত্তর আসবে, কেউ কল্পনা করেনি। পর্দা এবং ঘোমটার আড়াল থেকে, জেরাতে জর্জরিতা দুন্নাজু যেন জ্বলে উঠলেন। 'আমি রাজী আছি। একজন কেন? একশো জন ডাক্তারকে আমি আমার দেহ পরীক্ষা করতে দিতে রাজী আছি, যদি রাণীসাহেবা পয়সা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ না করেন। কিন্তু পরীক্ষার আগে রাণী কিশোরী কথা দিন যে, যদি প্রমাণ হয় আমার দেহে সন্তান প্রসবের চিহ্ন আছে, তাহলে তিনি নরসিংহকে জমিদারি দিয়ে দেবেন।'

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লো। এমন অবস্থার জন্য মতিলাল নেহরু মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ডক্টর সপ্রুও এই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাহলে এই শর্তে আমার বন্ধু রাজী আছেন তো?'

মতিলাল আমতা-আমতা করতে লাগলেন। বিচারক বললেন, 'কেন, এই ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যই তো আপনি বরাবর দাবী করেছিলেন।'

'ইওর অনার, আমি এখনই কোনো কথা দিতে পারছি না। আমি সময় প্রার্থনা করছি।'

'সামান্য এই ব্যাপারের জন্য সময় প্রার্থনা করছেন কেন?' ডক্টর সপ্রুর কণ্ঠে যেন শ্লেষের সুর! 'যদি বিবাদীপক্ষ নরসিংহ-এর জন্ম সম্বন্ধে এতোটাই নিঃসন্দেহ হয়ে থাকেন, তবে ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত হবে দুন্নাজু কোনোদিন গর্ভে সন্তান-ধারণ করেননি।'

মতিলাল বললেন, 'ইওর অনার, আমাকে কয়েকদিন সময় দেওয়া হোক।'

সময়ের প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। কিন্তু এক মুহূর্তে যেন সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হলো। কী করবেন মতিলাল? বিধবার এই বিরাট সম্পত্তি একটা ডাক্তারী পরীক্ষায় লটারী খেলবেন? রাণীসাহেবার কোনো সন্দেহ নেই, ডাক্তারী পরীক্ষায় সত্য প্রমাণিত হবে। আইনজ্ঞ হিসেবে আর কোনো

সাবধানতা অবলম্বন না করে, বিধবা মহিলাকে এতো বড়ো ঝুঁকি নিতে তিনি কী করে অনুমতি দেবেন ?

তাছাড়া ডাক্তারী শাস্ত্রের সমস্যাও রয়েছে। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ডাক্তারদের কাছ থেকে লিখিত উপদেশ নিলেন তিনি। এই অবস্থায়, এতোদিন পরে দেহপরীক্ষা করে কোনো নারী সন্তান-ধারণ করেছেন কিনা, বলা সম্ভব কী ? ডাক্তাররা জানালেন, তা সম্ভব। এমন কিছু কঠিন পরীক্ষা নয়।

এ-দিকে সাধারণের সহানুভূতি তখন সম্পূর্ণ নরসিংহ রাও-এর পক্ষে। 'বেচারার মা যখন ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে রাজী হলেন, তখন রাণী কেন পিছিয়ে যাচ্ছেন ?' তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন পরে রাণী কিশোরীর পক্ষে আদালতে আবার আবেদন করা হলো। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। সমস্ত দেশ তখন সেই পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

ডাক্তার ঠিক করা হলো। দিন ঠিক হলো। রাণী কিশোরীর আইনজ্ঞদের চোখে ঘুম নেই। এই জুয়াখেলার ফলাফল কী হবে কে জানে ?

কিন্তু এই রহস্যের শেষ যদি অতো সহজেই হতো ! নির্দিষ্ট দিনে যন্ত্রপাতি সমেত বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। বলবন্ত সিংহের বিধবা দরজা খুললেন না ; তিনি দেহ পরীক্ষায় প্রস্তুত নন। কোনো আবেদন নিবেদনেই ফল হয়নি। তিনি কিছুতেই রাজী নন।

মতিলাল নেহরুর মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'ইওর অনার, আমার আর কোনো কথা বলার প্রয়োজন আছে কী ? দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে সমস্ত ব্যাপারটা।'

আর বেশী সময়ের অচপয় হলো না। সবাই যেন রহস্যটা বুঝতে পেরেছেন। নরসিংহ রাও হেরে গেলেন। তাঁর মামলা ডিসমিস হলো।

হাইকোর্টে আপীল করলেন নরসিংহ রাও। সেখানেও কোনো ফল হলো না। চীফ জাস্টিস এবং আর একজন বিচারপতি বললেন, বলবন্ত সিংহের বিধবাকে আমরা এখনও সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছি। ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়ে তিনি মাতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করুন। তুন্নাজু কোনো কথাই

বললেন না। তাঁর কাছে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। আপীলেও হেরে গেলেন রাও নরসিংহ। কোর্ট রায়ে বললেন, দুন্নাজু দৈহিক জেরার সামনে (ফিজিক্যাল ক্রশ এগজামিনেশন) দাঁড়াতে রাজী না হয়ে এ কেস্ নষ্ট করেছেন।

"যে মানুষটা জানতো সে বলবন্ত সিংহের পুত্র এবং সাধারণের অনেকেই যা বিশ্বাস করতো, তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো। শুধু লাখনার রাজত্ব নয়, তার সঙ্গে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠলো। শুধু ধনে নয়, প্রাণেও ধ্বংস হলো হতভাগ্য নরসিংহ রাও।"

ছোকাদা এবার থামলেন। তারপর বললেন, "নারীর মন যে কি দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঢাকা কে জানে।" একটা বিড়ি ধরিয়ে প্রশ্ন করলেন, "সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা তো শুনলে, এখন বল তো তোমাদের কী মনে হয়? নরসিংহ রাও সত্যই কী দুন্নাজুর সন্তান?"

"নিশ্চয়ই নয়। তা যদি হতো তাহলে ডাক্তারের মুখের উপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিতেন না।" হারু বললে।

সেন সায়েবের বাবু বললেন, "আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, রাণী কিশোরী যা বলছেন তাই ঠিক। রাজত্বটি পাবার লোভে, কোথা থেকে একটা ছেলে জোগাড় করে এনেছিল। আগেকার দিনে ও সব আকছার হতো। এখনও হচ্ছে।"

চ্যাটার্জী সায়েবের বাবু হরেন মান্না বললেন, "তোরা বাজে বকিস না। যদি ছেলে গর্ভে নাই ধরে থাকবেন, তবে ভদ্রমহিলা মতিলালকে চ্যালেঞ্জ করলেন কী করে?"

"ওইটাই তো গণ্ডোগোলের ব্যাপার।"—হারু বললে। "তবে হয়তো ভেবেছিল রাণী কিশোরী ওই চ্যালেঞ্জ শুনেই ঘাবড়ে যাবেন। কেস্টা মিটমাটের চেষ্টা করবেন।"

আমাদের এস কে বিশ্বাস সায়েবের অনেক ডাইভোর্স কেস্। তাঁর বাবু বললেন, "জিনিসটা অতো সহজ নয় হে, হয়তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বার ভয় ছিল।"

"মানে?" ছোকাদা জিজ্ঞাসা করলেন।

"মানে আবার কী, বড়োঘরের বড়ো বড়ো ব্যাপার জানোই তো",—বিশ্বাস সায়েবের বাবু বললেন।

হারুটা একটু সেন্টিমেন্টাল। বললে, "আহা হাজার হোক মা তো। নিজের ক্ষতি হবার ভয়ে ছেলের অতোবড়ো সর্বনাশ কখনও কেউ করতে পারে? আমি অন্ততঃ বিশ্বাস করি না।"

হরেন মান্না বললেন, "যাই বলো, যদি আসলে তোর ছেলে নাই হয়, তাহলে নরসিংহ যখন কেস করলে তখনই তোর বারণ করা উচিত ছিল।"

হারু বললে, "তুমি বলেই খালাস। কিন্তু মায়ের সাইকোলজিটা বোঝো। বেচারা নরসিংহ জানে সে তার মায়েরই সন্তান। মা অথচ তাকে এতোদিন মিথ্যে বলে এসেছে। যখন ছেলে বললো, কেস করবো, তখন বাধা দিলেই তো মা ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া মা তখন জানতো না যে রাণী কিশোরী ডাক্তারী পরীক্ষা করতে চাইবেন।"

আমাদের যজ্ঞেশ্বরদা এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন। তিনি বললেন, "তবে যাই বলো ভাই, এটা বুঝতে পারছি এর মধ্যে কিছু রহস্য ছিল এবং সে রহস্য, দুঃখের বিষয়, আর কোনোদিন উদ্ঘাটিত হবে না।"

ছোকাদা এইবার নাটকীয় ভাবে ঘোষণা করলেন, "সে-রহস্য যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন সেই গল্পই শোনো।"

হারু আশ্চর্য হয়ে বললে, "তাহলে গল্পের শেষ হয়নি?"

"শেষ কী রে হতভাগা! সবে তো অর্ধেক হয়েছে।"—এই বলে ছোকাদা আবার শুরু করলেন।

"হাইকোর্টে জিতে রাণী কিশোরী নিশ্চিন্ত হলেন। স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে তিনি ব্যর্থ হননি এই বিশ্বাস নিয়েই একমাত্র কন্যাকে রেখে তিনি একদিন ইহলোক ত্যাগ করলেন।

কিন্তু নরসিংহ রাও তখনও আশা ছাড়েননি। তিনি হাইকোর্টে আবেদন করলেন, 'ধর্মাবতার, আমাকে ইংলণ্ডের প্রিভী-কাউন্সিলে আপীল করবার অনুমতি দিন।' হাইকোর্ট কিন্তু সে আবেদন না-মঞ্জুর করলেন।

ইংরেজের আদালতে জিততে গেলে যে বস্তুটি সবচেয়ে প্রয়োজন, সেই ধৈর্যের কোনো অভাব নরসিংহের মধ্যে ছিল না। তিনি লিখলেন, 'ধর্মাবতার, এই মামলার জন্য আমি সর্বস্ব হারাতে বসেছি। আমার মাকে এতোদিনে পরীক্ষা দিতে রাজী করাতে পেরেছি।' হাইকোর্ট সেই আবেদনও বাতিল করলেন।

নরসিংহ কিন্তু বেপরোয়া। এর শেষ তিনি দেখবেনই। তিনি বিশেষ অনুমতির জন্য সোজা প্রিভী-কাউন্সিলে আবেদন করলেন। আবেদন করেই তিনি বসে রইলেন না। কিছু পয়সা জোগাড় করে একদিন বোম্বাই থেকে বিলেতগামী জাহাজে চেপে বসলেন।

এবার কেন্দ্র লণ্ডন। স্থান জুডিসিয়ল কমিটি অফ প্রিভী-কাউন্সিলের কোর্ট। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারালয় হিসেবে এর খ্যাতির কথা কে না জানে। তোরা তো দেখছিস, স্বাধীনতার পরও কত বছর হয়ে গেল, এখনও তোদের সায়েবদের কথায় কথায় প্রিভী-কাউন্সিলের রায়ের শরণাপন্ন হতে হয়।

বিচারকরা আইনের বই ছাড়া কিছুতেই উৎসুক বা বিচলিত হন না। কিন্তু নরসিংহের করুণ কাহিনী তাঁদেরও হৃদয় স্পর্শ করলো।

নরসিংহ রাও বললেন, 'ধর্মাবতার, আমার বিধবা মাকে হাতে পায়ে ধরে বিলেতে এনে হাজির করেছি। তিনি অন্য এক ঘরে ঘোমটার আড়ালে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে আমার ভবিষ্যৎ রক্ষা করুন।'

প্রিভী-কাউন্সিলের ইতিহাসে যা হয়নি এবার তাই হলো। তাঁরা ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। বিচারকরা গোপনে দুজন নাম-করা ধাত্রীবিদ্যাবিশারদকে ঠিক করে রাখলেন। কারা পরীক্ষা করবেন, কী পরীক্ষা করবেন তা জানানো হলো না; শুধু একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ভদ্রমহিলাকে অপেক্ষা করতে বলা হলো। সেই নির্দিষ্ট দিনে লণ্ডনের দু'জন খ্যাতনামা চিকিৎসককে দুন্নাজুর ঘরে ঢুকে যেতে দেখা গেল। দুন্নাজু এবার কোনো বাধা দিলেন না।

পরীক্ষা শেষ করে চিকিৎসকরা রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। 'ইওর লর্ডসিপস, আমরা এই হিন্দু বিধবাটিকে পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'তিনি কি কোনোদিন মা হয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই হয়েছিলেন। সন্তান-ধারণের সমস্ত লক্ষণই ওঁর দেহে রয়েছে।'

তাহলে বলবন্ত সিংহ তাঁর সন্তানের জন্মসম্বন্ধে যে ঘোষণা করেছিলেন, তা মিথ্যা নয়। নরসিংহ রাও তাঁর পিতৃত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রিভী-কাউন্সিল হুকুম করলেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট এলাহাবাদ হাই-

কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেখানে তারপর থেকে আবার কেস চলুক।

কিন্তু দুন্নাজু বলে যে মহিলাকে ডাক্তাররা পরীক্ষা করলেন, তিনি দুন্নাজু কিনা কে জানে?

কাউন্সিল অবশ্য আগে থেকেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তাররা যাঁকে পরীক্ষা করেছেন, তাঁর সনাক্তকরণের জন্য আঙুলের ছাপ এবং ছবি তুলে নেওয়া হয়েছিল।

আবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আইনের দিকপালরা আবার জড় হয়েছেন। মতিলাল নেহরু, ডক্টর কাটজু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু। আদালতে সাক্ষী দিচ্ছেন নরসিংহ রাও। অন্য এক ঘরে বসে রয়েছেন দুন্নাজু। মতিলাল নেহরু আবার সেই প্রশ্ন তুললেন—'প্রিভী-কাউন্সিলের আদেশে ডাক্তাররা যাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন তিনিই কি দুন্নাজু?

জজ বললেন, 'সব সমস্যার সমাধান হয় যদি মিস্টার নেহরু আপনার মাকে একবার দেখতে পান। তিনি বিলেতের ফটোর সঙ্গে আপনার মায়ের মুখটা মিলিয়ে নিতে পারবেন।'

সাক্ষী কিছুতেই রাজী নয়। 'ধর্মাবতার, আমার মা হিন্দু বিধবা তিনি কেন অন্যপক্ষের ব্যারিস্টারের কাছে মুখ দেখাতে যাবেন?'

'তাহলে কেসে সময় লাগবে। দেরীর জন্য আপনি তো কম ভুগলেন না।' জজ বললেন।

'দরকার হয়, ধর্মাবতার আপনি চলুন, কিন্তু অন্য লোক কেন? নরসিংহ রাও প্রতিবাদ করলেন।

বিচারকরা তখন আবার বুঝোতে শুরু করলেন। এবং নরসিংহ রাও শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হলেন।

প্রধান বিচারপতি, নরসিংহ রাওয়ের ব্যারিস্টার স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং রাণী কিশোরীর মেয়ে বেটী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রতিনিধি হিসাবে মতিলাল নেহরু এক সঙ্গে পাশের ঘরে চললেন।

অনেকে ভেবেছিল, তাঁদের বেরিয়ে আসতে বহু সময় লাগবে। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট। বিচারপতি এবং দুজন ব্যারিস্টার মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলেন।

আবার কোর্ট শুরু হলো। মতিলাল নেহরু বিরস-বদনে বললেন,

'মাই লর্ড, বিলেত থেকে যে ছবি পাঠানো হয়েছে, তা যে দুম্মাজুর ছবি সে-সম্বন্ধে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।'

আইন-যুদ্ধের আর অল্পই অবশিষ্ট রইল। এমন অবস্থায় অনেকদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল যে মতামত দিয়েছিলেন, তাঁরও ডাক পড়লো। কিন্তু এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিলেন—'নরসিংহ রাও জিতেছেন, লাখনার রাজত্ব তাঁরই।'

"কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট!" ছোকাদা বললেন। "কেস আবার চললো প্রিভী-কাউন্সিলে।"

সেখানে মহালক্ষ্মী বাঈ-এর হয়ে কেস করলেন স্যার জন সাইমন। তিনি বললেন, 'আমি স্বীকার করছি, নরসিংহ রাও বলবন্ত সিংহের ছেলে। কিন্তু, (এবার তিনি কলকাতার অ্যাডভোকেট-জেনারেলের আইনের প্যাঁচটা প্রয়োগ করলেন) যশোবন্ত সিংহ নাতিকে সম্পত্তি দেবার যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তা আইন-বিরোধী। ওটার কোনো মূল্য নেই।'

প্রিভী-কাউন্সিলও অবাক হয়ে দেখলেন, সত্যি তাই। দলিলের সেই প্রয়োজনীয় অংশটা ব্যাড ইন ল।

রাজা যশোবন্ত সিংহের বংশধর নরসিংহ রাও তেরো বছর ধরে মামলা করে জিতেও হেরে গেলেন। প্রমাণিত হলো তিনি বলবন্ত সিংহের সন্তান, কিন্তু সম্পত্তির অধিকারী নন। এতোদিন ধরে অর্থ এবং সময় ব্যয় করবার পর আবিষ্কৃত হলো দু'পক্ষ ছায়া নিয়ে লড়াই করছিলেন। কলকাতার অ্যাডভোকেট জেনারেল ১৮৯৪ সালে যা বলে গিয়েছিলেন, তাই ঠিক।"

ছোকাদা এবার একটা বিড়ি ধরালেন। বিড়িতে টান দিয়ে বললেন, "আমি এর থেকে কোনো নীতি প্রচার করতে চাইনে। তোরা তো বলবি, আমি কলকাতার কোনো দোষ দেখতে পারি না। কিন্তু তোরা এবার যা বোঝবার বুঝে নে। এ তো আর আমার বানানো গল্প নয়।"

গল্প শেষ হলো। আমরা এতোই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, কথা বলবার সামর্থ্য ছিল না। হাইকোর্ট নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিলাম না। আমি ভাবছিলাম, বেচারা নরসিংহ রাওয়ের কথা—সর্বস্ব ব্যয় করে, সাফল্যের সিংহদ্বারে এসে যিনি দেখলেন, কোনো কিছুই তাঁর নয়।

কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল। জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আইনের কোন

কূট তর্কে নরসিংহ রাও তাঁর জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। ছোকাদা সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দিলেন।

বললেন, 'তা শুনলে, তোদের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। তোদের প্রিভী-কাউন্সিল, হিন্দু ল'-এর মস্ত পণ্ডিত বলেই বাজারে চালু আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওঁরাও গণ্ডগোল পাকিয়ে বসেছেন, সে নিয়ে স্যার হরি সিং গৌর একবার বিরাট এক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হলো, প্রিভী-কাউন্সিল ভুল করলে, তার উপর তো কোনো আপীল থাকে না। ওদের ভুলটাই সত্যি বলে চলে যায়। প্রশ্নটা ছিল, হিন্দু আইনে আনবর্ন্ পারসন অর্থাৎ যে এখনও জন্মায়নি, তার জন্যে কিছু সম্পত্তি ব্যবস্থা করা যায় কি না। প্রিভী-কাউন্সিল একটা কেসে হঠাৎ রায় দিয়ে ফেললেন—হিন্দু আইনে, একমাত্র জীবিত লোকদেরই কোনো কিছু দান করা যায়। দানপত্রের দিনে অনাগত কোনো বংশধরকে কোনো কিছু দেওয়া হয়ে থাকলে তা বাতিল বলে পরিগণিত হবে। কিন্তু সায়েবরা হিন্দু আইনটা না বুঝেই বোধ হয় এই ব্যাখ্যা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু ঋষিবাক্য মিথ্যে হতে পারে না। ওঁরা যখন বলেছেন সেইটেই সব আদালত মেনে নেবেন। ফলে ওঁদের ভাষ্য থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাধ্য হয়ে, আইন সভায় নতুন আইন পাস করানো হলো—হিন্দু ডিসপোজিশন অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট। কিন্তু সে আইনে শুধু ভবিষ্যতের কথাই লেখা ছিল, আগের থেকে এর ফল, অর্থাৎ যাকে বলে কিনা রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট দেওয়া হয়নি। এই রেট্রসপেকটিভ এফেক্টের ব্যবস্থা যদি আইনে থাকতো, তাহলে বেচারা নরসিংহ রাওয়ের জন্যে তোদের আজ দুঃখ করতে হতো না।'

আমাদের গল্প শেষ হলো। নিজের ছাতাটা নিয়ে ছোকাদাও উঠে পড়লেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম শনিবারের হাইকোর্ট খাঁ খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। যেন রূপকথার পাষাণপুরী—দৈত্যের মন্ত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল আমরা কয়েকজন প্রকৃতির কোন খেয়ালে জেগে রয়েছি।

কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। ছোকাদার হাত ধরে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি দ্রুত বেরিয়ে এলাম।

হাইকোর্ট থেকে চৌরঙ্গী। ওই নামে আমার একটা বইও প্রকাশিত হয়েছে।

যে নাগরিক সভ্যতার রূপ প্রতিদিন রাত্রের অন্ধকারে কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আমরা বাইরে থেকে দেখি, এবং দেখে বিস্মিত হই, অথচ যার অন্তরের অন্তস্থলে কোনোদিনই হয়তো আমাদের প্রবেশ করা সম্ভব হয় না, ফলে যা আমাদের কাছে চিরদিনই অজ্ঞাত থেকে যায়, পাকেচক্রে একদা তার মুখোমুখি দাঁড়াবার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কী ভাবে এই জগতে এসে পড়েছিলাম 'চৌরঙ্গরী'র প্রথমেই তা নিবেদন করেছি।

সাম্প্রতিক কালের এক স্বনামধন্য লেখক তাঁর কোনো এক রচনায় বলেছেন, যদি কোনো জাতকে এবং তার সভ্যতাকে জানতে চাও তবে গিয়ে খোঁজ করো—how they live and how they love। তারা কেমন ভাবে থাকে এবং কেমন ভাবে প্রেম করে। তার মধ্যেই নাকি তাদের সভ্যতার একটা বিশ্বাসযোগ্য এবং সহজে বোধগম্য চিত্র পাওয়া যায়। কথাটা যে শুধু দেশ নয়, বিশেষ অর্থে যে কোনো বিশেষ নগর সম্বন্ধে খাটে, এ-বিশ্বাস অনেকের মনেই আছে।

আমি নিজেও একসময়ে এই মতে বিশ্বাস করতাম। তারপর চার্নক নগরীর শতাব্দী-প্রাচীন পান্থশালার গ্রীনরুমের দরজা একদিন আমার বিস্মিত চোখের সামনে উন্মুক্ত হলো। বিমুগ্ধ আমি নিয়ন ও নাইলনে উদ্ভাসিত চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেলের সামান্য কর্মচারীর ভূমিকায় পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আর বিশ্ববিমোহিনী চৌরঙ্গীর অভিজাততম পান্থশালাতেই প্রথম শুনলাম—আধুনিক সভ্যতাকে চিনতে হলে নগরে এসো। আর যদি নগরীকে চিনতে চাও তবে নগরের মানুষরা কেমন ভাবে থাকে, কেমন ভাবে ভালবাসে, কেমনভাবে উৎসবের শেষে একদিন নিস্তব্ধ মৃত্যুর দেশে অকস্মাৎ পাড়ি দেয় তা খোঁজ করো। এসব দেখবার এবং জানবার জন্যে কিন্তু অযথা সময় এবং ধৈর্য্যের অপচয় করবার প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে সহজ উপায়, দিনের শেষে সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তোমার প্রিয় নগরীর প্রিয় পান্থশালায় হাজির হও। নগর ও নাগরিকের

সত্য রূপ অনুসন্ধিৎসু দর্শকের চর্মচক্ষুর সম্মুখে টেলিভিশনের ছবির মতো ভেসে উঠবে।

ইউরোপীয় কায়দায় পরিচালিত শাজাহান হোটেলে আমি একজন সামান্য রিসেপসনিস্ট। সেই অপরিচিত হোটেল-জীবনে যিনি আমার ভাষ্যকারের কাজ করেছিলেন, যাঁর ধারাবিবরণী আমাকে এই দুরূহ জগতের অন্তরের বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল, তাঁর নাম সত্য-সুন্দর বোস ওরফে স্যাটা বোস। তাঁকে বাদ দিয়ে শাজাহানের জীবনকে কল্পনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে আমার 'চৌরঙ্গী' এই সত্যসুন্দরদার স্মৃতিচিত্র।

স্যাটাদা একদিন সেই বিখ্যাত উক্তি every country gets the government its deserves-এর অনুকরণে বলেছিলেন, every city gets the hotel it deserves—যেমন শহর ঠিক তেমন হোটেল হয়। মিস্টার হবস্ নামে আমাদের এক পরম শুভানুধ্যায়ী বিদেশী ভদ্রলোক (এঁর কথা চৌরঙ্গীতে সবিস্তারে বলেছি, আমার এই লেখার পিছনে তাঁর যথেষ্ট দান ছিল) হেসে বলেছিলেন, "আরও একটু এগিয়ে বলতে পারো every hotel gets the customer it deserves। ঠিক যেমন হোটেল, ঠিক তেমন অতিথি সেখানে হাজির হয়।"

কথাটা চৌরঙ্গী রচনার সময় যে মনে পড়েনি এমন নয়। কিন্তু নিজেরই স্বার্থে এই চিন্তাকে মনের নিতান্ত গভীরে প্রবেশ করতে দিইনি। কারণ এই ধরণের চিন্তা মাথায় থাকলে আমার কর্তব্য সম্পাদনে বাধা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। আমি তখন প্রাসাদোপম পান্থশালার কক্ষে কক্ষে নানা রঙে রঙীন জীবনকে ফুটিয়ে তোলবার আশায় মত্ত হয়ে রয়েছি। আমার অনভিজ্ঞ চোখের সম্মুখে অভাবনীয়দের শোভাযাত্রা আমাকে বিস্মিত এবং প্রায় বিশ্লেষণী-শক্তি-রহিত করে দিয়েছে।

শাজাহান হোটেলের নবনিযুক্ত রিসেপসনিস্ট তখন অভিজ্ঞ ও জীবন-দরদী সত্যসুন্দর বোসের স্নেহ-প্রচ্ছায়ে শুধু মানুষই দেখছে, আর দেখতে দেখতে ভাবছে, পৃথিবীর নানা প্রান্তের বিভিন্ন সমস্যাসঙ্কুল এই সব মানুষদের শাহাজানের পরিবেশে মানায় কিনা। সেই ভাবেই শাজাহান হোটেলের জীবন, তার অতিথি এবং কর্মচারীদের সুখ দুঃখের কথা আমি পরম যত্নে

মালার আকারে গেঁথেছি। উল্টোদিক দিয়ে, অর্থাৎ যেমন হোটেল ঠিক তেমন অতিথি সেখানে আসে, এই বহুকথিত ও বহু বিজ্ঞাপিত উক্তির সত্যাসত্য যাচাই করবার চেষ্টা করিনি।

শাজাহান হোটেল আজ আমাকে আর আশ্রয় দেয় না। কিছুদিন আগে রাত্রের অন্ধকারে শাজাহান আমাকে শুধু কর্মহীন নয়, আশ্রয়হীনও করেছিল। শাজাহানের নিয়নের ত্রিনয়ন আমাকে রক্তচক্ষুতে জানিয়ে দিয়েছিল, আমি আর তাদের কেউ নই। এবার আমার স্থান পৃথিবীর আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের মতই নক্ষত্রশোভিত আকাশের তলায়। চৌরঙ্গীর কার্জন পার্ক—যেখান থেকে আমি শাজাহানে পদার্পণ করেছিলাম, আবার সেইখানেই ফিরে এসেছি।

কর্মহীন আমি আমার মধ্যবিত্ত আক্রোশের আগুনে শাজাহানের জীবনকে (সাহিত্যের আঙিনায় অন্তত) ছারখার করে দেব। এই ধরনের একটা ইচ্ছা প্রথমদিকে মনের মধ্যে চেপে বসেছিল। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করে নিয়েছি। পান্থশালার অগণিত অতিথি এবং কর্মীদের জীবনালেখ্য প্রীতি ও শ্রদ্ধার রঙে রঙীন করে পাঠকদের উপহার দেবার সিদ্ধান্ত করেছি।

তারপরের ঘটনা যাঁরা গ্রন্থাকারে চৌরঙ্গী পাঠ করেছেন তাঁদের অজানা নয়। চৌরঙ্গীর শেষ অংশে হোটেল থেকে আমার আকস্মিক বিদায় নেওয়ার যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি তা কিছু আজকের ঘটনা নয়। শাজাহান হোটেলের ম্যানেজার মার্কোপোলোর নতুন জীবনের সন্ধানে আফ্রিকার স্বর্ণ উপকূলে যাওয়া, সুজাতা মিত্রের বিচ্ছেদে কাতর আমার দুঃখদিনের সাথী সত্যসুন্দরদা ওরফে স্যাটা বোসেরও শান্তির আশায় গোল্ড কোস্টে যাওয়ার পরও তো কতদিন অতিক্রান্ত হলো।

যা একবার যায় তা চিরদিনের জন্যেই যায়। সংসারের যাত্রাপথে যা একবার নিকট থেকে দূরে সরে যায় তাকে আর তো কাছে এগিয়ে আসতে দেখি না। চৌরঙ্গীর স্বপ্নময় জীবন থেকে আমাকে একলা ফেলে রেখে যারা অদৃশ্য হলো তাদের খবর যে আবার কোনোদিন পাব, এ আশা স্বপ্নেও করিনি।

কিন্তু যদি আজ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার চৌরঙ্গী রচনায় সবচেয়ে বড় পুরস্কার কী পেয়েছ, তাহলে আমার উত্তর দিতে একটুও দেরি

হবে না। কোনো দ্বিধা না করেই কিছুদিন আগের পাওয়া এয়ারমেল চিঠিখানা খামসুদ্ধ প্রশ্নকর্তার হাতের দিকে এগিয়ে দেব। বলব, পড়ে দেখুন। প্রশ্নকর্তা হয়তো একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় প্রশ্ন করবেন—কোনো প্রবাসিনী পাঠিকার প্রশংসাপত্র নিশ্চয়। আমি উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে খামটাই এগিয়ে দেব। খামের উপর আমার নিজের ঠিকানা নেই, পত্রিকার সম্পাদকের নাম লেখা রয়েছে।

সেই ইংরেজী হাতের লেখা খাম যেদিন রিডাইরেক্টেড হয়ে পিয়নের মারফত আমার হাতে এসেছিল, তখন খাম না খুলেই আমি চমকে উঠেছিলাম। এই গোল গোল টাইপ-ছাঁদের বলিষ্ঠ লেখা যে সত্যসুন্দরদার তা বুঝতে আমার এক মুহূর্তও লাগেনি। চিঠিটা খুলেই পড়েছিলাম :

"প্রিয় শংকর,

এই চিঠি তোমার হাতে শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে কিনা জানি না। তবু তোমাকে চিঠি না লিখে পারছি না।

তোমার হদিশ যে সত্যিই আমি খুঁজে বার করতে পারবো, এ-আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম। মার্কোপোলো যে-হোটেলে নিজে চাকরি করছেন এবং আমাকে চাকরি দিয়েছেন সেটা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। এ-অঞ্চলে এই হোটেলের খুব নাম ডাক। মোটামুটি কাজের মধ্যে ডুবে আছি। ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে আসবার পর কেন জানি না প্রায়ই তোমার কথা মনে হতো, ইচ্ছে করতো তোমার সব খবরাখবর জানি। কিন্তু তখনই ভাবতে বেশ কষ্ট হতো যে, এই পৃথিবীর বৃহৎ জনারণ্যে শংকর নামে আমার এক পরম স্নেহভাজন প্রাক্তন সহকর্মী চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গিয়েছে। কারণ তোমার নামে শাজাহান হোটেলের ঠিকানায় অন্ততঃ তিনখানা চিঠি পাঠিয়েছিলাম—একটারও উত্তর আসেনি। হোটেল কর্তৃপক্ষের নামেও একটা চিঠি ছেড়েছিলাম। তাঁরা আমায় শুধু লিখে পাঠালেন, ওই নামে কোনো কর্মচারী তাঁদের নেই।

শেষে এখানকার এক স্থানীয় ভদ্রলোক ইণ্ডিয়াতে সরকারী ডেলিগেশনের অন্যতম সভ্য হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে অনুরোধ করলাম, কলকাতায় গেলে যেন শাজাহান হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে তোমার খোঁজ করেন।

তিনি ফিরে এসে খবর দিলেন, তুমি নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছো, তোমার বর্তমান ঠিকানা হোটেলের কোনো কর্মচারী বলতে পারেননি।

এইখানেই সব শেষ হবে ভেবেছিলাম। কিন্তু যা শেষ হবার নয়, যে নাটকের আর একটা অঙ্ক অনভিনীত রয়েছে, সেখানে আমার ভাবা বা চিন্তাতে কী এসে যায়?

আমরা যে শহরে চাকরি করছি সেখানে কোনোদিন যে কোনো বঙ্গসন্তানের মুখ দেখবো আশাই করিনি। বছরে একটা ভারতীয়ের মুখ দেখতে পেলেই আমি বর্তে যাই। কিন্তু সম্প্রতি এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোক এখানে সরকারী চাকরিতে এসেছেন। এখানকার এক পার্টিতে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ওঁর বাঙালী পদবী দেখেই আমি আর স্থির থাকতে পারিনি, ভিড় ঠেলে সোজা তাঁর কাছে চলে এসেছিলাম।

ভদ্রলোক রঞ্জনরশ্মিতে বিশেষজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা ভারাক্রান্ত এই ভদ্রসন্তান কয়েকবছর এখানকার হাসপাতালে কাজ করে আবার স্বদেশে রওনা দেবেন। তাঁর বাড়িতে আমার যাতায়াত আছে। এবং সেইখানেই একদিন দেশ পত্রিকার সাপ্তাহিক কয়েকটা সংখ্যা দেখবার সৌভাগ্য হলো। অনেকদিন বাংলা কিছুই পড়িনি। মাতৃ-ভাষাটা সত্যিই হজম করে ফেলেছি কিনা যাচাই করবার জন্যে কয়েকটা সংখ্যা হোটেলে নিয়ে এসেছিলাম।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে পাতা ওল্টাতে গিয়ে হঠাৎ তোমার লেখাটা আবিষ্কার করলাম। তারপর কয়েক সপ্তাহ ধরে গভীর আগ্রহে তোমার শাজাহানের জীবনবৃত্তান্ত পড়ে এসেছি। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পরবর্তী সংখ্যার জন্যে অপেক্ষা করেছি বললেও অন্যায় হবে না। কারণ, যে জীবনের বর্ণনা তুমি করতে চেয়েছো, আর কেউ না জানুক, আমার কাছে তারা লেখকের থেকেও বেশী পরিচিত। ন্যাটাহারিবাবু, যাঁকে তোমার কাহিনীতে অনেক-খানি স্থান দিয়েছো, শুনলে হয়তো বলতেন—মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প!

তোমার কাহিনীতে সুজাতাদিকেও বাদ দাওনি দেখলাম। ভালই করেছো। তার পরিচয় অন্তত কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে প্রকাশিত হলো। সুজাতাও পরলোক থেকে তোমাকে নিশ্চয়ই তার স্নেহ ও প্রীতি

জানাচ্ছি। এয়ার হোস্টেস সুজাতা মিত্র কেমন করে একদিন শাজাহানের রিসেপশনিস্ট সত্যসুন্দর বোসের সঙ্গে পরিচিত হলেন, কেমন করে আমরা এক অবিশ্বাস্য পরিবেশের মধ্যে নিজেদের অন্তরকে জানতে পারলাম, কেমন করে একদিন সুজাতা শাজাহানের পাষাণপুরী থেকে শাপভ্রষ্ট সত্যসুন্দরকে উদ্ধার করলেন, হাওয়াই কোম্পানিতে ভাল চাকরি করে দিলেন, তারপর জীবনের পাত্র যখন নিবিড় সুধারসে প্রায় পূর্ণ, তখন কেমন করে সুজাতা নিজের অজ্ঞাতেই ভাগ্যহত সত্যসুন্দরকে চোখের জল ফেলবার জন্যে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, তা হয়তো কেউ জানতে পারতো না। তার স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখবার জন্যে যে কাজ করা উচিত ছিল, তুমি তা করলে। সেদিক দিয়ে যোগ্য সহোদরের কর্তব্য তুমি সম্পাদন করেছো। তার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ অজস্র ধারায় তোমার মাথার উপর ঝড়ে পড়ুক।

তোমাকে সুজাতা যে কেমন ভাবে স্নেহ করতো তা আর কেউ না জানুক, আমার অজ্ঞাত নয়। পরলোকে আত্মা বলে যদি কিছু থাকে এবং সে যদি আজও নতুন দেহের মোড়কে আবার আমাদের এই পৃথিবীতে না ফিরে এসে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই তৃপ্ত হয়েছে। এতো লোক থাকতে শাজাহান হোটেলের একটা সাধারণ প্রাক্তন রিসেপশনিস্ট যে সুজাতাকে এমন ভাবে মনে রাখবে তা কেউ কি জানতো ?

এই মুহূর্তে, কেন জানি না, শাজাহানের ফেলে আসা জীবনটা আবার চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভেসে উঠছে, আমার পাষাণ হৃদয়ও চোখের এই আকস্মিক বন্যাকে বেঁধে রাখতে পারছে না।

অন্ধকার আফ্রিকা মহাদেশের এক প্রান্তে বসে বসে আমার নিঃসঙ্গ প্রবাসী অন্তর আবার যেন হুগলী নদীর মোহনায় ফিরে যেতে চাইছে। কিন্তু তা যে হবার নয়। তোমার সত্যসুন্দরদা কিছুতেই আর শাজাহানের জীবনকে বরণ করতে পারবে না। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে যে-সব চিন্তা আমার মাথায় হাজির হবে, তা আমাকে পাগল করে তুলতে পারে। আরও অনেকদিন পরে মৃত্যু যখন বৃদ্ধ সত্যসুন্দর বোসের রুদ্ধদ্বারে কড়া নাড়বে, যখন বুঝবো সুজাতার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময় প্রায় আগত, তখন একবার ভারতবর্ষে ফিরবো—সেন্টিমেন্টাল জার্নি অ্যারাউণ্ড ইণ্ডিয়া !

তখন যদি সুযোগ থাকে, তাহলে তুমিও আমার হোটেল পরিক্রমায় যোগ দিও। সেদিন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন হবে। যেখানেই থাকো, তোমাকে তখন সময় করে আমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আমি নিজের এই হাতটা তোমার মাথার উপরে রাখবো, আমার এবং সুজাতার হয়ে তোমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবো। আমার অপূর্ণ কামনাগুলো—যার কয়েকটি কোনোদিন আর চরিতার্থ হবে না—তার একটি তখন পূর্ণ হবে।

শোনো শংকর, কতদিন পরে বাংলায় চিঠি লিখছি জানো? বোম্বাই ছেড়ে মার্কোর এই হোটেলে আসবার পর কখনও কাউকে বাংলায় চিঠি লিখিনি। তার আগেই বা আর কখানা লিখেছি? তোমার সুজাতাদির ভয়ে কয়েকবার মাতৃভাষায় পত্র রচনার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। সে চিঠি পরম যত্নে সে একটা চামড়ার খোপে ঢুকিয়ে রেখেছিল—বোধ হয় সময় পেলে ফ্লাইটের মধ্যেই চিঠিগুলো খুলে পড়তে আরম্ভ করতো। কারণ চিঠিগুলোর উপর বহু-পঠনের অনেক স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে।

দুর্ঘটনায় সুজাতার মৃত্যুর পর তার আরও অনেক পার্থিব সম্পত্তির সঙ্গে পুনর্বার ওই চিঠিগুলোরও মালিক হয়েছি আমি। আজও মাঝে মাঝে আমার নিজের লেখা চিঠিগুলো রাত্রের গভীরে বিজলী-বাতির আলোর তলায় দাঁড়িয়ে আমি পড়ি। আমি যেন নিজেকেই আবার আবিষ্কার করি। যে এই সব লিখেছে সে যে একদিন আমারই অন্তরে বাস করতো, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। আমার মৃত্যুর পর চিঠিগুলো যাতে তোমার কাছে যায় তার ব্যবস্থা করে রাখছি। যদি আমার উইলের পরিচালকরা আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, যদি তখনও তুমি সত্যসুন্দরদা এবং সুজাতাদি সম্বন্ধে আগ্রহী থাকো, তাহলে তুমি হয়তো চিঠিগুলোর মধ্যে নতুন এক সত্যসুন্দরদাকে আবিষ্কার করবে। সেদিন আমি যখন থাকছি না, তখন আমাকে লজ্জিত, বিব্রত কিংবা বিচলিত হতে হবে না। যদি পারো তখন নতুন আলোকে চৌরঙ্গী লেখাটি আবার সংশোধন কোরো।

স্বাস্থ্যটা এখনও বিশ্রী রকমের ভাল চলেছে। ভেবেছিলাম, অন্ধকার মহাদেশের কোনো বিচিত্র ব্যাধি নবাগতের দেহে আশ্রয় নিয়ে তার বসতি

বিস্তার করবে। বিরক্ত এবং অপরিতৃপ্ত দর্শকদের মতো আমিও এই জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠেছি। কিন্তু তবুও যেমন ভাবে সব চলেছে তাতে মনে হয়, আমার চিঠিগুলো যখন তোমার হাতে এসে পড়বে তখন তোমার বয়সও কিছু কম হবে না। শাজাহান হোটেলের কাউন্টারে যে ছেলেটিকে আমি অভ্যর্থনা করেছিলাম, কাজ শিখিয়েছিলাম, সেদিন তোমার মধ্যে সে বেঁচে নাও থাকতে পারে! সে-ক্ষেত্রে চৌরঙ্গীর সত্যসুন্দর অধ্যায় পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা না করাই ভালো।

সে-সব কথা থাক। তোমার চৌরঙ্গী পড়তে পড়তে কতজনের কথা মনে পড়ছে। তাদের কয়েকজনকে দেখছি তুমি ক্যামেরায় নিখুঁত ভাবে ধরে ফেলেছো। আবার দেখছি ক'জনকে বাদ দিয়েছো। ব্যাপার কী?

তোমার লেখা পড়তে পড়তে মনে মনে আর একবার শাজাহানের পুরনো দিনগুলো দেখে এলাম। ন্যাটাহারিবাবুকে তুমি ঠিকই এঁকেছ। শাজাহান হোটেলের বালিশবাবু এখন কোথায় জানো নাকি?

ভদ্রলোক যদি তোমার লেখা পড়েন হয়তো খুশি হবেন। কিংবা বলা যায় না, তাঁর অন্তরের যন্ত্রণাকে তুমি বাইরে প্রকাশ করেছ বলে হয়তো বিরক্তও হতে পারেন।

শিল্পপতি মিস্টার আগরওয়ালার গেস্ট সুইটের পার্মানেন্ট হোস্টেস করবী গুহর ছবিটা আমার মনকে আবার বিষণ্ণ করে তুলল। ওঁর কথা তুমি বোধহয় না লিখলেই পারতে। সংসারে চিরকালই তো দুঃখ থাকবে, যেদিকে তাকাবে সেদিকেই তো দুঃখ, আবার সাহিত্যের অঙ্গনেও তাকে গলায় মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা করবার কী প্রয়োজন? তুমি হয়তো বলবে বিষে বিষক্ষয় হয়, দুঃখের কাহিনী দুঃখীকে সান্ত্বনা দেয়। যা সত্য তাকে স্বরূপে প্রকাশ করে তোমার শিল্পী-সত্তা হয়তো প্রীত হয়। কিন্তু আমার আর ভাল লাগে না।

আমার মনের যা অবস্থা তাতে কেবলমাত্র সেই সব গল্প ভাল লাগে, যার শেষে রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিয়ে করে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সুখে রাজত্ব করতে থাকে।

তোমার মুখের অবস্থাটা এখন কেমন হয়েছে তা আমি না দেখেই বলে দিতে পারি। কতদিন ধরে তোমায় যে দেখেছি! তুমি মৃদু হাস্যে তোমার

চোখের ফোকাস আমার উপর কেন্দ্রীভূত করে বলছ, 'তেমন মিলনান্ত নাটক হোটেলের জীবনে কোথায় পাব ?'

কিন্তু ভাই, সত্যি করে বল তো, তেমন ছোটখাট ঘটনা শাজাহানে অনেক হয়েছে কি না ? আমার তো একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ছে—যাতে তোমার প্রিয় বেয়ারা গুড়বেড়িয়ার চাকরি যেতে বসেছিল। ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন তুমি শাজাহানে আসোনি।

ইংরেজদের তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ। আমাদের হোটেলের অতিথিদের সাড়ে চোদ্দ আনা তখন বৃটিশ পার্লামেন্টের ভোটদাতা! নানা ধরনের লোকের মধ্যে অনেক ছেলে-ছোকরাও—যাদের তোমরা সাহিত্যের ভাষায় যুবক-যুবতী বল—আসতো। তুমি শুনলে অবাক হবে, হনিমুনের ভ্রমণ তালিকায় অনেক ইংরেজিনী কলকাতার নাম রাখতে ভালবাসতেন। এই রকম অনেকেই শাজাহানে থাকতেন। থাকাই বলব—কারণ কেউ কেউ সেই যে এসে ঢুকতেন, আর বেরোতেন না। ভ্রমণ, দ্রষ্টব্যস্থান দর্শন, মুক্তবায়ু সেবন সব মাথায় উঠত। দরজা জানালা বন্ধ করে হোটেলেই পড়ে থাকতেন।

এঁদের কেউ কেউ হোটেলে থাকলে হোটেলের পরিবেশ একেবারে পাল্টিয়ে যেত। ব্যাপারটা শুধু ছোটো জায়গায় নয়, বড় হোটেলেও কী করে হয় বুঝি না। কেমন করে বলতে পারব না, কিন্তু সবাই জেনে যেত এঁরা নব-বিবাহিত। ডবল সেদ্ধ করা সায়েবদের মেজাজ (হার্ড-বয়েল্‌ড্‌ কথাটার বাংলা করলাম) হঠাৎ যেন পরিবর্তিত হতো। ওঁরা কপোত-কপোতীকে প্রাইভেসী দেবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠতেন। প্রায়ই দেখা যেত ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্টের সময় নব-বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী যেদিকে বসেছেন, সেদিকটা প্রায় খালি! কেউ খেয়ালের বশে সেদিকে গিয়ে বসে পড়লে অন্য শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর দিকে এমনভাবে তাকাতেন যে, ভদ্রলোক যেন কোনো মহিলার শ্লীলতাহানি করেছেন। বুঝতে পেরে ভদ্রলোক তখন বাধ্য হয়ে লজ্জায় মাথা নীচু করে অন্যদিকে সরে যাবার পথ পেতেন না।

হনিমুন কাপ্‌লকে সর্ববিষয়ে ভি-আই-পি আদর দেবার জন্যে সবাই আমাদের উপর, খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে নৈতিক চাপ দিতেন। ফলে কাউন্টারে ভিড় থাকলেও সবাইকে ফেলে আমরা মধুযামিনী-দম্পতিকে

আগে অ্যাটেণ্ড করতাম। ভাবটা এই—'আপনাদের আগে ছেড়ে দিতে চাই, এঁদের তুলনায় আপনাদের সময়ের দাম যে অনেক বেশী।'

হোটেলের আদর আপ্যায়নে সর্ববিষয়ে এঁরা একটু স্পেশাল খাতির পেতেন। যেমন দোতলার দক্ষিণ দিকের একশো সাতাশ নম্বর ঘরটার নামই ছিল হনিমুন-সুইট। মার্কোপোলোর আগে আমাদের এক পাগলা ম্যানেজার ছিলেন। তিনি জেনুইন নবদম্পতির জন্যে ওই সুইটের ভাড়া কিছু কম নিতেন। কিন্তু পরে কোম্পানি অ্যাকাউণ্টে ভ্রমণকারী সেল্‌সম্যান এবং অফিসারদের কল্যাণে ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সব কোথায় ভেসে গেল।

এই ভি-আই-পি আদর, হনিমুন দম্পতিদের অনেকে বেশ সহজভাবেই গ্রহণ করতেন। মুশকিল হতো একটু লাজুকদের নিয়ে। নতুন বিয়েটা যেন একটা অন্যায় অপরাধ। তাই হনিমুনটা তাঁরা প্রচারের ফ্লাড লাইটের আড়ালে সারতে চাইতেন।

তুমি হয়তো ভাবছ, ডজন ডজন দম্পতির মধ্যে কে যে হনিমুন-জোড়া তা আমরা বুঝতাম কী করে?

ন্যাটাহারিবাবু যদি তোমার এ প্রশ্ন শুনতেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, 'কে কবে বে করেছে, তা মশায় ঘরের মধ্যে পা দিয়েই আমি বুঝতে পারি। আপনার হনিমুন সুইট কেন, ওঁচা একশ এক নম্বর ঘর—যে ঘর আপনারা সবার আগে গচাবার চেষ্টা করেন— সেখানেও এই নতুন বে-করা বর-বউ থাকলে আমি বুঝতে পারি।'

ন্যাটাহারিবাবু হোটেলের প্রত্যেক ঘরের বালিশ এবং বিছানার চাদরের খবরাখবর রেখে ঝানু হয়ে গিয়েছিলেন। এককালে তিনি যে লাট সায়েবের বিছানা করে দিয়েছেন তা তো তুমি নিজের বইতেই লিখেছ। ন্যাটাহারিবাবু বলেছিলেন 'মশাই, আমাদের মধ্যবিত্ত গেরস্ত ঘরের মেয়েদের সিঁথির সিঁদুর পরার ধরন দেখলেই বোঝা যায় নতুন বে হয়েছে। এই ফ্রক পরা ধিঙ্গি মেয়েদের সে বালাই নেই। তবু তাদের কথা শুনে আমি বুঝতে পারি। বরগুলো কেমন মিইয়ে থাকে—যেন আফিমের নেশায় ঝিমুচ্ছে, সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কিন্তু এই নতুন বে-হওয়া এয়োস্ত্রী মেয়েছেলে। দাঁত দিয়ে যেন কড়াইভাজা চিবোচ্ছে—ফরফর করে শুধু কথা। এরা মশাই, আপনাকে জ্বালাতন করে মারবে। কিছুতেই শান্তিতে

থাকতে দেবে না। আপনাকে সেলাম পাঠাবে। বলবে, এখনি চাদর পাল্টিয়ে দাও। আরে মশায়, খোদ লাট সায়েবের বাড়িতে, স্বয়ং লাট-গিন্নী যাতে শোবেন সেখানেও নামে রোজ চাদর পাল্টানো হয়, অর্থাৎ কিনা হেড বেডম্যান শুধু চাদরটা উল্টে দেয়, আর তুমি তো হরিদাস পাল হোটেলে রয়েছ! সেখানে প্রহরে প্রহরে কে মশায় চাদর পাল্টায় বলুন তো?

এইটেই মোদ্দা কথা। কিন্তু সোজাসুজি বলবার উপায় নেই। কে যে আপনাদের শাস্ত্রে লিখে গিয়েছে—খদ্দেরের কথা সব সময়ই ঠিক। সুতরাং মাথা পেতে শোনো। বলা মাত্রই চাদর পাল্টিয়ে দাও।

শ্রীমতি তখন হয়তো রঙ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, আর ছোকরা বেচারা চোখ ছানাবড়া করে ভাবছে—ভগবানের দয়ায় একখানা বিয়ে করেছি বটে। বাঁধিয়ে রাখবার মতো রুচি আমার এই 'পরিবারে'র। কিন্তু মশায়, আমি জানি এ-সবই নতুন বেলার আদেখলেপনা। সোয়ামিকে কাজ দেখিয়ে ট্যারা করে দেবার চেষ্টা। ভাবটা এই—দেখো গো আমার কেমন রুচি; তোমার জন্যে কত চিন্তা আমার; কত পরিষ্কার আমি। আর শুধু অর্ডিনারি বউ নই তোমার—প্রাইভেট সেক্রেটারিকে প্রাইভেট সেক্রেটারি; গার্জেনকে গার্জেন, চাকরাণীকে চাকরাণী!

তাই যখনই কেউ এই লিনেন নিয়ে খুঁত খুঁত করে, তখনই আমি ঘরের ভিতর খুঁটিয়ে দেখি; আর নতুন হোল্ড-অল, নতুন জামা-কাপড় দেখেই বুঝতে পারি এদের নতুন বে হয়েছে। এখন হোটেলের বাবুকে খুব তড়পানো হচ্ছে চাদরের জন্যে; পরে কিছুই থাকবে না। তখন কেঁদে ককিয়ে বেচারা স্বামীকে বিছানার চাদর পাল্টাতে বলতে হবে। নিজের-রোজগার করা পয়সা নিজেই ভিক্ষে করে আপিস যেতে হবে।'

ন্যাটাহারিবাবুর কথা শুনতে আমার ভাল লাগতো। আমাদের হাসতে দেখলে ভদ্রলোক আরও রেগে যেতেন। বলতেন, 'হনিমুন নয় মশায়। নেহাত সায়েব বাড়ির অন্ন খাচ্ছি তাই, না হলে সত্যি কথা বলে দিতাম—আসলে ঘানি-মুন; ওই চাঁদপানা মুখে ফিক করে হেসে বেটাছেলেকে দিয়ে ঘানি টানিয়ে ছাড়ে।'

ন্যাটাহারিবাবু ছাড়াও আরো যারা নতুন বিয়ের খবরটা বার করবার

চেষ্টা করতো তারা হলো বেয়ারা। তাদের এই কৌতূহলের পিছনে অর্থোপার্জন ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকতো না।

ভিতরের খবর বেয়ারারাই আগে জানতে পারতো। তারা আবার অন্য বেয়ারাদের খবর দিতো, সেই বেয়ারা আবার পোর্টারদের জানিয়ে দিতো এবং সেখান থেকে কেমন করে জানি না সমস্ত হোটেলে খবরটা ছড়িয়ে পড়তো। বেয়ারাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়, বেকায়দায় ফেলে সায়েবের কাছ থেকে কিছু আদায় করা। নববধূর সামনে সায়েবকে বকশিশ দিতে আহ্বান করলে সায়েবের হাতটান করবার উপায় থাকে না। আর কম দিলেও বেয়ারারা তাল বুঝে এমন তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে যেন মান সম্মান রাখবার জন্যে সায়েবকে আরও কিছু মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা ভারতবর্ষে রেখে যেতে হয়।

বেয়ারা গুড়বেড়িয়ার কথা তুমি লিখেছো। কাণ্ডটা সেই বাধিয়েছিল। তার তখন হনিমুন সুইটের সামনে ডিউটি। সেখানে এক দম্পতি এসে উঠেছেন। গুড়বেড়িয়া তাঁদের হাবভাব, তাঁদের সুটকেস এবং ভ্রমণের অন্যান্য সরঞ্জাম দেখেই ধরে ফেলেছে যে এঁরা নববিবাহিতা।

গুড়বেড়িয়ার তখন কম বয়স। হোটেলের সব ব্যাপারে তেমন পোক্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বুদ্ধিখানা ঠিক ক্ষুরের মতো। তার কাছেই আমরা শুনেছিলাম এঁরা বিয়ের পরেই দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন।

গুড়বেড়িয়ার চোখে তাঁরা যে ধরা পড়ে গিয়েছেন তা স্বামী ভদ্রলোক ঠিক বুঝতে পেয়েছিলেন। ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে আদি অকৃত্রিম রজতের জারক রসে গুড়বেড়িয়ার মন ভেজাবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সে-খবরও গুড়বেড়িয়ার কাছে আমরা পেয়েছিলাম। গুড়বেড়িয়ার মুখে সেদিন সকাল থেকেই হাসি লেগে ছিল। আমাকে বলেছিল, আগামী কাল তার জন্যে একটা মনি অর্ডার ফর্ম লিখে দিতে হবে। তখনই বুঝলাম, শ্রীমানের কিছু অপ্রত্যাশিত অর্থাগম হয়েছে।

একটু চেপে ধরতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। শ্রীমান আমার কাছে স্বীকার করলে, সায়েব তাকে কাছে ডেকে হাতের মধ্যে একখানা পাঁচ-টাকার নোট গুঁজে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, সায়েব জানেন বেয়ারাদের মাধ্যমেই ব্যাপারটা রটে, তিনি চান তাঁরা যে নববিবাহিত তা

যেন কোনোক্রমেই হোটেলের মধ্যে প্রচারিত না হয়। গুড়বেড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিল, হোটেলের স্টাফ কেন, শাজাহানের ছাদে যে সব কাক পক্ষী বসে তারাও ঘুণাক্ষরে খবরটা জানবে না। তবে প্রতিদানে সায়েবের কাছে অদূর ভবিষ্যতে আরও কিছু বকশিশ আসা করে।

ব্যাপারটা এইভাবে চললে আজ আমার স্মরণ থাকতো না। কিছু লেখবারও প্রয়োজন হতো না। কিন্তু মনে আছে, পরের দিন থেকেই উল্টো ফল ফললো। সেই ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী হঠাৎ সবার লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের দেখলেই অন্য অতিথিরা আড়চোখে তাকান। হোটেলের কর্মচারীদের মধ্যেও যেন একটা নিঃশব্দ আলোড়ন পড়ে যায়। দু-একজন হোটেলের অতিথি লজ্জার এবং প্রচলিত ভব্যতার মাথা খেয়ে কাউন্টারে আমার কাছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করেছেন—"ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, হু ইজ দ্যাট জেণ্টলম্যান? উনি এখানে কতদিন এসেছেন? কতদিন থাকবেন বলতে পারেন?

শাজাহানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ইউরোপ আর আমেরিকার লোকদের গুলে খেয়ে ফেলেছি। অন্যের সম্বন্ধে এমন চাপা কৌতূহল এই মহলে সৃষ্টি করতে হলে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানোর দরকার হয়। সুতরাং একটু অবাক যে হইনি তা নয়।

হোটেলের মধ্যবয়সী মহিলা অতিথিরাও এই দম্পতির পিছনে উঠে পড়ে লেগেছেন মনে হলো। তাঁরাও এঁদের দেখলে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেন। এক আধদিন তাঁদের কথাবার্তার টুকরো লাউঞ্জ থেকে ছিটকে বেরিয়ে কাউন্টারে আমাদের কানে ঢুকেছে। আমি শুনেছি, ওঁরা বলছেন—'আরে বাপু, হোটেল হোটেলই। তার আবার প্রেস্টিজ। সুনাম বলে ওদের যদি কিছু থাকে সে খাওয়ানোর বিষয়ে। অন্য ব্যাপারে ওদের সতীত্ব খুঁজতে যেও না, শুধু মনোকষ্ট পাবে! এই তো তোমাদের শাজাহান। শুনলাম কোনোরকম হেঙ্কি-পেঙ্কি বরদাস্ত করে না। কিন্তু এখন নিজের চোখেই দেখো।'

সেদিন সন্ধ্যেতে ব্যাপারটা আরও ঘনিয়ে উঠলো। হনিমুন সুইটের মহিলা বেশ বিরক্ত হয়েই আমার কাউন্টারে এলেন। ভ্রূ-কুঁচকে বললেন 'আমার ধারণা ছিল এটা ভদ্রলোকের হোটেল।'

বললাম, 'ছিল কেন? এখনও যাতে আপনার সে ধারণা থাকে তার চেষ্টা করবো। কী হয়েছে বলুন?'

ভদ্রমহিলার বয়স বেশী নয়। মাথার চুলগুলোর মধ্যেও বেশ আকর্ষণীয় সৌন্দর্য আছে। সুতরাং এতোদিনে নিশ্চয়ই সপ্রশংস পুরুষচক্ষুর তির্যক দৃষ্টি হজম করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'আমরা পৃথিবীর অনেক হোটেল দেখেছি। কিন্তু কোথাও তো সবাই আমার দিকে অমন অসভ্যের মতো তাকিয়ে থাকে না। প্রথমে সহ্য করছিলাম, ভাবছিলাম অর্ডিনারী অ্যাপ্রিসিয়েটিভ লুক। কিন্তু তোমার হোটেলের বেয়ারারা পর্যন্ত শুধু তাকিয়ে থাকে না, আমি পিছনে ফিরলেই এ ওকে কনুই দিয়ে ধাক্কা দেয়, নিজেদের মধ্যেই ফিসফিস করে আলোচনা করে। এইভাবে আর চলে না, সামথিং মাস্ট বি ডান।'

আমি কী বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অথচ মহিলার চোখ দুটি সত্যই সজল হয়ে উঠেছে। যাবার আগে বললেন, 'এ কী ধরনের নোংরা ব্যাপার? আমরা ভেবেছিলাম শাজাহান একটা রেসপেক্টেবল্ হোটেল।'

আমি এবার সত্যিই চিন্তিত হয়ে উঠলাম। ব্যাপারটা ম্যানেজারের নজরে আনবো কিনা ভাবছিলাম! আমাদের যে সব কর্মচারীরা তাঁর দিকে প্রকাশ্যে ওইভাবে তাকায়, তারা আর যাই হোক হোটেলের চাকরির যোগ্য নয়। যারা মনকে সংযত রাখতে পারে না, তাদের চাকরিতে রাখলে ভবিষ্যতে কোনো একটা কেলেঙ্কারি ঘটা আশ্চর্য নয়।

ভদ্রমহিলাকে পরে আমি ফোনে ডাকলাম। বললাম, 'যদি আমরা এখনই একটা আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড করি, তাহলে তার মধ্যে আমাদের কোন্ কোন্ স্টাফ আপনার দিকে অশোভন ভাবে তাকিয়েছে তা বার করে দিতে পারবেন তো?'

ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলা তাঁর অভিযোগে কাজ হয়েছে দেখে খুশি হবেন। কিন্তু উল্টো ফল হলো, তিনি আরও চটে উঠলেন। বললেন, 'আই অ্যাম অ্যাফ্রেড তাতে ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। তোমাদের এখানে কে যে আমার দিকে ঐভাবে তাকাচ্ছেন না তাই ভাবছি।'

টেলিফোন নামিয়ে ভাবতে লাগলাম। অবসর সময়ে চিন্তা করতে

করতে বুঝলাম ব্যাপারটা যেভাবে গড়াচ্ছে তাতে ম্যানেজারের কানে খবর গেল বলে। তখন যেন কর্তব্যকর্মে আমার শৈথিল্য প্রমাণ না হয়। অবশ্য আমার করবারই বা কী আছে? স্টাফের উপর আমাদের খানিকটা ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু হোটেলের অন্য অতিথিদের আমরা কী ভাবে আটকে রাখবো? ভাবলাম, দু-এক জনকে ডেকে প্রশ্ন করি কেন তাঁরা অমনভাবে তাকিয়ে এই দম্পতির জীবন বিষময় করে তুলেছেন?

কিন্তু আমাকে আর ভাবতে হলো না। একজন বেয়ারা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 'বাবুজী সর্বনাশ হয়েছে; আপনি এখনই হনিমুন সুইটে যান!'

'ব্যাপার কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

সে বেচারা কেঁদে বললে, 'গুড়বেড়িয়ার লাশ এতক্ষণে বোধ হয় মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে।'

'মার্ডার। খুন!' আমি সভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম।

'আপনি এখনই যান হুজুর একবার। আপনার পায়ে পড়ি, দেরি করবেন না।' সে কোনোরকমে বললে।

আমি আর কালবিলম্ব না করে কাউন্টারের কাগজপত্র খোলা অবস্থায় ফেলে রেখে ছুটলাম। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে 'অকুস্থলে' বলে, সেখানে গিয়ে দেখলাম ব্যাপারটা সত্যিই ঘোরতর। সায়েব গুড়বেড়িয়ার দিকে রিভলবার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর বেচারা গুড়বেড়িয়া রণক্ষেত্রে আত্মসমর্পণরত সৈনিকের মতো দু'হাত উপরে তুলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নিজের চরমতম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে। ছোকরা সায়েবকে যা দেখেছিলাম তাতে আগে খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন তাঁর চোখ দুটো দেখে মনে হলো তাঁর মাথার ভিতরে নিশ্চয় টাটা কোম্পানির ফার্নেস জ্বলছে। সায়েবের রক্তে আজ যেন খুনের নেশা চাগাড় দিয়ে উঠেছে। মধুরহাসিনী মেম-সায়েবও ঘাবড়ে গিয়ে সায়েবের হাত দুটো চেপে ধরবার চেষ্টা করে বলছেন—'ডিকি, অবুঝ হয়ো না। তোমার রিভলবার নামাও। চলো আজই আমরা বরং এই হোটেল ছেড়ে চলে যাই।

প্রিয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধেও ডিকি নামক সায়েবের হৃদয় একটুও

কোমল হলো না। তিনি বললেন, 'যাব তো বটেই। কিন্তু তার আগে এই ফেলোকে আমি শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই।'

গুড়বেড়িয়া তখন করুণস্বরে শুদ্ধ মাতৃভাষায় যা নিবেদন করছে তার অর্থ হলো, 'হে শাদা চামড়ার মা জননী, তোমার পায়ে দণ্ডবত। তুমি এই রাক্ষুসে সায়েবের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি আর চাকরি করতে চাই না, আমাকে আমার গ্রামে বাপ-মায়ের কাছে ফিরে যাবার শেষ সুযোগ দাও।'

আমাকে দূর থেকে দেখেই গুড়বেড়িয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।—'আমাকে বাঁচান।'

বধ্যভূমিতে আমি যেন গুড়বেড়িয়ার কাছে দেবদূতের মতো আবির্ভূত হয়েছি। মিষ্টি কথায় সায়েব আপাতত রিভলবার পরিচালনা থেকে বিরত হলেন। সায়েব শার্টে বোতাম লাগাতে লাগাতে বললেন, 'এই লোকটার জন্যে আমার একটুও সিমপ্যাথি নেই। আমার কাছে মুঠো মুঠো টিপস্ নিয়েছে, তারপরও আমাকে ডুবিয়েছে। আমার এবং জিনি সম্বন্ধে এমন স্ক্যাণ্ডাল রটিয়েছে যা মুখে আনতে ঘেন্না করে। আজ সকালে বুঝতে পেরেছি—হোটেলসুদ্ধ লোক কেন এমনভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার ওয়াইফ রাত্রে শোবার সময় কতবার কমপ্লেন করেছে—আমি তখন কান দিই নি। বলেছি, তুমি অ্যাট্রাকটিভ, তাই লোকে তোমার দিকে একবার না তাকিয়ে পারে না। এখন সব ক্লিয়ার হয়ে গেল।'

সায়েব এবার একটু দম নিয়ে রক্ত চক্ষুতে আমার দিকে তাকালেন। রিভলবারটা আমার দিকে না চালিয়ে দেন! বললেন, 'ডু ইউ নো আমাদের সম্বন্ধে এ কী বলে বেড়িয়েছে? ইন ফ্যাক্ট লোকটা যখন হোটেলের কর্মচারী, তখন হোটেলের এগেনস্টে ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায়।'

'কী বলেছ গুড়বেড়িয়া?' আমি প্রশ্ন করলাম।

গুড়বেড়িয়ার চোখের জল তখনও শুকোয়নি। এবার আর এক পশলা অশ্রুবর্ষণ হলো। বললে, 'আমি কী করব হুজুর! সায়েব তো আমাকে বকশিশ দিয়ে বললেন—কেউ যেন না বুঝতে পারে আমাদের নতুন বিয়ে হয়েছে। মেমসায়েব তো রয়েছেন। সোয়ামীর গায়ে হাত দিয়ে বলুন যে সায়েব বলেননি?'

সায়েব রেগে বললেন, 'কে তা অস্বীকার করছে? কিন্তু তুমি তার বদলে কী বলে বেড়িয়েছ?'

গুড়বেড়িয়া এবার যা বললে তাতেই সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সে বললে, পাছে লোকে ধরে ফেলে, তাই আমি সবাইকে বলেছি—'এখন হনিমুন কোথায়? ছ'মাসের মধ্যে ওঁদের বিয়েই হচ্ছে না।'

'জাস্ট থিঙ্ক অফ ইট। আমার বাবা চার্চের প্রিস্ট, আমি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক—আমি এই প্রকাশ্য হোটেলে ডবল-বেড ঘরে রয়েছি—বিয়ের ছ'মাস আগে!' ভদ্রলোক বললেন।

তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী আঁতকে উঠলেন। বললেন, 'ডিকি, আমার মাথা ঘুরছে। আমি এখনই ফেন্ট হয়ে পড়ে যাব।'

ফেন্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনাটা তখন আমি কাজে লাগিয়ে নিয়েছিলাম। 'আপনাদের এখন আর কিছুতেই জ্বালাতন করা উচিত নয়। আমি গুড়বেড়িয়াকে নিয়ে যাচ্ছি', বলে বেরিয়ে এসেছিলাম। ভদ্রলোক তখন স্ত্রীর সেবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে উঠলে, ব্যাপারটা নিশ্চয় ম্যানেজার পর্যন্ত গড়াতো এবং গুড়বেড়িয়ার চাকরিটা রক্ষে করা কিছুতেই সম্ভব হতো না।

গুড়বেড়িয়া অবশ্য কৃতজ্ঞতায় আমার পায়ের ধুলো নিয়েছিল, বলেছিল, সে আমার কেনা গোলাম হয়ে রইল। আমি বলেছিলাম, 'কিছু হতে হবে না। শুধু তোমার নামটা সামান্য পরিবর্তন করবার অনুমতি দাও, এবার থেকে তোমাকে আমি গড়বড়িয়া বলে ডাকব—কারণ যত রাজ্যে গড়বড় পাকাতে তোমার জুড়ি নেই।'

শংকর, আজ যেন আমাকে লেখার নেশায় পেয়েছে। সারা জীবন হোটেলে কাজ করে এসেছি। বিল এবং মেনু ছাড়া আর কোনো ধরণের সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি। তবু আজ অন্তরের চিন্তাগুলো, যা অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে জট পাকিয়ে রয়েছে, তা প্রকাশ করতে ইচ্ছে করছে। তার কারণ বোধ হয় তুমি।

তোমার চৌরঙ্গীতে যেভাবে তুমি আমাকে এঁকেছো, তাতে আমার নিজেরই আমার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে! দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে, আরও কত কথা তোমাকে বলে রাখা উচিত ছিল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর কলকাতার অভিজাত শাজাহান হোটেলের কাউন্টারে

দাঁড়িয়ে মানুষের যে বিচিত্র রূপ দেখেছি, তাতে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি মনুষ্যত্বের এভারেস্ট শিখর দেখেছি, আবার পরমুহূর্তে অতলগর্ভ নীচতার অন্ধকার দেখে বিস্মিত হয়েছি।

ভাবছি, কলকাতায় যতদিন তোমার সঙ্গে বসে গল্প করলাম, ততদিন এসব মনে পড়ল না কেন? তোমার বয়স কম, জীবনের অনেক পরীক্ষায় তোমাকে এখনও পাশ করতে হবে। তোমার শোনা থাকলে কাজে লাগতো। আর এখন কোথায় আমি? তোমাদের থেকে কত দূরে নিঃসঙ্গ আমি আফ্রিকার এক কোণে পড়ে রয়েছি। কেন রয়েছি তা নিজেই জানি না। হয়তো বিধাতার লেজার খাতায় আমার অ্যাকাউন্টে এমনই পোষ্টিং ছিল।

কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক। তুমি আমার চিঠি পড়বে, আর ভাববে শাজাহান হোটেলের রিসেপশনিস্ট স্যাটা বোসের মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছে। কোথাকার এক ত্রয়োবিংশ বসন্তের এয়ারহোস্টেস বৈশাখের ঝড়ের মতো সত্যসুন্দর বোসের ভাগ্যাকাশে আবির্ভূত হয়ে, জীবনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত কালো মেঘে ঢেকে দিল; ঝড়ের প্রলয় নাচন শুরু হলো। তারপর যখন মেঘ কেটে গেল, শান্ত আকাশ আবার তার ঘন নীলবর্ণ ফিরে পেল, তখন দেখা গেল কিছুই নেই—যা পড়ে আছে তা সত্যসুন্দর বোস নয়—একটা ধ্বংসস্তূপ। কথাটা যে একেবারে মিথ্যে তা বলবো না, কারণ আমার মতন লোক হোটেলের কাউন্টারের কাজ ফেলে রেখে বিছানায় বসে বসে পাতার পর পাতা এমনভাবে লিখে যাচ্ছে এ-দেখলে তোমার সুজাতাদিও হেসে ফেলতো। বলা যায় না, হয়তো ঝোলার মধ্যে থেকে ক্যামেরাটা বার করে, আমার এই অবস্থায় একটা ছবিও তুলে ফেলতে পারতো।

শাজাহান হোটেলের হনিমুন সুইটের গল্প তোমার সুজাতাদিকে হোটেলের ছাদে বসে বলেছি হয়তো। তোমার সুজাতাদির কি ইচ্ছা ছিল জানো? তিনি বলেছিলেন, 'তোমার ভক্ত শিষ্য শংকরকে একটা কথা বলে রাখবো। এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি অন্য চাকরিতে চলে যাবে। আমারও বিয়ের পর হাওয়াই হোস্টেসের কাজ থাকবে না। তখন আমরা জোড়ে এই শাজাহান হোটেলেই ফিরে আসবো। শ্রীমান শংকর যেন তখন আমাদের অন্য কোনো ঘরে ঠেলে না দেয়।'

হনিমুন সুইটে গুড়বেড়িয়ার দুরবস্থার কথা লিখতে গিয়ে তোমার সুজাতাদির সেই সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আর ভাবছি, শুধু এই সুইটেই কত ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কেবল এই সুইটটা নিয়েই তুমি বোধহয় একটা মস্ত বই লিখে ফেলতে পারতে। এই সুইটেই ইন্দোনেশিয়ার এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পতন ঘটেছিল। সন্ন্যাসীর অধঃপতনের কাহিনীতে সিনিকরা আনন্দ পেতে পারে, কিন্তু আমার ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগেনি। তোমাকে যতদূর জানি, তাতে তোমারও ভাল লাগবে না। সুতরাং মীং প্রতীপবুদ্ধের পদস্খলনের কাহিনী এখন থাক।

ওই ঘরেই একদিন জন দিনমণি বিশ্বাস তাঁর ক্যামেরা এবং ব্যাগ নিয়ে এসে উঠেছিলেন। একলা লোক, কিন্তু ডবল রুম ভাড়া করেছিলেন। আমরা তখন বুঝিনি। ভদ্রলোক যখন এলেন তখন ডবল রুমে ঢোকবার আগে তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রী একটু পরেই আসবেন।

জন দিনমণি বিশ্বাস নিজের ঘর থেকে বার বার কাউন্টারে ফোন করছিলেন, 'আমার স্ত্রী এসেছেন ?'

আমরা বললাম, 'কই এখনও তো মিসেস বিশ্বাস আসেননি।'

তিনি বললেন, 'বেশ মুশকিলে পড়া গেল তো। ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলাম। হোটেলের রিসেপশনিস্টের কাজ করতে গেলে ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমারও ধৈর্যের তার ছিঁড়ে যাবার মতো অবস্থা। ঠিক দশ মিনিট অন্তর রিসেপশনিস্টের টেলিফোন বেজে উঠছিল। 'হ্যালো, আমার ওয়াইফ বুলা বিশ্বাস এসেছেন কী ? খুব সুন্দর দেখতে। চোখে রিমলেস চশমা। ডান গালে একটা ছোট তিল আছে।'

আমরা বলেছি, 'না, এখনও এসে পৌঁছননি, এলেই আপনাকে জানাবো।'

তিনি বলেছেন, 'না, আমি নিজেই ফোন করে জেনে নেবো। বেচারা বেজায় শাই—যাকে আপনারা বলেন কিনা লাজুক।'

বলেছি, 'এতে আর লজ্জার কী আছে ? হোটেলে স্বামীর কাছে আসছেন।'

'সে আপনারা বুঝতে পারবেন না। অতই যদি বুঝবেন তাহলে আপনাদের সঙ্গে জন দিনমণি বিশ্বাসের কী তফাৎ ? বুলা এত লোক থাকতে আমাকেই বা বিয়ে করল কেন ?'

আমার পাশে তখন আমাদের সহকর্মী উইলিয়ম ঘোষ দাঁড়িয়েছিল। সে বললে, 'বুড়ো বয়সে আদিখ্যেতা দেখলে বাঁচি না!'

আমি বলেছি, 'বিদেশ-বিভূঁয়ে, স্ত্রী না এসে পৌঁছলে চিন্তা হয় বৈকি।'

কিন্তু তখনও ব্যাপারটা বুঝিনি। দশ মিনিট অন্তর এবার টেলিফোন বাজতে শুরু করেছে। 'হ্যালো. রিসেপশন—বুলা এসেছে?'

আমি উত্তর দিয়েছি, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মিসেসে বিশ্বাস এলেই আপনাকে জানাবো বলেছি তো।'

জন দিনমণি বিশ্বাসের সে কথায় কান গেল না। তিন অনবরত ফোন করেই চলেছেন। আমাদের অন্য সব কাজ বন্ধ হবার দাখিল। টেলিফোনটা নামাতে না নামাতে আবার বেজে উঠছে। শেষে বললাম, 'আপনি যদি এতোই উদ্বিগ্ন হন, তাহলে নিচের লাউঞ্জে এসে বসুন।'

'হ্যাঁ! আর আপনারা আমার ভাড়া করা ঘরে এসে বিছানায় ঘুম মারুন! ওখানে আপনারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? আপনাদের মাইনে দেওয়া হয় কেন?' জন দিনমণি বিশ্বাস রেগে জবাব দিলেন।

আমি দুটো কথা শুনিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু কেমন যেন মায়া হলো—স্ত্রীর চিন্তায় ভদ্রলোকের মাথার ঠিক নেই। আমার মা এই রকম সায়েবগঞ্জ থেকে একলা কলকাতা আসতে দেরি করেছিলেন। বাবা তখন লিলুয়া রেল কলোনিতে থাকেন। বাবাও দু'মিনিটের জন্য স্থির থাকতে পারছিলেন না।

জন দিনমণি বিশ্বাস আবার ফোন করলেন। 'ব্যাপার কী বলুন তো? আমাদের ফিফটিন ইয়ার্সের ম্যারেড লাইফ। তার আগে পাঁচবছর কোর্টশিপ করেছি—বুলা হাজরার পিছনে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরেছি, বুলাও আমার জন্যে কতদিন হোটেল রেস্তোরাঁয়, মাঠে, চিড়িয়াখানায় ওয়েট করেছে। কই কখনও তো দেরি করেনি।'

আমি বলেছি, 'মিসেস বিশ্বাস কোথা থেকে আসবেন?'

জন দিনমণি বিশ্বাস টেলিফোনেই চটে উঠেছেন। আমার এতোটা খোঁজখবর নেওয়া তিনি পছন্দ করলেন না। বললেন, তাতে আপনার কী? এই ধরনের অস্বাস্থ্যকর ইনকুইজিটিভনেস আমার ভাল লাগে না। হোটেলে

চাকরি করছেন, গেস্ট যা প্রশ্ন করবে তার উত্তর দিয়ে যাবেন। অত কথার দরকার কী?'

তখন বাধ্য হয়ে বলতে হলো, 'মিস্টার বিশ্বাস, নতুন অতিথিরা কোথা থেকে হোটেলে আসছেন এটা আমরা আইনসঙ্গত ভাবেই জানতে চাইতে পারি। এই খবরটা আমাদের রেজিস্টারে লিখে রাখতে হয়।'

'আগে তাকে আসতে দিন, তখন আপনার খাতায় তার হোল হিস্ট্রি লিখে রাখবেন।' জন দিনমণি বিশ্বাস একটু নরম হয়ে উত্তর দিয়েছেন।

আমি তখন বললাম, 'আপনি অযথা রাগ করলেন। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। কোন ট্রেনে বা প্লেনে আসছেন জানা থাকলে আমরা স্টেশনে বা এরোড্রোমে খবর নিতে পারতাম।'

জন দিনমণি বিশ্বাস উত্তর দিলেন, 'এখনও বলছি টেলিফোন করবার দরকার হলে আমি নিজেই করতে পারবো। আপনি শুধু কাউন্টার থেকে নজর রেখে যান।'

এবার ফোন নামিয়ে দিয়েছি। হাতে অনেক কাজ রয়েছে। কিন্তু ক'মিনিট যেতে না যেতেই আবার ফোন বেজে উঠেছে। এবার সত্যিই আমার পাগল হবার অবস্থা, 'হ্যালো, শাজাহান রিশেপসন? আমার স্ত্রী বুলা বিশ্বাস কী এসেছেন?'

ঠাণ্ডাভাবেই উত্তর দিলাম, 'কই না তো!'

'শুনুন। আমার স্ত্রীর ফিচারস্‌গুলো মনে আছে তো? পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, মাত্র একশো কুড়ি পাউণ্ড। আমার স্ত্রীকে দেখলেই চিনতে পারবেন—ডান গালে একটা তিল আছে, হঠাৎ দেখলে আপনার মনে হবে ন্যাচারাল তিল নয়, বিউটি বাড়াবার জন্যে মেক আপের সময় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমারও প্রথম সেইরকম মনে হয়েছিল।'

উইলিয়ম ঘোষ বললে, 'কার মুখ দেখে উঠেছিলেন দাদা? আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল।'

বেয়ারাদের ডেকে বললাম, 'তোমরা একটু নজর রেখো। কোনো মহিলা এলে সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে বা উইলিয়মের কাছে নিয়ে এসো।'

উইলিয়মকে বললাম, 'তুমি ভাই একটু কাউন্টার সামলাও—আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কয়েকটা কাজ সেরে আসি।'

ম্যানেজারের সঙ্গে স্পেশাল কেটারিং-এর ব্যবস্থা সেরে এসে কাউন্টারে ফিরে দেখলাম উইলিয়ম ফোনে কথা বলছে। হনিমুন সুইটের অতিথিই যে ফোন করছেন তা বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হলো না।

ফোন নামিয়ে উইলিয়ম বললে, 'এমন 'বহুমুখী' প্রতিভা বড় একটা দেখা যায় না।'

'মানে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'মানে, বউয়ের মুখ ছাড়া ভদ্রলোকের আর কিছুই মনে পড়ছে না।'

ভদ্রলোকের সমর্থনে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, বড় হোটেলে কয়েকদিনের জন্যে এসে বউ-এর মুখ ভুলে গিয়ে অন্য মুখের কথা ভাবাটাই তো রীতি।

উইলিয়ম বললে, 'দাদার যে দেখছি, ভদ্রলোকের উপর বেশ দুর্বলতা জন্মে গিয়েছে।'

বললাম, 'জানোই তো, all the world loves the lover—দুনিয়াসুদ্ধু লোক প্রেমিকদের ভালবাসে, সে বিয়ের আগেই হোক, আর বিয়ের পরই হোক।'

'প্রেমিক বটে।' উইলিয়ম উত্তর দিল। 'বলে কি জানেন? ওঁর ওয়াইফ নাকি মেরুন রঙের সিল্কের শাড়ি পরে আসবেন। আমার তো দাদা শুনেই ধাত ছেড়ে যাবার অবস্থা—ভদ্রলোক হাত গুণতে জানেন নাকি? আমি দাদা আপনার মতো বিনয়ী এবং লাজুক নই। সোজা কোশ্চেন করলাম—কেমন করে জানলেন?

তখন মিস্টার বিশ্বাস বললেন, 'বুলা জানে, মেরুন আমার ফেভারিট কালার। আজ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। পনেরোটা ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে যে মেরুন রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে, সে কি আজ নীল রঙের শাড়ি পরবে?' উইলিয়ম এবার হাসতে লাগলো।

আমি বললাম, 'জন দিনমণি বিশ্বাস তোমাকে বেশ পছন্দ করেন মনে হচ্ছে। তুমিই তাহলে ওঁর টেলিফোন অ্যাটেণ্ড করো, ওঁর সঙ্গে ডীল করো।'

উইলিয়ম বললে, 'তাই না! এই সব লোক যারা কমপ্লেন করবার জন্যে উঁচিয়ে আছে, তাদের সঙ্গে ডীল করতে গিয়ে কষ্টার্জিত চাকরিটা খোয়াই আর কী।'

'আর আমার বুঝি সেসব ভয় নেই?'

'আপনার। শাজাহান হোটেলে পাঁচটা গেস্টকে স্যাটা বোস যদি খুনও করে, তবু ম্যানেজম্যাণ্ট কিছু করবে না। বলবে, নিশ্চয় দরকার ছিল, তাই মিস্টার বোস পাঁচটা মার্ডার করেছেন। তেমন দরকার না থাকলে নিশ্চয় চারটে করতেন। আবার তেমন বেশী দরকার হলে ছ'টা করতেন।'

একটু পরেই বাইরের একটা লোক এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'মিস্টার জে ডি বিশ্বাস কোন ঘরে এসে উঠেছেন?'

মনে একটু ভরসা পেলাম। হয়তো মিসেস বিশ্বাসের একটা পাত্তা পাওয়া গেল। কিন্তু কোথায়? লোকটা নিউ মার্কেটের একটা ফুলের দোকান থেকে এসেছে। মিস্টার বিশ্বাস ফোনে ফুলের অর্ডার দিয়েছেন। উইলিয়ম লোকটাকে নিয়ে উপরে চলে গেল।

ফিরে এসে বললে, 'দাদা, এ ফুলশয্যারও বাড়া। এতো ফুল কেউ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে আনে, এ তো আমার পিতৃদেবের জন্মকালেও শোনা যায়নি।'

আমি কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে বেশী নাক গলানো পছন্দ করি না। উইলিয়মকে বললাম, 'সেটা জন দিনমণি বিশ্বাস এবং তাঁর সহধর্মিণী বুলা বিশ্বাস বুঝবেন।'

উইলিয়ম ঘোষ বললে, 'হ্যাঁ দাদা, তবে দিল্ বটে। ফুলওয়ালাকে দাম বাদেও দশটা টাকা বকশিস দিলে। আর দাদা কত রকমের যে ফুল! আমার সামনেই ভদ্রলোক সব খুলে খুলে দেখে নিলেন। ফুলের গয়না, মালা। তার উপর বিছানা সাজাবার ফুল। লোকটা ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেল। হনিমুন সুইট তো এখন দেখলে চেনাই যায় না। দেওয়ালের গায়েও আবার ফুলের রিং। তা দাদা যা সাইজ—রিং বললে ভুল বলা হবে—ঠিক যেন ফুলের টায়ার।'

আমি বললাম, 'ব্যাপার কী? তুমিও যে দিনমণি বিশ্বাসের উপর বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছো মনে হচ্ছে।'

'না দাদা, লোকটাকে দেখলে সত্যি মায়া হয়। আর মিসেস বিশ্বাসকেও বলি, একটা খবর পাঠিয়ে দে। ভদ্রলোক এতোই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন যে আজ লাঞ্চ পর্যন্ত খাননি। বেয়ারা বললে, বিকেলে চা পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। ঘর থেকে একবার বেরোননি পর্যন্ত। শুধু মাঝে মাঝে ফোন

করছেন। ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন।'

উইলিয়ম একটু থেমে আবার বললে, লোকটা একদিকে খুব ভদ্র। আমাকে দশটা টাকা দেবার জন্য ধস্তাধস্তি। বললেন, 'বার বার আপনাদের জ্বালাতন করছি। কিছু মনে করবেন না। খুশি মনে আপনাদের এই সামান্য কয়েকটা টাকা দিচ্ছি। আমি যে বেরোতে পাচ্ছি না, নইলে আপনাদের জন্যে কিছু উপহার এনে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি বেরবো আর যদি মিসেস বিশ্বাস এসে পড়েন। উনি ভাববেন, আমি ওঁর জন্যে কোনো চিন্তাই করিনি। বেশ ফুর্তিতে কোলকাতা শহরে মজা লুটে বেড়াচ্ছি।'

উইলিয়ম উত্তর দিয়েছিল, 'কোনোও প্রয়োজন নেই। আপনি যখন বিপদে পড়েছেন তখন আমরা সর্বরকমে আপনাকে সাহায্য করবো।'

জন দিনমণি বিশ্বাস করুণ চোখে এবার উইলিয়মের দিকে তাকিয়েছিলেন। উইলিয়ম এতোক্ষণে লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। সাধারণ বাঙালীর তুলনায় বেশ লম্বা। এককালে নিশ্চয়ই খেলাধুলো করতেন। এখনও বোধ হয় শরীরকে লাই দেননি, তাই কোথাও মেদাধিক্যের সুযোগ ঘটেনি। ভদ্রলোক যে শৌখিন তার প্রমাণ পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সর্বত্র রয়েছে।

দিনমণি বিশ্বাস বলেছিলেন, 'যদি আমার স্ত্রীর আসতে দেরী হয়, কতক্ষণ আপনারা হোটেলের দরজা খোলা রাখেন?'

উইলিয়ম বলেছিল, 'আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। এই সব হোটেলের দরজা কখনো বন্ধ হয় না। সাধারণতঃ এখানে সারা রাত লোক যাতায়াত করে।'

'ভদ্রলোক?' জে ডি বিশ্বাস প্রশ্ন করেছিলেন।

'হ্যাঁ। রাত্রে অনেক সময় প্লেনের প্যাসেঞ্জার আসে। কিছু আবার যায়ও।'

'তাহলে আমার ভয় পাবার কিছু নেই, কী বলেন?' মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

উইলিয়ম উত্তর দিয়েছিল, 'মোটেই নয়। নিশ্চয়ই মিসেস বিশ্বাস

কোথাও আটকে গিয়েছেন। আসা মাত্রই আপনাকে ফোনে খবর দেওয়া হবে, সে যত রাত্রিই হোক।'

রাত্রি তখন মন্দ হয়নি। মিস্টার বিশ্বাস আবার ফোন করেছিলেন। উইলিয়ম বলেছিল, 'কেন অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন? বরং আপনি ক্যাবারেতে গিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা ভুলে থাকুন। নাচ-গান হৈ-হল্লায় মনটা একটু শান্ত হবে।'

'ক্যাবারেতে গেলে আপনি কি কমিশন পান?'

'না না, সে কি কথা!'

'তাহলে আমাকে মমতাজ রেস্তোরাঁয় ক্যাবারে নাচ দেখতে বলছেন কেন? সারাদিনের পথশ্রমের পর বুলা এসে যদি শোনে আমি ক্যাবারেতে আপনাদের প্রায়-উলঙ্গ বেলি ডান্সারদের নাচ দেখছি, সে কী ভাববে বলুন তো?' জে ডি বিশ্বাস আরও বলেছিলেন, 'ব্যাপার কী বলুন তো? আপনারা কী আমার এবং আমার স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে একটা ফাটল ধরিয়ে দিতে চান?'

উইলিয়ম লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে উত্তর দিয়েছিল, 'আই অ্যাম স্যরি। অনেকের স্ত্রী ক্যাবারে খুব সহজভাবে নেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁরাও আসেন, নাচ দেখেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, তারপর বাড়ি চলে যান।'

'বুলাকে তাহলে আপনারা খুব চিনেছেন। আপনাদের এই মডার্ণ সমাজে তাকে একটা এক্‌সেপশন বলতে পারেন। বড্ড লাজুক। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লজ্জা পায়। যদি সে শোনে আমি তার জন্যে আপনাদের এইভাবে উদ্ব্যস্ত করেছি, তাহলে সে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবে। আর ঘরের মধ্যে ফুল দেখলে হয়তো ঢুকতেই চাইবে না। তখন আপনাদের আর একটা সিঙ্গল রুম দিতে বলতে হবে।'

সেদিন রাত্রেও আমার ডিউটি ছিল। ডিনারের পর একটু ঘুমিয়ে যখন কাউন্টারে উইলিয়ামের কাছে চার্জ নিতে এলাম তখন ক্যাবারে ভাঙবার সময় হয়ে গিয়েছে। মিসেস বিশ্বাস এখনও রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করেননি শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুঝলাম আজ রাত্রে আমার দুর্গতির অন্ত থাকবে না। হনিমুন সুইটের অতিথি আমার জীবনকে তিক্ত করে ছাড়বেন।

ক্যাবারে ভাঙবার পরই জে ডি বিশ্বাস ফোন করলেন। 'হ্যালো, আমার স্ত্রীকে দেখছেন না কি?'

বললাম, 'এখন কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেখছি না। এইমাত্র ক্যাবারে ভাঙলো। সবাই বেরিয়ে যাচ্ছেন।'

জন দিনমণি বিশ্বাস এবার যেন একটু ইতস্ততঃ করলেন। বললেন, 'আপনার মনে আছে তো, মেরুন রঙের সিল্কের শাড়ি। ডান গালে একটা তিল।'

বললাম 'এ-সব ব্যাপারে আমাদের ভুল হয় না।'

পনেরো মিনিটও কাটলো না। আবার ফোন তুলে ধরেছেন জে ডি বিশ্বাস। এবার গলায় বেশ ঝাঁঝ। 'মিসেস বিশ্বাস এসেছেন?'

'এলে জানতে পারতেন,' উত্তর দিলাম।

ভদ্রলোক এবার রাগে ফেটে পড়লেন, 'ইয়ারকি ছাড়ুন। নিশ্চয়ই বুলা এসে পড়ে আপনাদের টাকা দিয়েছে। বলেছে আমাকে যেন কিছু না বলা হয়।'

আমি কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না।

জে ডি বিশ্বাস কাতরকণ্ঠে বললেন, 'দয়া করে আমাকে আর কষ্ট দেবেন না। জানেনই তো আমাদের বিয়ের লগ্ন ছিল রাত একটা পঁচিশ। ও হয়তো ঠিক সেই সময় আমার ঘরের মধ্যে টুক করে ঢুকে পড়ে আমাকে অবাক করে দেবে। বিয়ের তারিখে যত দুষ্টু বুদ্ধি ওর মাথায় খেলে। অন্যদিন কেমন নরম লাজুক হয়ে থাকে, বিয়ের তারিখটাতে একেবারে পালটিয়ে যায়।'

বললাম, 'আপনাদের বুঝি হিন্দুমতে বিয়ে হয়েছিল?'

'তবে কোন্ মতে হবে?'

'না, ওই জন কথাটার জন্যে আমি···'

'আপনি ভেবেছেন আমি খ্রীস্টান, আমার চার্চে বিয়ে হয়েছিল। যেমন বুদ্ধি আপনার। না হলে হোটেলের রিসেপশনিস্ট্ হয়ে পচবেন কেন? কবে তো আমার মতো ইণ্ডিয়ার বাইরে গিয়ে লাক্ ট্রাই করে দুপয়সা রোজগার করে আসতেন। আরে মশাই, জন নামটা আমার দাদামশাই, আদর করে দিয়েছিলেন। উনি জন প্যাটারসনে চাকরি করতেন। তাঁর

জামাই অর্থাৎ আমার বাবাও ওখানকার স্টাফ। আমি যখন হলাম, জন প্যাটারসনের তখনকার বড়সায়েব খুব রসিক লোক। খবর পেয়েই দাদুকে ডেকে পাঠালেন। 'উপীন, ভেরি হ্যাপি নিউজ। এটা তো অল জন প্যাটারসন অ্যাকেআর।' সায়েব তখনই বাবা আর দাদুকে তিন দিনের ছুটি দিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে—একমাসের মাইনে।

'নাম রাখবার সময় কৃতজ্ঞ দাদামশাই জন নামটা জুড়ে দিলেন। আমার ঠাকুমা আপত্তি করেছিলেন। দাদামশাই বুঝিয়েছিলেন 'এতে নাতির চাকরি পেতে সুবিধা হবে। নাতি যখন বড় হবে তখন এক কথায় জন প্যাটারসন জন দিনমণি বিশ্বাসকে নিয়ে নেবে।'

জে ডি বিশ্বাস রাত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন পালটিয়ে যাচ্ছেন। যিনি একটা কথা বাড়তি জিজ্ঞাসা করবার জন্যে বিকেলবেলায় রাগ করেছিলেন, তিনি এখন একজন অপরিচিত রিসেপশনিস্টকে টেলিফোনের মাধ্যমে নিজের জন্মবৃত্তান্ত শোনাচ্ছেন।

'হ্যালো, রিসেপশনিস্ট, আপনার নামটা কী?'

'আজ্ঞে সত্যসুন্দর বোস। লোকে আমাকে স্যাটা বোস বলেই জানে।'

'তবে শুনুন মিস্টার বোস। বুলাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। আপনার মতো আমার নাম শুনেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর ফুলশয্যার দিনে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমার মেমসায়েব বিয়ে করবার ইচ্ছে ছিল, তাই জন কথাটা নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলে।'

জে ডি বিশ্বাস এবার টেলিফোনেই হেসে উঠলেন। 'বুঝুন ব্যাপারটা মশাই। গাউনপরা মেমসায়েব বিয়ে করবার লোভে মানুষ নাকি নিজের নাম পাল্টায়। একেবারে ছেলেমানুষ। বুদ্ধিসুদ্ধি ঠিক সেই বারো বছরের ফ্রক পরা মেয়ের মতো।'

জে ডি বিশ্বাস এবার টেলিফোনটা ছাড়লে বাঁচি। কাউন্টারে কাজ নেই বটে, কিন্তু সুযোগ পেলে চেয়ারেই একটু ঢুলে নেওয়া যা। কিন্তু বিশ্বাস তাঁর স্ত্রীর কথা আমাকে শোনাবেনই। বললেন, 'ভাগ্যিস বাচ্চা-টাচ্চা হয়নি। না হলে বুলা যে কী করে ছেলে মানুষ করতো জানি না। ভালই হয়েছে মশাই, চাইল্ডের মুখ দেখিনি বটে, কিন্তু ছেলে মানুষ করবার

হাঙ্গামা থেকে বেঁচে গিয়েছি। এই রাত্রে একজনের কথা ভাবছি। তখন দুজনের কথা ভাবতে হতো।'

কী আর বলি। উত্তর দিলাম, 'ঠিকই বলেছেন, আর দেশের যা অবস্থা। জনসংখ্যা যত কম বাড়ে ততই ভাল।'

জে ডি বিশ্বাসকে আরও বললাম, 'আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

জে ডি বিশ্বাস এবার মিষ্টিভাবে আমাকে ভৎর্সনা করলেন। 'নিশ্চয়ই বিয়ে-থা করেননি?'

'কেমন করে বুঝলেন?'

'ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির রাত্রে কোনো বিবাহিত লোক তার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তে পারে? আপনাকে যে লোকে পাগল বলবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু এইভাবে তো সেই সকাল থেকে বসে আছেন। আপনার শরীরটারও তো দাম আছে।'

'দূর মশাই?' জে ডি বিশ্বাস উত্তর দিলেন। 'আজই তো আনন্দ। একটু হৈ হৈ, একটু গল্পগুজব, ভালমন্দ খাওয়া-দাওয়া।'

'খাওয়া-দাওয়া? এতো রাত্রে তো হোটেলে কিছু পাবেন না।' আমি বললাম।

'সেটা কি আর জানি না ভাবছেন? এতো রাত্রে এইসব হোটেলে একটি জিনিস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। তার আবার অর্ডার দিতে হয় না। বেয়ারারা এসে জিজ্ঞাসা করে যায়। আমি মশাই সেই জন্যে স্টুয়ার্ডকে বলে ঘরে দুটো ডিনার আনিয়ে রেখে দিয়েছি। রাত একটা পঁচিশে আমাদের বিয়ের লগ্ন ছিল। তার ঠিক আগেই দেখবেন বুলা এসে হাজির হবে। মশাই, এখন বলতে লজ্জা নেই, বিয়ের রাত্রে আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতবার বুলা আমাকে সেজন্যে সুযোগ পেলেই রসিকতা করেছে। তারপর থেকে মশাই বিয়ের বার্ষিকীতে কখনও আমি ঘুমোইনি।'

আমি বললাম, 'ও। আচ্ছা, আমি তো কাউন্টারে রয়েছি। মিসেস বিশ্বাস এলেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'দাঁড়ান মশাই। আপনি বেজায় চালাক লোক, ওই কথা বলে লাইনটা

কেটে দিতে চান।' জে ডি বিশ্বাসকে এই গভীর রাত্রে যেন গল্পের নেশায় পেয়েছে। তিনি বললেন, 'আপনার স্টুয়ার্ডকে কিন্তু আজকের জেনারেল ডিনারের মেনু অর্ডার দিইনি। ওই সব তো গরম না থাকলে খাওয়া যায় না। তার বদলে কোল্ড স্যুপ, কোল্ড চিকেন, বয়েল্ড ফিস। ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিতে সব কিছু কোল্ড মশাই, শুধু ওয়ার্ম হার্ট, একেবারে উষ্ণ হৃদয়।'

জে ডি বিশ্বাস এবার ফোনটা নামিয়ে রেখে আমাকে একটু শান্তি দিলেন। দিনেও ডিউটি ছিল আজ। তার ওপর রাত্রের এই উপরি কাজ। ক্লান্ত দেহটা মনের উপর বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই ছিল। আর রাত্রের শাজাহান হোটেলকে তুমি তো দেখেছো। কোনো দুরন্ত ছেলেকে হঠাৎ শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে দেখলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বাধাবন্ধহীন রাতের ফুর্তির পর শাজাহানকে এমনভাবে ঝিমিয়ে পড়তে দেখলে আমার ভাল লাগে না। একলা জেগে থাকলে মনের অবস্থা কেমন যেন হয়ে যায়। আমার সাহিত্য প্রতিভা থাকলে মনের এই ভাবটা ঠিক মতো প্রকাশ করতাম। কিন্তু আমরা হোটেলের কেরানী, কে আমাদের কাছে সাহিত্য আশা করবে?

তবু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বহু রাত্রি কাউণ্টারে একা দাঁড়িয়ে আমি নিজের সঙ্গে কথা বলেছি, বহুক্ষণ ধরে আত্মসমীক্ষা করেছি। সেই রাত্রেও করছিলাম। ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে আমি ছাড়া আর একজন শাজাহানের হনিমুন সুইটে প্রিয়ার আবির্ভাব প্রত্যাশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করছে। লোকটাকে রোমান্টিক বলতে হবে। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণটাই তো সংসারের চাকায় লুব্রিকেটিং অয়েলের কাজ করে—ঘর্ষণ কমে যায়, সংসার-চক্রের আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে আসে। এই প্রিয়া-প্রীতিকে সমালোচনা করবার কী অধিকার আছে আমার?

এদিকে হনিমুন সুইটে জন দিনমণি বিশ্বাস এবং বুলার বিবাহ লগ্ন বুঝি বয়ে যায়। ঘড়ির বড় কাঁটা প্রায় পঁচিশের ঘরে এসে পড়েছে। মিস্টার বিশ্বাসের ধৈর্যের বাঁধ যে ভেঙে পড়ছে তা তাঁর টেলিফোনের গলা শুনেই বুঝলাম। 'হ্যালো!'

'হ্যালো মিস্টার বিশ্বাস, আমি স্যাটা বোস কথা বলছি।'

'আপনি স্যাটা বোসই হোন আর ঠুঁটো ঘোষই হোন—হোয়াট্‌স দ্যাট টু মি? তাতে আমার কী? আমি জানতে চাই আপনি শাজাহান হোটেলের রিসেপশনিস্ট কিনা?'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। একটু আগেও ভদ্রলোক কত অন্তরের কথা বলেছেন। লোকটা মিনিটে মিনিটে পাল্টায় নাকি?

দিনমণি বিশ্বাস বললেন 'আপনি যদি মিথ্যে কথা বলেন তাহলে নিজের দায়িত্বে বলবেন। বুলা এসেছে কিনা বলুন?'

বললাম, 'আসলেই জানতে পারবেন।'

দিনমণি বিশ্বাস এবার রেগে উঠলেন। 'আপনি জানেন না আপনি আগুন নিয়ে খেলা করছেন। কোর্ট ঘর করতে হবে, হাজত বাসও হতে পারে। বুলাকে এইভাবে লুকিয়ে রেখে ভাবছেন আপনারা বেঁচে যাবেন, তা হবে না, সবাইকে ঝোলাব আমি।'

আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না। একটু ভয়ও হলো। এই রাত্রে নারীঘটিত কি মামলায় জড়িয়ে পড়ছি কে জানে। বললাম, 'কী সব বাজে বকছেন?'

'ওষুধ ধরেছে তাহলে। এবার সুড় সুড় করে বলে দিন বুলাকে কেউ কিছু করেছে কিনা। বেচারী একলা আসছিল।'

বললাম, 'গড ফরবিড, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। হাসপাতালে খোঁজ নিন।'

'জে ডি বিশ্বাস কি ঘরের মধ্যে টেলিফোন কোলে করে খেলা করছে? কোনো হাসপাতাল বাদ রাখিনি। সব জায়গায় খোঁজ করেছি, কোথাও নেই।'

'কোথা থেকে আসছিলেন? যদি কলকাতার বাইরের কোনো হাসপাতাল হয়?'

'বাজে বকবেন না মিস্টার বোস। আপনি যতই চেষ্টা করুন, বুলা কোথা থেকে আসছিল আমি কিছুতেই বলব না। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমি যে-সব জায়গায় ফোন করেছি, বুলা তার কোনো একটায় থাকত।'

আমি এবার একটু আমতা আমতা করলাম। "শেষে বলেই ফেললাম, 'কিছু মনে করবেন না। কিন্তু এখন বোধহয় আপনার লালবাজারে খবর দেওয়া উচিত। এত রাত্রি হয়ে গেল, ভদ্রমহিলা একলা আসছিলেন।'

জে ডি বিশ্বাস এবার যা উত্তর দিলেন তাতে সত্যিই আমি চিন্তান্বিত হয়ে উঠলাম। 'বুলাকে আপনি দেখেন নি। বুলা যা সুন্দর তাতে পুলিস কিছু করতে পারবে না। লালবাজারের কাম নয়, ফোর্ট উইলিয়মের মিলিটারিরা যদি পারে। তা কেমন মশাই এখানকার ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট? তাদের হেল্প চাইলাম। পুলিসে ফোন করুন বলে, টেলিফোন নামিয়ে রেখে দিল। রোগা রোগা দুটো পুলিস লাঠি হাতে কী করবে বলুন তো?'

আমি বললাম, 'লাঠি কেন, রাইফেল রিভলবার এ সব আছে।'

বিশ্বাস যেন এবার একটু আশ্বস্ত হলেন। 'আর্মড পুলিস কোথায় থাকে মশাই?'

'ব্যারাকপুরে।'

'তাহলে ওদেরই একবার ফোন করি। কী বলেন?'

আমি বললাম, 'ওদের ফোন করে লাভ নেই। আপনি লালবাজারকেই বলুন। দরকার হলে তাঁরাই ব্যারাকপুরকে জানাবেন।'

জে ডি বিশ্বাস নিশ্চয়ই আজ রাত্রে বেশ কয়েক পেগ টেনেছেন। না হলে এমন ছেলেমানুষের মত কথা বলেন! তিনি এবার বললেন, 'তাহলে মিলিটারি ডাকা যায় না? পুলিশগুলোর গায়ে জোর আছে তো?'

এবার বলে ফেললাম, 'ইচ্ছে করলে পুলিস লাটসায়েবকে দিয়ে মিলিটারিদের ডাকতে পারে। তেমন যদি দরকার হয়।'

'আচ্ছা তাহলে শেষ চেষ্টা করি। আপনি যখন বলছেন তখন লালবাজারকেই ডাকি। বুলার জন্য আমাকে সব করতে হবে।'

জন দিনমণি বিশ্বাস যে লালবাজারে ফোন করেছিলেন তা একটু পরেই বুঝলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যে পুলিশের গাড়ি এসে হাজির।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, 'জন দিনমণি বিশ্বাস এই হোটেলে এসে উঠেছেন?'

বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁর স্ত্রী বুলা বিশ্বাসকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।'

ইন্সপেক্টর এবার হাসলেন। 'আই সি। যাক, সব তাহলে মিলে যাচ্ছে! বুলা বিশ্বাসের নাম যখন পাওয়া গেছে তখন আর ভয় নেই। ভাগ্যিস ফোনটা পাওয়া গেল, না হলে সারারাত আজ জ্বালিয়ে মারতো।'

আমি ওঁদের মুখের দিকে তাকালাম। 'বুলা বিশ্বাসকে আপনারা উদ্ধার করেছেন নাকি?'

বুলা বিশ্বাসের রিকভারির জন্যে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি জে ডি বিশ্বাসের খোঁজে। আমাদের ওঁর ঘরে নিয়ে চলুন। আর ওঁর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আছে তো? বলা যায় না, হয়তো আমরা এসেছি জানলে দরজাই খুলবেন না।'

আমার এবার সত্যিই ভয় ধরে গেল। 'আপনারা মিস্টার বিশ্বাসকে খোঁজ করছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের চাকরির যে কত ঝামেলা তা তো জানেন না। সারাদিন ধরে বিশ্বাসের খোঁজে আজ কলকাতার অলিগলি ঢুঁড়ে ফেললাম। তখন যদি একবার শাজাহান হোটেলে আসতাম, হয়তো একটা রিওয়ার্ড পাওয়া যেতো।'

ডুপ্লিকেট চাবির দরকার হলো না। দরজা জে ডি বিশ্বাস নিজেই খুলে দিলেন। বললেন, 'যাক, আপনারা তাহলে এসে গিয়েছেন। বুলাকে এনেছেন?'

'আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি, বুলাকে নয়।' ইন্সপেক্টর বললেন।

'এ কি রাজত্ব! বুলাকে খুঁজে দেবার সামর্থ্য নেই, অথচ আমাকে নিতে এসেছে!'

ওঁদের সঙ্গেই জে ডি বিশ্বাস নেমে এলেন। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস বললেন, 'আপনারা কী আর্মড্ পুলিস থেকে আসছেন? আপনাদের বন্দুক কই?'

ইন্সপেক্টর সার্জেন্টকে বললেন, 'গাড়ি থেকে মিস্টার বিশ্বাসের মাকে ডাকো—আইডেন্টিফাই করুন।' তারপর মিস্টার বিশ্বাসকে বললেন, 'না আমরা আর্মড পুলিস নই—আমরা মিসিং পার্সন্স্ স্কোয়ার্ড। লোক হারিয়ে গেলে খুঁজে দেওয়া আমাদের কাজ।'

এক বৃদ্ধা বিধবা এবার পাগলের মতো কাউন্টারের দিকে ছুটে এলেন। 'ওরে দিনু আমার। সারাদিন তুই কোথায় ছিলি রে?'

মা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ইন্সপেক্টর ওদের বললেন, 'চলুন এবার যাওয়া যাক, কাল এসে হোটেল থেকে মালপত্তর নিয়ে যাবেন।'

মধ্যরাত্রের এই নাটকে আমি যে একদম বোকা বনে গিয়েছি তা পুলিসের সহৃদয় ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন। পুলিসের সঙ্গে বিশ্বাস ও তাঁর মা একটু এগিয়ে যেতে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আর বলেন কেন। মেণ্টাল কেস, বাড়িতে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়—কী ভাবে পালিয়ে এসেছে। যুদ্ধের সময় বেচারার স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চৌরঙ্গী রোড দিয়ে আসছিলেন। বিশ্বাস তাঁর স্ত্রীর জন্যে অফিস থেকে বেরিয়ে কার্জন পার্কে অপেক্ষা করছিলেন। ওখান থেকে হোটেলে খেতে যাবার কথা ছিল। হয়তো আপনাদের এখানেই আসতেন। পথে নিগ্রো সোল্‌জাররা রাস্তা থেকে মিসেস বিশ্বাসকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। আর খবর পাওয়া যায়নি।'

ইন্সপেক্টর ওদের নিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলাম। বিশ্বাস করো, সে রাত্রে আমি একবারও চোখের পাতা বন্ধ করিনি। হাতে পেন্সিলটা নিয়ে কাউন্টারে একটা প্যাডের কাগজে হিজিবিজি টেনেছি।

বেচারা জন দিনমণি বিশ্বাসের বিবাহ-রজনী আর হনিমুন সুইটকে আমি কিছুতেই আলাদা করে দেখতে পারি না। বুলা বিশ্বাস এখন কোথায় কে জানে। হয়তো তাঁর কিছুই অবশিষ্ট নেই—থাকলে জন দিনমণি বিশ্বাস পুলিস দিয়ে হোক, মিলিটারি দিয়ে হোক তাঁকে উদ্ধার করতেন।

হোটেলের সুদীর্ঘ জীবনে কত লোকের কত বিচিত্র খেয়ালে, কত অন্যায় উপরোধে বার বার ব্যতিব্যস্ত হয়েছি। মাঝে মাঝে রাগও হয়েছে। কিন্তু জন দিনমণি বিশ্বাসের মতো মানুষের অত্যাচার আমি এখনও বার বার সহ্য করতে রাজী আছি।

মানুষের দৈহিক বিকলতা নিয়ে আলোচনা করে যারা আনন্দ পায় তারা আমার ক্ষমার অযোগ্য। মানসিক বিকৃতি বা ব্যর্থতাকে মূলধন করে যারা সাহিত্য করে তাদেরও আমি ভালবাসি না। কিন্তু জন দিনমণি বিশ্বাসের ব্যবহারের মধ্যে কোথাও তো অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ ছিল না। খবর নিয়ে জেনেছিলাম, আমাদের সঙ্গে যেদিন তাঁর দেখা হয়েছিল সেদিন সত্যিই তাঁর বিবাহ-বার্ষিকী।

এই পেয়ে হারানোর বেদনার সঙ্গে তোমার আফ্রিকা-প্রবাসী দাদা বেশ পরিচিত। জন দিনমণি বিশ্বাসের জীবনে তবু বুলা বিশ্বাসকে স্মরণ করবার মতো একটা সোনার দিন আছে। তোমার সত্যসুন্দরদার জন্যে তোমার সুজাতাদি তাও রেখে যাননি—বিবাহ-বার্ষিকীর স্মৃতিটুকু থাকলেও জীবন হয়তো কিছুটা সহনীয় হতো। আমার জীবনে কেবল একটা নিরাভরণ দিন আছে। প্রতি বছর শ্রাবণের বৃষ্টি-মুখরিত সেই দিন ধীর পদক্ষেপে আমার কাছে আকস্মিক দুর্ঘটনায় সুজাতার মৃত্যুবারতা বয়ে নিয়ে আসে। আমার আনন্দময় তপোবনে মূর্তিমান ব্যাধের মতো যে টেলিগ্রামটা এসে প্রবেশ করেছিল, সেইটাই যত্ন করে রেখে দিয়েছি। সেইদিন আস্তে আস্তে সেটাকে চোখের সামনে মেলে ধরি। ভাবি, হয়তো ওটা অন্য কারুর টেলিগ্রাম, ডাকঘরের লোকেরা ভুল করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

নিজের অন্তরের আবেগেই জে ডি বিশ্বাসের কথা লিখে ফেললাম। যদি ইচ্ছে হয়, তার বেদনাকে ভস্ম করে বিশ্বমাঝে জড়িয়ে দিও—তার কথা লিখো।

তুমি আমার ভালবাসা জেনো। ইতি—নিত্যশুভার্থী

তোমার সত্যসুন্দরদা

ভাই শংকর,

তোমার পাঠানো বই ও চিঠি পেলাম। খুব আনন্দ হলো। চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেলের রিসেপশনিস্ট স্যাটা বোসকে তুমি যে এইভাবে মনে

রাখবে তা কোনোদিন কল্পনাও করিনি। এক বিলাসপুরীর চিলে কোঠায়, নিজের অন্ন সংস্থানের জন্যে যে লোকটা জীবনের প্রধান অংশ প্রায় বন্দী-দশায় কাটিয়েছিল, তার জীবন-কাহিনী লেখবার বদখেয়াল যে তোমার মাথায় চাপবে তা কে জানতো ?

তোমার সুজাতাদি থাকলে আজ আমার বেশ মুশকিল হতো। সারাক্ষণ জ্বালিয়ে মারতেন। হয়তো বলতেন, "শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল, এই নিষ্করুণ দুনিয়ায় চৌরঙ্গীর শাজাহান হোটেলে এক নতুন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর তাঁরই কথামৃত রচনা করেছেন শ্রীম-র নতুন এডিশন শ্রীমান শংকর।"

তারপরও হয়তো কত কথা বলতেন—যা শুনে তুমি মনে মনে খুশি হতে এবং মুখে রাগ দেখাতে। আর আমাকে চটে যেতে হতো। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে ভালই হয়েছে—সেই প্রাণোচ্ছল তরঙ্গ আজ আর আমাদের তীরভূমিতে আঘাত হানবে না। আজ আর আমাদের সেই তরঙ্গের তালে তালে আনন্দ-নৃত্য করতে হবে না।

শ্রীমান শংকর, তুমি আর আমি দুজনেই বড় জোর বেঁচে গিয়েছি। তিনি আর বাংলাদেশে এই গুরুশিষ্যকে নিয়ে কৌতুক করবার জন্যে আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই।

এখন রাত অনেক। আফ্রিকার পশ্চিমতম প্রান্তে আমার ঘরে বসে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি। আমার ঘর ভিতর থেকে চাবি বন্ধ। সামনে একটা টাইমপিস ঘড়ি চলছে—সেই ঘড়ি যেটা তোমার সুজাতাদি সেবার শাজাহান হোটেলে আমার টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ফ্লাইং ডিউটিতে চলে গেলেন। আমি জানতাম না—সুজাতা শুধু তোমায় সমস্ত ব্যাপারটা বলে গিয়েছিল। ড্রয়ারের মধ্যে হঠাৎ টাইমপিস ঘড়ি দেখে আমি অবাক। কোথা থেকে এল ? এমন ঘড়ি এখানে কে ফেলে গেল ?

তুমি বলেছিলে, "যিনি ফেলে গেছেন তাঁকে চিনি, কিন্তু নাম বলা বারণ। তিনি বলেছেন, তোমার দাদার একটা অ্যালার্ম ঘড়ি খুব প্রয়োজন, না হলে ডিউটি আওয়ার্সের আগে ঘুম ভাঙতে কষ্ট হয়। কোনো কোনোদিন আবার উদ্বেগে অনেক আগে থেকে ঘুম ভেঙে যায়।"

ঘড়িটা পর পর-কতদিন যে আমার ঘুম ভাঙাতে সাহায্য করেছে তা তুমি জান। আজও সেটা আমার এই বিদেশী ঘরে আপন মনে বকে চলেছে। কিন্তু এখন আমার ঘুম ভাঙাবার প্রয়োজন হয় না। কিছুদিন হলো নিদ্রাদেবী আমার উপর বিশেষ বিরূপা হয়েছেন। আমার নিদ্রাবিহীন রাত্রির সাক্ষী হয়ে থাকবার জন্যেই যেন ঘড়িটা সারারাত জেগে থাকে। তফাতের মধ্যে যন্ত্রটা কেমন নিজেকে নিয়েই মশগুল থাকে, সারাক্ষণ নিজের কাছেই নিজের কথা বলে চলে।

আমার সে অবস্থা নয়। একা একা রাত্রে নিজের ঘরে গুমরে মরি, ছটফট করি। মনে হয় কোনো গুরুতর নিয়মভঙ্গের অপরাধে জেলখানার নির্জন সেলে আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। শুধু রাত্রি নয়, দিনের বেলাতেও মনটা এখন সেলের মধ্যেই বসে থাকে। কতদিন যে বাংলায় কথা বলিনি!

আমি কদিন থেকে একটা কথা ভাবছি। কলকাতায় তোমার অবস্থা কেমন? কেমন ভাবে তোমার দিন কাটছে? তোমাকে জোর করছি না, তোমাকে কোনো নতুন মতলবও দিচ্ছি না। তবে মনে রেখো ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এক অজানা মহাসাগরের তীরে তোমার এক দাদা আছেন। তিনি তোমার নিত্যশুভার্থী। এই আত্মীয়বিহীন পৃথিবীতে তুমি বোধহয় তাঁর একমাত্র জীবিত আপনজন। যদি কখনও তোমার ইচ্ছে হয়, যদি কখনও তোমার প্রয়োজন হয়, তখনই তুমি আমার কাছে চলে আসতে পার। আমি আমার ছোট ভাইকে কাছে পাব, আর হোটেল আফ্রিকা এমন একজন কর্মীকে পাবে যে অনেক অভিযোগ সত্ত্বেও পান্থশালার জীবনকে ভালবাসে।

ভাই শংকর, বোধহয় তোমার এখানে কাজ করতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না। হোটেল আফ্রিকায় একজন নতুন ম্যানেজার নিযুক্ত হচ্ছেন। তাঁর নাম স্যাটা সি বোস! মার্কোপোলো এক আন্তর্জাতিক চেন হোটেলে চাকরি পেয়েছেন। মাইনে অনেক বেশী। ভাবী ম্যানেজার হিসেবে তিনি যে আমার নাম রেকমেণ্ড করেছেন তা জানতাম না। কাল পাকাপাকি খবর এসেছে, কর্তৃপক্ষ রাজী। মার্কো নিজেই খবরটা দিলেন। হোটেল আফ্রিকার ভাবী ম্যানেজার তোমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন—সময়মতো বিবেচনা করে দেখো।

চাকরি-বাকরির কথা থাক, তোমার দাদাকে চোখে চোখে রাখবার ইচ্ছে যদি থাকে তাহলে এসো।

তোমার কথায় আসা যাক। তোমার চিঠির একটা অংশ পড়ে খুব মজা লাগল। তুমি লিখেছ, অনেক পাঠক পাঠিকা জানতে চান পৃথিবীতে সত্যসুন্দর বোস বলে সত্যিই কেউ ছিল কি না। না তুমি গল্প লেখবার জন্য নিজের কল্পনা থেকে একজন সত্যসুন্দর বোসকে খাড়া করেছ।

হয়তো এই ধরনের চিঠি পেয়ে তুমি একটু বিব্রত হয়েছ, হয়তো মনে মনে একটু দুঃখও পেয়েছ যে পৃথিবীর কেউ রক্ত-মাংসে গড়া তোমার সত্যসুন্দরদা-র অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু আমার ভাই ভালই লেগেছে। তুমি জানতে চেয়েছ যারা আমার আফ্রিকার ঠিকানা চায়, তাদের দেবে কিনা। তুমি ছাড়া কাউকে ঠিকানা দেবার ইচ্ছে যে আমার নেই, তা তুমি তো ভাই ভালভালেই জান। দেশের মাটির মায়া থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে যখন প্রাণপণে চেষ্টা করছি, তখন চিঠিপত্রের সংযোগও হয়তো আমাকে দুর্বল করে তুলবে।

তবে যা বলছিলাম, তোমার রাগ করবার বা দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই। আমার নিজেরই সন্দেহ হয় কোনোদিন আমি কলকাতায় ছিলাম কিনা; কোনোদিন সেখানকার বিলাসবহুল শাজাহান হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে কাজ করতে করতে গোবেচারা, হোটেল অনভিজ্ঞ, শংকর নামে এক ছোকরাকে প্রথম দেখেছিলাম। তারপর এবং তারও আগে বার বার নগর সভ্যতার এক কদর্য নগ্নরূপ প্রতিদিন ও প্রতিরাত্রে নানাভাবে দেখেছি। আবার কদর্যই বা বলি কেন? ভালও তো দেখেছি কত। ক্যাবারে নর্তকী কনির সঙ্গে, ল্যামব্রেটার দুঃখিনী ছোট বোন কনিকেও তো দেখেছি। হোস্টেস করবী গুহর সঙ্গে এক বিষণ্ণ পূজারিণী করবীকেও তো দেখেছি! মনে আছে তুমি একবার তোমার হাইকোর্টের সায়েব—যাঁর কাহিনী 'কত অজানারে' বইতে লিপিবদ্ধ করেছ—সম্বন্ধে একটা কথা বলেছিলে। তিনি তোমাকে বলেছিলেন, 'মাই ডিয়ার বয়, ইট টেক্‌স্ অল সর্টস্ অভ্ পিপ্‌ল টু মেক এ ওয়ার্ল্ড'। মাই ডিয়ার বয়, অনেক রকম লোক নিয়ে একটা পৃথিবী হয়।' তা সত্যি আমাদের শাজাহান হোটেলের কথাই ভাবো না। ভালো এবং মন্দ, সু এবং কু, কেমন

অবলীলাক্রমে সহ-অবস্থান করছে। না হলে একই শাজাহান হোটেলের ছাদের তলায় কেমন করে ফোকলা চ্যাটার্জি, জিমি, প্রভাতচন্দ্র গোমেজ এবং ন্যাটাহারিবাবুর মতো ভিন্ন প্রকৃতির মানুষরা পাশাপাশি বাস করেন?

আজ রাত্রে আমার কিছুতেই ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না। তোমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করে কিছুটা পায়চারী করলাম। এই অন্ধকার মহাদেশের গহনতম অন্ধকারেও আমার জন্য একটুকরো ঘুমের সন্ধান পেলাম না। ভাবছি এবার থেকে পুরোপুরি নাইট ডিউটি নেব। তাহলে আর যাই হোক রাত্রির ভয় থেকে বাঁচব। কি আশ্চর্য জিনিষ এই ঘুম। যিনি মানুষকে ঘুমের আশীর্বাদ দিয়েছিলেন তাঁকে নমস্কার। মানুষের সকল সত্তাকে কে যেন ঘুমের পাতলা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়। এ এক আশ্চর্য আশীর্বাদ --ঘুম ক্ষুধার্তের খাবার, তৃষ্ণার্তের জল, গরমের বরফ, শীতের গরম জল। স্লিপ দি গ্রেট লেভেলার বলতে পার। এঁর করুণা কটাক্ষে বোকা এবং চালাক এক হয়ে যায়, এমন কি হোটেলের চাকর পরবাসীয়া এবং ম্যানেজার মার্কোর মধ্যেও কিছুক্ষণের জন্যে কোনো তফাৎ থাকে না।

এইমাত্র আমি ঘুমের জন্য কত সাধ্যসাধনা করছি, অথচ একদিন নাক ডাকিয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবার জন্যে তোমার সুজাতাদি আমার সঙ্গে রসিকতা করেছেন। আমি বলেছিলাম, কোন্ দেশে যেন স্বামীর নাক ডাকার জন্য বৌ ডাইভোর্স আদায় করেছিল। তোমার সুজাতাদি বলেছিলেন, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আগে বিয়েটা হোক, তারপর তো ডাইভোর্সের কথা ভাববো। কতরকমের খবরই তো তুমি রাখো। কোন্ দেশে যে খারাপ রান্নার অজুহাতে স্বামীরা বৌকে তালাক দিতেন; ফ্রান্সের কোথায় কোথায় স্বামীকে সেদ্ধ, ভাজা বা ভাপা মাছ সস্ ছাড়া পরিবেশন করলে স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনা যায়, এ সব তোমার মুখস্থ। ইচ্ছে করলে ঠিক সময়ে নজিরগুলো কাজে লাগিও।'

আমি হেসে ফেলেছিলাম। বিয়ের দিনটা তখন ঠিক করবার জন্যে লোভ হচ্ছিল। সুজাতাকে বলেছিলাম, "আমি কিছু করতে গেলেই জজ বকুনি দিয়ে মামলা ডিসমিস্ করে দেবেন। বলবেন, 'ন্যাকামোর জায়গা পাওনি? যে হাওয়াই হোস্টেস দেশ-বিদেশের জাঁদরেল সায়েবদের খাইয়ে এবং সেবাযত্ন করে খুশি রেখেছে, সে কিনা তোমার মতো হরিদাস

পালকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না।' কেস তো ডিসমিস হবেই। সঙ্গে খরচের ডিক্রি চাপবে। আমার তো টাকা নেই। সুতরাং হাজতবাস বাঁচাবার জন্যে তোমাকেই তখন আবার টাকা দিতে হবে।"

এসব তো কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু আজ রাত্রে আবার সব মনে পড়ছে। আর কেন জানি না নিজের খেয়ালেই তোমাকে লিখে চলেছি। তুমি কাছে থাকলে, তোমাকে মুখে বলতাম, তাতেই কিছুক্ষণের জন্যে সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনে ফিরে যাওয়া যেত—মহাভারতে যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর জীবিত এবং মৃতদের মধ্যে একবার পুনর্মিলন হয়েছিল।

আজ রাত্রে সত্যিই আমার ঘুম আসবে না। কিন্তু তোমাকে চিঠি লিখতে খুব ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে যেন তুমি আমারই সামনে বসে আছো। আমি নিজেরই মনে কথা বলে চলেছি, আর তুমি তোমার স্বভাবমতো কোনো প্রশ্ন না করে নীরবে তোমার সত্যসুন্দরদার কথা শুনে যাচ্ছো।

তোমার বইটা পড়তে পড়তে কত রকমের কথা মনে পড়ছিল আরও কী কী লেখা যেতো, বাংলাদেশের পাঠকদের কি কি জানানো যেতো ভাবছিলাম। একবার কলকাতার কোনো এক কাগজের রিপোর্টার ভদ্রলোক আমাকে একটা মজার প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী কী কারণে লোকে হোটেলে আসে বলতে পারেন?'

আমি বলেছিলাম, "বেশীর ভাগই অফিস বা ব্যবসার কারণে ঘরছাড়া হয়ে বিদেশে হোটেলে ওঠেন। আবার একটা বড় অংশ হচ্ছে ট্যুরিস্ট। ফরেন এক্সচেঞ্জ পাওয়া যায় বলে ভারতবর্ষে যাঁদের আমরা জামাই আদরে রাখি। যাঁদের সেভেন মার্ডারস পার্ডন্‌ড্‌ যাঁদের আদর আপ্যায়নের তদ্বিরের জন্য গভরমেন্টের ইয়া জাঁদরেল অফিসাররা পর্যন্ত গলদঘর্ম হচ্ছেন। সরকারী ভাষায়, এঁদের প্রত্যেকটি খরচ হলো আমাদের অদৃশ্য রপ্তানি—ইন্‌ভিজিব্‌ল্‌ এক্সপোর্ট। সে গল্প নিশ্চয় জানো তো, যেটা আমরা শাজাহানে প্রায়ই বলতাম। লালু বলে পকেটমার আমাদের হোটেলের সামনে এক মার্কিন সায়েবের পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। পুলিস তো তাকে চালান করলে। কিন্তু লালুর উকিল ধুরন্ধর। তিনি বললেন, 'ধর্মাবতার, সবই বুঝলাম। কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট যে ইণ্ডিয়ার জন্যে

বৈদেশিক মুদ্রা রোজগারের চেষ্টা করেছিল এটা যেন আপনায় দৃষ্টি না এড়িয়ে যায়।' পাবলিক প্রসিকিউটরের চক্ষু চড়কগাছ। সালুমিয়াকে সসম্মানে খালাস দেওয়া হলো।

ট্যুরিস্টদের পরে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন ডেলিগেট। কনফারেন্স, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান, শুভেচ্ছা বিনিময় ইত্যাদি কাজের জন্য এঁরা আসেন। এঁদের মানি ব্যাগের স্বাস্থ্য বেশ ডেলিকেট, কিন্তু দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে আসেন বলে হোটেলের পুষিয়ে যায়। এমন কি অনেক সময় সিঙ্গল বেডেড রুমে দুজন কিংবা তিনজনকে ঢুকিয়ে দিলেও এঁরা তেমন রাগ করেন না।

স্বাস্থ্য সন্ধানে অনেকে হোটেলে আসেন। আমাদের সাধারণ পরিবারের লোকেরা হোটেল বলতে পুরী কিংবা বারাণসীর এই ধরনের হোটেলের দৃশ্য ভেবে নেন। বড় শহরের বড় হোটেলে স্বাস্থ্যান্বেষী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে চিত্র জগতের উজ্জ্বল তারকা শ্রীলেখাদেবীর আকস্মিক হোটেলে আবির্ভাবের কথা তুমিতো চৌরঙ্গীতে লিখেছ। কিংবা গোপন অভিসারে, কলকাতার বাড়ি ছেড়ে রাত্রের অন্ধকারে যে-সব পুরুষ বা মহিলা আসতেন তাঁদের কথাও তুমি উল্লেখ করেছ।

কিন্তু সাধুচরণ পালের কথা তোমার লেখা উচিত ছিল। না, বোধহয় ভুল করেছি। সাধুচরণ পাল যখন সস্ত্রীক আমাদের হোটেলে হাজির হলেন তখনও তুমি চাকরি আরম্ভ করোনি।

সাধুচরণের হোটেলে আসবার কারণটা ভাবলে আজও আমার হাসি লাগে। সাধুচরণবাবুর একটা বর্ণনা দিই। হোঁদলকুৎকুৎ বলে একটা বাংলা কথা আছে, সেটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে যে ছবিটা ভেসে ওঠে তাকে সাধুচরণ বলতে পার। উচ্চতা ধর পাঁচ ফুট দুই, রঙ কালো বলব না।—অযত্নে লালিত দুবছরের পুরনো ডার্ক ট্যান জুতোর রঙ কল্পনা করে নাও। বয়স চুয়াল্লিশ থেকে চুয়ান্ন সব হতে পারে। শাদা পাঞ্জাবী এবং মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেন। মুখটা অনেকটা থালার মতো, পান খেয়ে ঠোঁট সর্বদা লাল করে রেখেছেন। পানের জাবরকাটা কখনও বন্ধ হয় না।

সাধুচরণের পিছনে উগ্র সবুজ রঙের সিল্কের শাড়িতে আপাদমস্তক

জড়ানো একটি মূর্তি। ঘোমটায় মুখ ঢাকা, কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু শাড়িতে ঢাকা বলে আন্দাজ করছি ভিতরে কোনো মহিলা আছেন।

সাধুচরণ বললেন, 'আমি মিস্টার পাল। একটু আগে ফোন করেছিলাম।'

কিছুক্ষণ আগে একটা অদ্ভুত ফোন এসেছিল। 'স্বামী স্ত্রীর জন্যে একটা ডবল রুম পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!'

'আমাদের কিন্তু কোনো লগেজ বা বেডিং নেই।'

আমি বলেছিলাম, 'তাতে হোটেলের কী এসে যায়?'

তার কিছুক্ষণ পরেই মিস্টার সাধুচরণ পাল এসে হাজির। তিনি তখনও পান চিবোচ্ছিলেন। বললেন, 'ট্যাকা পয়সার জন্যে কেয়ার করবেন না। বেস্ট ঘর দেবেন, দক্ষিণ খোলা হয় যেন।'

বললাম, 'আমাদের এয়ার-কণ্ডিশন হোটেল—কোনো দিকই তো খোলা পাবেন না।'

হতাশ মিস্টার পাল বললেন, 'তবে যা ভালো-হয় করুন।'

আমি বললাম, 'কোনো অসুবিধে হবে না।'

সাধুচরণবাবু ডিবে থেকে একটা পান বার করে মুখে পুরে বললেন, 'বলেন কী মশাই, অসুবিধে হবে না মানে। দেখছেন কোনো বেডিং আনিনি। আমাদের কী আর তক্তপোষে শোওয়া অভ্যেস মশাই!'

আমি একটু ভড়কে গেলাম। কোনোরকমে সামলে নিয়ে বললাম, 'আমাদের প্রত্যেক ঘরে খুব ভাল বিছানা পাবেন। ফোম রবারের গদি। তার তলায় স্প্রিং আছে।'

মিস্টার পাল বললেন, 'জানি নে বাপু! আমরা মশাই অবস্থাপন্ন গেরস্ত ঘরের ছেলে, সাত জন্মে হোটেলের অন্ন খাইনি।'

আমি মিস্টার পালের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি নিজের মনেই বললেন, 'তবু ভাল, আপনারা লগেজ দেখতে চান না। আরে মশায়, বলুন তো লগেজই যদি নেব তাহলে হোটেলে আসবে কেন?'

ভদ্রলোককে এবার ভিজিটরস বুকে সই করতে বললাম। বাড়ির ঠিকানার ঘরে গিয়েই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একটু রেগে উঠে বললেন,

'একি অন্যায় কথা মশাই! থাকতে এসেছি হোটেলে, ট্যাকা ফেলব থাকব। আমার হাঁড়ির খবরে আপনাদের কী দরকার?'

বললাম, 'আমাদের কোনো হাত নেই। পুলিস এগুলো চাইতে পারে।'

'ভদ্রলোক এবার ছিটকে সরে গেলেন। এ্যাঁ, একটা কোশ্চেন আস্ক করেচি বলে ভরসন্ধেবেলায় আপনি আমাকে পুলিসের ভয় দেখালেন? বেশ লোক তো আপনি। এইভাবে ব্যবসা করেন আপনারা? আমাদেরও স্যর একটু আধটু ব্যবসা আছে। খদ্দের সাতচড় মারলেও আমরা রা কাটি না।'

বেজায় বিপদে পড়া গেল। ভদ্রলোক যেভাবে চিৎকার করছেন তাতে লোকে ভাববে, বোধহয় তাঁকে আমি অপমান করেছি। ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি অযথা রাগ করছেন। হোটেলে কত রকমের লোক আসে জানেনই তো।'

'তার মানে আপনারা চোর ছ্যাঁচড়দেরও ভাড়া দেন? দেখবেন মশায়। যে ঘর দিচ্ছেন, তার খিল-টিলগুলো ঠিক আছে তো?'

আমাকে এবার বলতে হলো, 'আজ্ঞে, আমাদের কোনো ঘরে খিল থাকে না।'

'মানে, আপনারা চোর ডাকাতকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনেন! বলেন, ঘরে খিল দেওয়া নেই, সব মেরে নাওগে।'

বললাম, 'আজ্ঞে, আমাদের ল্যাচ দেওয়া আছে। একটা চাবিও দেওয়া হবে! ভিতর থেকে চাবি দিয়ে শুয়ে পড়বেন।'

ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হলেন না। 'এই চাবির যে নকল নেই, তার গ্যারান্টি কোথায়?'

'একটা ডুপ্লিকেট আছে, আমাদের আছে।'

'তাহলে তো মশায় খুব হলো। চাকর-বাকর তো এখানে গিজ গিজ করছে। জানেন, আজকালকার সার্ভেন্টদের প্রিন্স-অফ ওয়েলস বলে কোনো জিনিস নেই। সাড়ে-ছ আনা পয়সার জন্যেও তারা মার্ডার করতে পারে!'

বললাম, 'আমাদের হোটেলের একশ বছরের হিস্ট্রীতে তেমন কোনো অঘটন ঘটেনি।'

ভদ্রলোক একটু আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'ঠিকানাটা কি দিতেই হবে মশায়? চেনা বাউনের তো পৈতেই লাগে না, তার আবার ঠিকানা।

আমি মশায় যা-তা ফিগার নই। নামকরা বিজিনেসম্যান। অয়েল-কেক ডিলার্স এসোশিয়েসনের সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট। খোল ওআর্লডের কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন আমার থেকে তিসি এবং সরসের খোলের বড় ডিলার বেঙ্গলে নেই বললেই চলে।'

ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বললাম, 'তাই বোধহয় আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

'মনে হবেই তো, কাগজে খোল সমিতির একজিকিউটিভ কমিটির যে গ্রুপ ফটো বেরিয়েছিল, তাতে আমি ছিলাম। এখন তো কেবল বাংলা কাগজে ছাব বেরোচ্ছে, ইংরিজি কাগজের কেউ তেমন নজর দিচ্ছে না। কিন্তু দাঁড়ান, সামনের বারে যদি চণ্ডীমায়ের কৃপায় প্রেসিডেন্ট দাঁড়াতে পারি, তখন সব কাগজের এডিটোরিয়ালরা ঘোরাঘুরি করবে।'

বললাম, 'তাহলে আর দ্বিধা করবেন না, ঠিকানাটা লিখে ফেলুন।'

ভদ্রলোক এবার চারিদিকে সতর্কভাবে দেখে নিলেন। আমার কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, 'যখন না লিখলে ছাড়বেন না, তখন লিখছি। কিন্তু একটা কণ্ডিশন আছে। আমি যে এখানে আছি কাউকে বলবেন না। কোথাও যেন আমার নাম টাঙানো না থাকে।'

'যদি কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে?'

'সটান বলে দেবেন সাধুচরণ পালকে আপনি জীবনে দেখেন নি। বড় ক্রুসিক্যাল টাইম মশায়।'

রাজী হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক এবার যে কলকাতারই কোনো ঠিকানা লিখবেন, আশা করিনি। ভেবেছিলাম, বর্ধমান বা আসানসোল থেকে আসছেন অন্তত। কিন্তু কলকাতার বাড়ি ছেড়ে তাঁর মতো লোক হঠাৎ যে এখানে কেন হাজির হলেন বুঝতে পারলাম না।

মিস্টার পালের পিছনে ঘোমটায় ঢাকা নারীমূর্তিও লিফ্‌টে উপরে চলে গেছেন। ঘোমটার আড়ালে কে আছেন, তাঁর বয়স কত, কী নাম কিছুই বোঝা গেল না। শুধু সাধুচরণ হোটেলের খাতায় পরিচয় লিখলেন মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস এস সি পাল।

শ্রীযুক্ত পালের এই গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা আমার কাছে যে তেমন সুবিধাজনক মনে হয়নি এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ-সব নিয়ে বেশী

মাথা ঘামানো উচিত নয় ভেবেই অন্য কাজে মন দিয়েছিলাম। কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যে ফোন বেজে উঠল। উপর থেকে গুড়বেড়িয়া বলছে, 'বাবু, আপনি এইমাত্র যাঁকে পাঠিয়েছেন দুশো নম্বর ঘরে, তাঁদের নিয়ে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে।' গুড়বেড়িয়া তখনও অতিথিদের কাছ থেকে কর্মচারীদের সেবার জন্যে ছাদে বদলী হয়নি।

আমি তাকে বকুনি দিলাম। 'কাউন্টার ছেড়ে যাবো বললেই যাওয়া যায় না।'

কিন্তু মিস্টার পাল এবার নিজেই ফোন ধরলেন, 'আপনাদের হোটেলের এত নাম, কিন্তু এইভাবে আমাদের ডোবাবেন তা কখনও আশা করিনি।' তারপর নিজস্ব ব্র্যাণ্ডের ইংরেজীতে বললেন, 'আপনাকে উপরে আসতেই হবে। প্রবলেম যখন হয়েছে, তখন উই মাস্ট কাম টু এ সলভ।' এ যে কী ধরনের ইংরেজী তা ভগবানই জানেন। কিন্তু ভদ্রলোক অবলীলাক্রমে তা বলে যান। সাধে কী ইংরেজরা আমাদের দেশ ছেড়ে পালাবার পথ পেলে না।

বাধ্য হয়েই উপরে যেতে হলো। সাধুচরণ উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'জানি মশাই, আমরা অয়েল-কেক ট্রেডেও বলি, বিজনেস নোজ নো ফাদার। কিন্তু মশায় বাপের বয়সী লোককে এমন ঘর দিলেন কী করে? আমি তো রেট নিয়ে দরদস্তুর করিনি। ঠিক দেখে দেখে পায়খানার সঙ্গে লাগোয়া। ঘরের মধ্যে পায়খানা মশায়!'

আমি হাসব কি কাঁদব ভেবে পাচ্ছিলাম না। বললাম, 'একে বলে অ্যাটাচ্‌ড বাথ বা অ্যাটাচ্‌ড ডবলু সি।

'ও-সব অন্য লোককে বোঝাবেন। আমরা চিরকাল জানি পায়খানার লাগোয়া ঘর অর্ধেক ভাড়াতেও কেউ নিতে চায় না।'

আমি বললাম, 'আমাদের সব ঘরের লাগোয়া বাথরুম আছে। ইউরোপীয়ান স্টাইলের হোটেলের এইটাই বৈশিষ্ট্য।'

সাধুচরণ বললেন, 'আপনাদের ধর্ম্মে যদি সয়, এই ঘরেই থাকব। এখন চুপচাপ থাকছি। তবে জেনে রাখবেন এটা লুক বিফোর স্টর্ম। হঠাৎ যখন ঝড় আসবে তখন সামলে রাখতে পারবেন না।'

ডিনারের সময় আবার গণ্ডগোল। ভদ্রলোক টেলিফোনে বললেন, 'এ

কি অনাসৃষ্টি কথা মশায় যে, আমার ওয়াইফকে নিয়ে বাজারের মধ্যে খেতে হবে।'

বললাম, 'দেওয়ালে যে নিয়মাবলী টাঙানো আছে তাতেই লেখা আছে সবাইকে ডাইনিং হলে খেতে হবে। বেড-টি ছাড়া কিছুই রুমে সার্ভ করা হয় না।'

'এটা তো গায়ের জোরের কথা হল মশাই। আমি আর আমার ওয়াইফ যদি আলাদা খেতে ভালবাসি? ওখানে মশাই হাজার জাতের লোক যত অখাদ্য কুখাদ্য গিলছে, তা যদি আমাদের সহ্য না হয়?' ভদ্রলোক টেলিফোনে এমনভাবে চিৎকার করলেন যে কানের পর্দা ফেটে যাবার দাখিল।

বললাম, 'তাহলে ঘরেই খাবার দেওয়া হবে, কিন্তু দশ টাকা রুম সার্ভিস চার্জ লাগবে।'

'এ যে দেখছি শাঁখের করাত। এগোতেও কাটে, পিছোতেও কাটে। নিজের ঘরে বসে শান্তিতে দুটো খাবার জন্যেও চার্জ! আগে জানলে খোলের কারবারে টাকা না খাটিয়ে একটা হোটেল খুলতাম।'

রাত্রে আমার ডিউটি ছিল। সাধুচরণ তখনও শান্তি দিলেন না। টেলিফোনে বললেন, 'পান ফুরিয়ে গিয়েছে। একটা বেয়ারা দিয়ে দুটো পান পাঠিয়ে দিন না।'

ক্ষমা প্রার্থনা করতে হলো। আমরা পান রাখি না। সাধুচরণ রেগে বললেন, 'তা কেন রাখবেন? ওতে যে লোকের উপকার হয়। অথচ আপনারা বলে বেড়ান একটা ছাদের তলায় দুনিয়ার সবরকম সুখ জড়ো করে রেখেছেন।'

আমি হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। দেশী হোটেলে না গিয়ে উনি কেন যে এখানে এলেন। কিন্তু আমার দুর্গতির তখন সবে শুরু। একটু পরে ফোন করে বললেন, 'পান-টান তো রাখেন না। দাম তো নিচ্ছেন গলায় গামছা দিয়ে, কিন্তু আমসত্বের মতো পাতলা বালিশ দিয়েছেন।'

'আজ্ঞে, সায়েবরা এই ধরনের বালিশেই শুতে ভালবাসেন।'

'চুলোয় যাক আপনার সায়েবরা, ব্যাটারা বিছানার বোঝে কি?'

বেয়ারারা তখন ছিল না। তাই নিজেই বালিশের ইনচার্জ ন্যাটাহারিবাবুর কাছে গেলাম। ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ডেকে তুলতে হলো। ফিক

করে হেসে ন্যাটাহারিবাবু বললেন, 'এত রাত্রে এক্সট্রা বালিশ নিচ্ছেন ! এত রাত্রে ঘরে কাকে আনলেন ? আগে থেকে ব্যবস্থা ছিল না বুঝি ?'

বললাম, 'আমার নাইট ডিউটি, ঘরেও এমন কাউকে আনিনি যে বালিশ লাগবে। নতুন বোর্ডার চাইছে।'

ন্যাটাহারিবাবু বললেন, 'বুঝেছি। নিশ্চয়ই বেটা আব্দুলের কীর্তি। ব্যাকডোর দিয়ে বেড কম্প্যানিয়ন নিয়ে এসে যত সিঙ্গেল রুমে ঢুকিয়ে দেয়। হোটেলের লস আমার খাটুনি। মাথা নিচু হচ্ছে বলে কমপ্লেন করে, এক্সট্রা বালিশ চেয়ে নেয়। অতই যখন সখ তখন ডবল রুম নাও না বাপু—একজোড়া মানুষের জন্যে দুজোড়া বালিশ পাবে।' আমার হাতে দুটো বলিশ দিয়ে ভদ্রলোক এবার দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বেয়ারার হাতে বালিশ দুটো পাঠিয়ে দিলাম। দেখা হলেই তো সাধুচরণ পাল আবার কিছু হুকুম করে বসবেন। কিন্তু কপাল মন্দ, আমার স্বস্তি মিলল না। একটু পরেই তিনি ফোন করে বললেন, 'পাশ-বালিশ কোথায় মশায় ?'

আমি বললাম, 'স্যরি, পৃথিবীর কোনো প্রথম শ্রেণীর হোটেলে পাশ-বালিশ থাকে না।' আমি নিজেই এবার ফোনটা নামিয়ে দিলাম।

সাধুচরণ পাল আমার জীবন-আকাশে রাহুর মতো আবির্ভূত হয়েছেন। একটু পরেই ভদ্রলোক নিচে নেমে এলেন। জামা খুলে রেখে শুধু গেঞ্জি এবং ধুতি পরে এসেছেন। ভাগ্যে ক্যাবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল, কাউন্টারেও কেউ ছিল না। না হলে ঐ বেশে দেখলে কী যে হতো !

সাধুচরণ বললেন, 'আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাই।'

'বলুন।'

'আপনাদের ঘরের মেঝেতে ইঁদুর বা বিছে-টিছে কিছু ঘোরাঘুরি করে না তো?'

'আপনারা শোবেন তো খাটে।'

'ঘরের দরজা বন্ধ করে আমরা কী করব তাও কী আপনাদের জানাতে হবে ন কি ? যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দিন।'

বললাম, 'ইঁদুর বা বিছের কোনো ভয় এখানে নেই।'

ভদ্রলোক এবার শান্ত হলেন। তারপর আবার কাছে সরে এসে বললেন, 'আমার খোঁজ করেছে নাকি কেউ ?'

কেউ করেনি শুনে একটু আশ্বস্ত হলেন। 'মনে থাকে যেন, কাউকে ঘুণাক্ষরে কিছু প্রকাশ করবেন না।'

রাত্রে কোনো কাজ ছিল না। বসে বসে ভাবছিলাম ব্যাপার কী ? এঁদের মতো লোক হঠাৎ এমন জায়গায় এসে উঠলেন কেন ? লাগেজের কথাটাও হোটেলে পা দিয়েই বা তুললেন কেন ? তবে কি ? ঘোমটার আড়ালে ভদ্রমহিলাটিকে বোধহয় খাতায় সই করিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। না না, তা তো করার সাধারণভাবে নিয়ম নেই। উনি নিশ্চয়ই মিসেস পাল—হোটেলে কাজ করে করে মনটা আমাদের নোংরা হয়ে গিয়েছে। আর তাছাড়া উনি যখন স্ত্রী বলে ডিক্লারেশন দিয়েছেন, তখন আমার কোনো দায়িত্ব নেই। উনি যা বলেছেন তা আমি অবিশ্বাস করতে যাবো কেন ?

পরের দিন ভোরবেলাতে হোটেলের সবাইয়ের তখনও ঘুম ভাঙে নি। শুধু ঘরে ঘরে বেড-টি দেওয়া শুরু হয়েছে। আমি অন্য রিসেপশনিস্ট উইলিয়ম ঘোষকে চার্জ দিয়ে উপরে শুতে যাচ্ছিলাম, পথে গুড়বেড়িয়ার সঙ্গে দেখা। গুড়বেড়িয়া বললে, 'কাল কী যে গেস্ট এসেছে !'

বললাম, 'কেন ?'

গুড়বেড়িয়া বললে, 'আজ সকালে বেড-টি দিতে গিয়ে দেখি···না বাবু আর বলতে পারব না।'

'বল না।' ভাবলাম, হয়তো সকালবেলায় কোনো অস্বস্তিকর দৃশ্য দেখেছে। বেড-টি দিতে দিতে বেয়ারারা অনেক কিছু দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বকুনি দিয়ে বললাম, 'তোদেরও দোষ আছে। একবার নক করেই তোরা দড়াম করে ঘরে ঢুকে পড়িস। গেস্টদের একটুও রেডি হয়ে নেবার সময় দিস না।'

গুড়বেড়িয়া মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'কী যে বলেন। অন্য বেয়ারারা করতে পারে, গুড়বেড়িয়ার তেমন স্বভাব নয়। দরজায় টোকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সায়েব যখন আসতে বললে তখন ঢুকলুম। গিয়ে দেখি মেমসায়েব বিছানায় নেই। মেঝেতে শুয়ে আছেন।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তোর বাজে বাজে কথা শোনবার সময় নেই আমার, কাজ করগে যা।'

গুড়বেড়িয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পেলেও বালিশবাবু স্যাটাহারির কাছ থেকে রেহাই নেই। একটু পরেই তিনি ঘরে এসে হাজির। বললেন, 'সবেতেই তো আমাদের দোষ দেখেন স্যর। আমরাই যেন কেবল চোর দায়ে ধরা পড়ে গিয়েছি। দুনিয়ার যত সায়েব এই শাজাহানে রাত কাটিয়ে গিয়েছে, তারা নিত্যহরির সার্ভিসের প্রশংসা করেছে। কাল তো স্যর ধমক দিয়ে রাত্রে একষ্ট্রা বালিশ নিয়ে গেলেন! কিন্তু বালিশ তো ছার, যিনি বালিশে মাথা দেবেন, তিনি মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন। অনেক রকম দৃশ্য এই শাজাহান হোটেলে চাকরি করতে এসে দেখেছি কিন্তু বিছানা ছেড়ে এমন মেঝেতে গড়াগড়ি যাওয়া কখনও শুনিনি, দেখিও নি।'

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে স্যাটাহারিবাবুর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, 'আগাগোড়া ব্যাপারটাই যেন কেমন কেমন। না হলে এমন টাইপের লোক মশাই শাজাহান হোটেলে আসে শুনিনি। এদের জন্যে তো মশাই শেয়ালদা, হ্যারিসন রোড, মির্জাপুর স্ট্রিটে অনেক হোটেল আর লজ্ আছে।'

বললাম, 'টাকা আছে এঁদের, কেন বড় হোটেলে আসবেন না?'

'টাকা থাকলেই কী আর আসা যায় স্যর? বড়বাজারের যে-কোনো গদীওয়ালা মাড়ওয়ারি তো গুষ্টিসুদ্ধ সারাজন্ম আপনার হোটেলে থাকতে পারে; তবু তারা কেন আসে না? কেন তারা ধর্মশালায় পড়ে থাকে?'

বললাম, 'আমি কিছু বুঝি না। দুশো নম্বর রুমের গেস্ট আবার কোনো ফ্যাসাদে না ফেলে। কেননা, হোম অ্যাড্রেস তো কলকাতারই রয়েছে।'

স্যাটাহারিবাবু বললেন, 'বেয়ারারা তো এখনই কানাঘুষো করছে। নিজের কানেই শুনে এলাম। বলছে, কিছু গোলমাল আছে। যে মা-লক্ষ্মীটি মেঝেতে শুয়েছিলেন, তিনি যে কে ভগবান জানেন।'

আমি বললাম, 'আর ভাল লাগে না।'

স্যাটাহারিবাবুকে বিদায় করে, কিছুক্ষণের জন্যে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

ধড়মড় করে উঠে, দরজা খুলে দেখি সাধুচরণ পাল। ভদ্রলোক বেশ

উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। রাগে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন। বললেন, 'অনেক কষ্টে খুঁজে পেয়েছি আপনাকে।'

বললাম, 'আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে কাউন্টারে যিনি আছেন তাঁকে বললেন না কেন?'

না, মশাই, আমি আপনাকেই চিনি। আপনিই আমার দোকানদার। এ দেখছি এক অদ্ভুত জায়গা! আগে জানলে কোন ব্যাটাচ্ছেলে নিজের বাড়ি ছেড়ে এখানে আসতো!'

'কেন কী হলো?' আমি লজ্জা পেয়ে বললাম।

ভদ্রলোক বললেন, 'এখন হয়েছে কি? আমি রসাতল করে ছাড়ব। এতক্ষণ খুনোখুনি করেও ছাড়তাম। নেহাত আমার ওয়াইফের কথা ভেবে কিছু করিনি। সেবার আমার এক চাকরকে এমন একটি চড় মেরেছিলুম যে হেভি বিল্ডিং হতে লাগল। গল গল করে বিল্ডিং হচ্ছে, শেষে ডাক্তার ডাকতে হলো।'

প্রশ্ন করলাম, 'কী হয়েছে বলুন?'

'আরে মশায় আমার একটু গঙ্গা জলের দরকার ছিল। তা এমন হোটেল মশায়, আপনারা গঙ্গা জলও একটু রাখেন না! শেষে এক ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের বালিশবাবু ঘরে জল রাখেন। তা তাঁর কাছে যাচ্ছিলুম। যেতে যেতে নিজের কানে শুনলাম, আপনাদের বেয়ারারা বলাবলি করছে, 'দুশো নম্বর ঘরের বাবু আর জেনানার মধ্যে সম্পর্ক ভাল নয়। জেনানা মেঝেতে শোয়। এই করতে করতে হয়তো কোর্ট থেকে ডায়াবিটিস হয়ে যাবে। আজ্ঞে, আস্পর্ধাটা বুঝুন একবার! আমার ত্রিশ বছরের ম্যারেড্ হিন্দু ওয়াইফ কিনা ডায়াবিটিস করবে!'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে কী বলছেন?'

'জেনে শুনে আর ন্যাকা সাজবেন না। হোটেলে কাজ করছেন, আর ডায়াবিটিস বোঝেন না! কত গণ্ডা গণ্ডা লোককে বিয়ে বিচ্ছেদ করতে দেখছেন আপনারা।'

'আজ্ঞে, ডাইভোর্স বলছেন আপনি?'

'যান যান মশাই, আমাকে আর ইংরেজী শেখাতে আসবেন না।

কোনো লগেজ ছিল না তাই। থাকলে কোন্ শর্মা এখানে আসত। দাঁড়ান, তবুও মজা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ভদ্রলোক এবার যে কিছু একটা না করে ছাড়বেন না তাঁর হাবভাব দেখেই বুঝলাম। তাঁকে শান্ত করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে ভদ্রলোক হন হন করে বেরিয়ে গেলেন।

বুঝলাম, ব্যাপারটা ক্রমশ পাকিয়ে উঠছে। আমাদের মতো বিরাট হোটেলের পক্ষে হয়তো হাসির ব্যাপার। কিন্তু আর নিষ্ক্রিয় থাকাটাও নিরাপদ নয়। মার্কোপোলো শুনলে আমাকেই দোষ দেবেন—বলবেন, সব জেনে শুনেও কেন আমি হাত গুটিয়ে বসেছিলাম।

ডিউটি-আওয়ার্সের বাইরে একটু যে নিশ্চিন্তে ঘুমবো তারও উপায় নেই। তাছাড়া ভদ্রলোক বাঙালী, দেখা উচিত আমার। বুশশার্টটা গলিয়ে, তাঁকে শান্ত করবার জন্যে দুশো নম্বর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

দরজায় টোকা দিতে ঘর খুললেন ভদ্রমহিলা। ইনিই তাহলে সেই রহস্যময়ী, যাঁর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অবস্থিতি আমাদের অস্বস্তির কারণ হচ্ছিল। যাঁর সম্বন্ধে কল্পনা করে আমরা সাধুচরণবাবুর শাজাহান হোটেলে উপস্থিতির কারণ অনুমান করতে চেষ্টা করছিলাম। মধ্যবয়সী মহিলা। একেবারেই গোবেচারা। কিন্তু সারারাত কেঁদে কেঁদে বোধ হয় চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিলেন। সাধুচরণের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুরুষের রাজত্বে তিনি যে নিতান্ত অসহায় তা মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

সাধুচরণবাবু নেই। বললাম, 'তিনি কোথায়?'

বললেন, 'এখনই আসছেন। কী যে হয়েছে, ক'দিন থেকেই রেগে আছেন। আজ আবার আরও চটেছেন। চটলে তো ওঁর মাথার ঠিক থাকে না।'

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, 'আর বাপু তোমাদেরও বলিহারি যাই। রোজ তো এক আঁচলা করে ট্যাকা নিচ্ছ, অথচ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড গা। এঁটো-কাঁটা বিচার নেই। আমি তো ঘেন্নায় মরি। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কারা বাপু এসব বিছানায় শোয়, সেই বিছানায় শুতে হবে শুনে আমার তো অন্নপেরাসনের ভাত উঠে আসবার দাখিল। আমি বললুম, মরে গেলেও ওই খাটে আমি শুতে পারব না। শেষে নিজের আঁচল পেতে মেঝেতে শুলুম। ওঁর অতো

বাছ-বিচার নেই, উনি খাটেই শুলেন। ওঁকে তখন পই পই করে বললুম, ওই ভাবে এক বস্ত্রে বেরিয়ে এসো না। উনি শুনলেন না। ভয় দেখালেন, আমি সঙ্গে না গেলে আমাকে ডায়াবিটিস না কী করবেন।'

সেদিন ভদ্রমহিলার কাছে আরও যা শুনেছিলাম তা ভাবলে আজও আমার হাসি লাগে। কলকাতা শহরে সত্যি যে এমন ঘটে তা নিজে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

'আর বল কেন বাবা। সেই কোন্ কালে একবার এক বস্ত্রে রাগ করে শ্বশুরের সংসার থেকে উনি আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। তখন তো পকেটে ওঁর মাত্র-তিনটি ট্যাকা। সেই তিন ট্যাকা খাটিয়ে খাটিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খোলের ব্যবসা করে, ভগবানের দয়ায় বাড়ি গাড়ি সব করলেন। কিন্তু সহ্য হলো না, আবার সব ছাড়তে হলো!' ভদ্রমহিলা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সহানুভূতির সঙ্গে বললাম, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ সব গেল?'

'গেল না বাবা, ছেড়ে আসতে হলো। খোকার সঙ্গে ঝগড়া। দশটি নয়, পাঁচটি নয়, একটি ছেলে—তবুও সুখ হলো না।'

'কেন?'

'দেখো বাবা, ওঁকে যেন বোলো না। বাইরের লোককে বলছি শুনলে, আমাকে হয়তো খুনই করে ফেলবেন। উনি কোথায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এক মেয়ে দেখে এসেছেন। পছন্দ হয়েছে বলে ওখানেই কথা দিয়ে এসেছেন, কিন্তু আজকালকার ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে, তারা শুনবে কেন বাবা? মেয়ে যে কিছু পড়েনি। উনি বললেন, লেখাপড়া নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? মেয়ে সুলক্ষণা। উনি বলেছেন, কথা যখন দিয়েছি তখন এইখানেই বিয়ে হবে। ছেলে বলেছে, বিয়ে করবে না।'

'তারপর?'

ভদ্রমহিলা এবার কেঁদে ফেললেন, 'বললাম, সমর্থ রোজগেরে ছেলে, জোর করতে গেলে হয়তো গলায় দড়ি দিয়ে বসবে। সেই না শুনে আরও রেগে গেলেন। প্রথমে বললেন, বাড়ি থেকে দূর করে দেব। তাই শুনে আমি কান্নাকাটি করছিলুম। তখন কী ভেবে বললেন, না, নিজেই দূর হবো। আমি কত বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু শুনলেন না। বললেন, আগে

একবার খালি হাতে তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, আজ আর একবার বেরুবো। একদম গোপনে উধাও হয়ে যাব। কেউ জানতে পারবে না। উনি এম. এ পাশ মেমসাহেব বে করে ঘর-সংসার করুন। যাবে তো চলো, না হলে তোমাকেও ডায়াবিটিস করব।

'যা রাগী মানুষ, গোঁ চাপলে সব পারেন, বাবা। ভাই ভয়ে ভয়ে রাজী হলুম।'

'তা বললুম, লগেজ বাঁধি। উনি বললেন, না, ছেলে ধরে ফেলবে। দরওয়ানকেও নাকি ছেলে কী বলে গিয়েছে। তারপরই তো উনি লুকিয়ে দরজা বন্ধ করে কী সব ফোন করলেন; আর আমাকে নিয়ে খালি হাতে বেরিয়ে এলেন। জীবনে উনি বা আমি কখনও হোটেলে থাকিনি। আমরা তো জানি বাবা যত ছন্নছাড়া চোর জোচ্চোর মাতাল হোটেল শুঁড়ীখানায় এসে থাকে।'

আরও হয়তো শুনতাম। কিন্তু জুতোর খট খট আওয়াজে ভদ্রমহিলা চমকে কথা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলাম, কর্তা আসছেন।

কর্তাকে দেখলাম তখনও রাগে গজ গজ করছেন। তাঁর পিছনে কুলির মাথায় একটা বিরাট বেডিং, বাজার থেকে হোল্ড-অল সমেত এইমাত্র কিনে এনেছেন তা বোঝা গেল। সাধুচরণবাবু গৃহিণীকে বললেন, 'আর এক মিনিটও নয়। এখনই হতভাগা হোটেল ছাড়ব।' আমাকে বললেন, 'চলুন মশায়, এখনই এই মুহূর্তে আপনাদের বিল দিন। দেরি করলে টাকা না দিয়েই চলে যাব।'

বুঝলাম, ভদ্রলোক বেজায় চটেছেন। ইতিমধ্যে ন্যাটাহারিবাবু খবর পেয়ে গঙ্গা জল দেবার জন্যে সেখানে হাজির হয়েছেন। সাধুচরণ রেগে বললেন, 'দাঁড়িয়ে দেখছেন কী? বিল নিয়ে আসুন গে যান।' গৃহিণীকে বললেন, 'গঙ্গা জল যখন পাওয়াই গিয়েছে তখন তাড়াতাড়ি পুজো সারো। নাহলে তোমাকে ফেলে রেখেই চলে যাব। তোমার জন্যেই তো আমার এই দুর্গতি।'

গতিক সুবিধে নয় দেখে, বিল তৈরি করবার জন্য নিচে নেমে এলাম। মনে মনে হাসছিলাম খুব। একটু পরে ভদ্রলোকও বেডিং নিয়ে নিচে নেমে এলেন। পিছনে বেচারা মিসেস পাল। বিলটা দেখে দুখানা

একশটাকার নোট আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। রসিদ আর চেঞ্জটা দেবার জন্যে যখন ক্যাশ থেকে ফিরে এলাম, তখন সাধুচরণবাবু কাউন্টার থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে একটা ট্র্যাক্সিতে উঠে বসেছেন।

তাঁর হাতে টাকাটা ফেরৎ দিলাম। তিনি মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'খুব শিক্ষা হয়ে গেল। লগেজ ছাড়া খদ্দেরকে ডবল রুম ভাড়া দেন বলেই এসেছিলুম—কিন্তু ভদ্দরলোকের জায়গা নয়। এখন বেডিং যখন হয়েছে তখন কলকাতার শহরে হোটেলের অভাব হবে না।'

ট্যাক্সিটা নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেক অদ্ভুত লোক শাজাহান হোটেলে দেখেছি; কিন্তু এঁর তুলনা নেই। কী যে শেষে বলে গেলেন বুঝতে পারলাম না।

আমি বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়েছিলুম। ন্যাটাহারিবাবু পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'বুঝতে পারলেন না?' ন্যাটাহারিবাবু এবার হা হা করে হাসতে লাগলেন, 'তাই বলি, এতোক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা গেল।'

'কী ব্যাপার?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'যে কোনো একটু ভাল সেকেণ্ড ক্লাশ দিশী হোটেলে ফোন করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।'

'কী বুঝবো?'

'বলবেন, একটা ভাল ডবল বেডরুম ভাড়া চাই, সঙ্গে মহিলা আছেন। ওরা সঙ্গে সঙ্গে বলবে, লগেজ না থাকলে, কোনো ডবল রুম ভাড়া দেওয়া হয় না।'

'হুট করে, খালি হাত পায়ে কাউকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ডবল রুম ভাড়া করবার রেওয়াজ আছে। এই সব ক্ষেত্রে হোটেলের লোকদের পরে প্রায়ই পুলিসের হাঙ্গামা পোয়াতে হয়েছে। তাই ওরা জেনুইন ট্রাভেলার ছাড়া কাউকে নিতে চায় না। আর জানেনই তো, বাউনের যেমন পইতে, ট্রাভেলারের তেমনি লগেজ।'

আমি বলেছিলাম, 'হতেই পারে না।'

উনি বলেছিলেন, 'বিশ্বাস না হয় ফোন করুন।'

দু-এক জায়গায় পরীক্ষা করেছিলুম—ন্যাটাহারিবাবু যে মিথ্যা বলেননি,

তা হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল। দিশী হোটেলের লগেজ রহস্যটাও আমার কাছে জলের মতো সহজ হয়ে গিয়েছিল।

সাধুচরণবাবু আমার হোটেল জীবনের একটা স্মরণীয় চরিত্র। ছেলের সঙ্গে তাঁর পরে মিল হয়েছিল কিনা মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে। এমন এক-আধটা লোক মাঝে মাঝে হোটেলে এলে ভালই লাগে।

এখানে, এই অফ্রিকা হোটেলে তাঁরা বোধহয় কোনোদিন আসবেন না।

একি! ঘড়িতে দেখছি, সমস্ত রাত্রিটাই কাটিয়ে দিয়েছি। এলার্ম বাজছে। এখনই ডিউটিতে যেতে হবে। ভালবাসা জেনো, ইতি—

তোমার সত্যসুন্দরদা।

চৌরঙ্গী কাহিনী শেষ হলো। আমার নটে গাছটিও প্রায় মুড়লো। তার আগে যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগের হিসেবটা মিলিয়ে নিতে হবে। সব-রকম অঙ্কের পর অবশিষ্ট কী পড়ে আছে কে জানে?

দুটি প্রধান অঙ্কের হিসেব এই যাবার বেলায় মনে পড়ছে। আইন ও পান্থশালার জগৎ ত্যাগ করে সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করে স্মৃতির খাতায় যত যোগ হয়েছিল তার মধ্যে দুটি বৃহৎ অঙ্কের নাম ধীরাজ ভট্টাচার্য এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন আকস্মিক ভাবে তাঁরা যে বিয়োগ হবেন তা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমি ধীরাজ ভট্টাচার্যের সমকালীন শিল্পী বা নিকটতম বন্ধু নই। তাঁর গুণমুগ্ধ সিনেমা দর্শকদেরও একজন বলে নিজেকে দাবী করতে পারি না। বাংলা চিত্রের নির্বাক যুগ আমার জন্মের পূর্বের ইতিহাস। আর যখন সবাক ধীরাজ ভট্টাচার্য নায়ক রূপে বাঙালী দর্শকদের হৃদয়ে পুলক ও বিস্ময়ের সঞ্চার করছেন, তখন আমি ইতিহাস, ভূগোল, হস্তলিপি, অঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছি। সিনেমা তখন নিষিদ্ধ ফলের মতো—একমাত্র বড়রাই তার রসাস্বাদনের অধিকারী।

ফলে, যে ধীরাজ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে সমগ্র বাংলা দেশ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ

করলেন, তার কোনো পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আর এক ধীরাজ ভট্টাচার্য ছিলেন—লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত, অবসন্ন ধীরাজ ভট্টাচার্য। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁকেই আমি শেষ দেখে এসেছিলাম। ১লা মার্চ, ১৯৫৯, রবিবার পাঁচটার সময় পূর্ণ সিনেমার সামনে জনৈক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অসুস্থ ধীরাজ ভট্টাচার্যের অন্যতম অন্তরঙ্গ তিনি। তাঁর সঙ্গেই দেখতে যাবো মৃত্যুপথযাত্রী প্রতিভাকে। কিন্তু তার আগেও এক ইতিহাস আছে। আমার বাল্যস্মৃতির সেই অংশটুকু বলে রাখবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

আমাদের পাড়াতে এক নতুন বৌদি এলেন। তাঁকে প্রথমে পাড়ার গৃহিণীরা তেমন কিছু পাত্তা দেননি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে জানা গেল তাঁর বাপের বাড়ি পাঁজিয়া গ্রামে। যশোর জেলার পাঁজিয়া গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কৌতূহলী হবার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু যখন বৌদি বললেন, ধীরাজ ভট্টাচার্য তাঁদের গ্রামের লোক, রাতারাতি তাঁর দাম বেড়ে গেল। পাড়ার গিন্নীরা জিজ্ঞাসা করলে, 'ও টুলুর মা, ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দেখেছো তুমি?"

বৌদি কোনোরকম দ্বিধা না করে বললেন, "কতবার দেখেছি। আমাদের গাঁয়ের ছেলে, দেখবো না তাঁকে?"

পাড়ার গিন্নীরা নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। একটু শান্তি পাবার জন্য বলেছেন, "তা তোমাদের বাড়ি থেকে ওঁর বাড়ি নিশ্চয় কিছুটা দূর আছে।"

বৌদি তাঁদের বুকে বজ্রাঘাত করে জানিয়েছেন, তাঁদের বাড়ির একেবারে ঠিক পাশেই ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়ি।

সেদিনের বাংলা দেশে ধীরাজ ভট্টাচার্যের অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার একটা নমুনা পাওয়া গেল। কারণ পাড়ার সবাই সেদিন বিনা দ্বিধায় বৌদির প্রতিপত্তি মেনে নিলেন। আমরাও বৌদিকে কেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য পাড়াতে আমাদের দরও বেড়ে গিয়েছিল। আমরা যা-তা নই, আমাদের বৌদি ধীরাজ ভট্টাচার্যের গাঁয়ের মেয়ে।

এই বৌদির ভাই এক সময় পাঁজিয়া গ্রাম থেকে হাওড়ায় এসে হাজির হলেন। বৌদিদের বাড়িতে স্থানাভাব। কিন্তু তাঁর ভায়ের স্থানাভাব

হলো না, পাড়ার অনেকেই তাঁকে রাত্রে থাকবার জায়গা দিতে চেয়েছিলেন। কেন জানি না, বৌদির ভাই আমাদের বাড়িটাই পছন্দ করলেন এবং তাঁর পাশে শুয়ে শুয়ে আমি মনে মনে কতদিন রাত্রে পাঁজিয়া গ্রামে চলে গিয়েছি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ধীরাজ ভট্টাচার্যের একখানা ছবিও আমি তখন দেখিনি। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। ধীরাজ ভট্টাচার্যের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার গিন্নী, কাকা, মেসো এবং দাদাদের মুখমণ্ডলে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখেছি, তাতেই তিনি আমার মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে গিয়েছিলেন। পাড়ার গৃহিণীরা বলেছেন, 'চেহারা, আহা যেন স্বয়ং কন্দর্প।'

কন্দর্পকে আমি দেখিনি। তাই কতদিন রাত্রে বৌদির ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছি, "ধীরাজ ভট্টাচার্য বুঝি খুব ফরসা?"

তিনি বলেছেন, "সে তোকে কি করে বোঝাবো। খু-উ-ব।"

আমি জিজ্ঞাসা করেছি, "আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন?"

নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে তিনি বলেছেন, "কতবার। এই যেমন তোর সঙ্গে কথা বলছি, ঠিক তেমনিভাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করেছি, "আপনার সঙ্গে দেখা হলে তিনি চিনতে পারবেন?"

বৌদির ভাই একবার একটু রেগে উঠেছিলেন। বললেন, "দেখা হলে শুধু চেনা কেন, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াবেন। বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবেন, তবে ছাড়বেন।"

বৌদির ভাইকে এরপর আমি যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করেছি। শর্ত ছিল, যদি কোনোদিন ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়িতে তিনি যান, আমাকেও সঙ্গে নেবেন।

নানান কাজের চাপে বৌদির ভাই-এর আর ধীরাজবাবুর বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার না-দেখা নেপোলিয়নের সঙ্গে কোনোদিনই চাক্ষুস পরিচয় হবে না, সে কেমন কথা! মনের মধ্যে একটু সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, সত্যই ধীরাজবাবুর সঙ্গে বৌদির ভাই-এর কোনো পরিচয় আছে কিনা।

বৌদির ভাই বোধ হয় আমার মনের ভাব আন্দাজ করেছিলেন। তখন

পুজোর সময়। তিনি হঠাৎ বললেন, "চল আমার সঙ্গে পাঁজিয়াতে। নিজের চোখে না দেখলে তো বিশ্বাস করবি না।"

আর্থিক অনটন এবং অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও সেই সুযোগ আমি নষ্ট করিনি। হাওড়া থেকে শিয়ালদহ স্টেশন, শিয়ালদহ থেকে যশোর এবং যশোর থেকে বাসে করে একদিন সত্যিই আমি পাঁজিয়াতে এসে হাজির হয়েছিলাম। ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যাবার পথে একটা বাঁশের সাঁকো পড়ে। সেই সাঁকো পেরিয়ে বৌদির ভাই আমাকে বাড়িটা দেখালেন। আমি পরম বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। এ তো সাধারণ বাড়ি। সাধারণ ইট কাঠেরই তৈরি। আমার সেদিনের মানসিক অবস্থা স্মরণ হলে আজও লজ্জা লাগে। সাধারণের সংসারেই যে অসাধারণের আবির্ভাব হয়, তা আমার জানা ছিল না।

আমি অবাক হয়ে শুনলাম, এই সাধারণ গ্রামে প্রতিবৎসর পুজোয় অসাধারণ ধীরাজ ভট্টাচার্যের আগমন হয়। তিনি আসবেনই। যেখানে যতো কাজ থাক, সব ফেলে গ্রামে ফিরে আসবেন এবং শুধু বেড়াতে আসা নয়; প্রতিদিন স্টেজ বেঁধে অভিনয় হবে। মায়ের পূজার আঙিনাতলে সন্ধ্যার আগে থেকেই দলে দলে লোক জমতে শুরু করবে। হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। গৃহবধূরা বিকেলের মধ্যেই রান্না শেষ করে রাখবেন। অন্যসময় তো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের চোখে ঘুম নেমে আসে। কিন্তু মহাপূজার কয়েকদিন পাঁজিয়া হঠাৎ কলকাতা হয়ে উঠবে, সারারাত জেগে থাকবে। অভিনয় হবে। এবং গ্রামের ছেলে ধীরাজ, যে ধীরাজ বাংলা দেশকে জয় করেছে, সেও অভিনয় করবে।

সেই প্রথম দেখলাম ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে। কলকাতার স্টেজে, কলকাতার সিনেমাতে না দেখে, কলকাতার আমি গ্রাম্য পরিবেশে পেট্রোম্যাক্স এবং কারবাইডের আলোয় ধীরাজ ভট্টাচার্যকে প্রথম দেখলাম। সেই আমার প্রথম সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরণ। কিন্তু একটুও বুঝতে পারিনি। ধীরাজ ভট্টাচার্য যাদুবলে আমাদের যেন মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মনে হলো. পেট্রোম্যাক্সের আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। স্টেজ থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম পূর্ব আকাশে সূর্যের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছে।

সেদিনের সে বিস্ময় ভোলবার নয়। আমার কল্পনার ধীরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আসল ধীরাজকে মিলিয়ে নিয়েছিলাম। হাওড়া থেকে পাঁজিয়া পর্যন্ত ছুটে আসার শ্রম সার্থক হয়েছিল আমার।

বউদির ভাই বলেছিলেন, "চল, আলাপ করিয়ে দিই।" আমার সাহস হয়নি। এতোদিনের পরিচিত হওয়ার সাধ যেন এক মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। দূর থেকে দেখেই পরিতৃপ্ত হয়েছি, এর থেকে বেশি সুখ আমার সহ্য হবে না। তাঁর গরবে গরবী পাঁজিয়ার লোকদের দেখেও আমার হিংসে হয়েছে। কোনো সম্পর্কের সূত্র ধরে যদি আমিও তাঁর খ্যাতির অংশীদার হতে পারতাম! একটি সম্পর্ক শীঘ্রই আবিষ্কার করেছিলাম এবং সেদিন আমার সৃজনী প্রতিভার তারিফ না করে থাকতে পারিনি। আমরা দু'জনেই যশোহর জেলার লোক—সুতরাং প্রায় আত্মীয় বলা যেতে পারে!

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে দাবিও বেশী দিন টিকলো না। র‍্যাডক্লিফ সায়েবের এক কলমের খোঁচায় আমাদের আত্মীয়তা ছিন্ন হলো। আমার জন্মস্থানকে বিনাদ্বিধায় যশোহর থেকে কেটে নিয়ে এই ইংরাজনন্দন অন্য এক জেলার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে একদিন জানলাম, আমি চব্বিশ পরগণার লোক—মাইকেল মধুসূদন ও ধীরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আর আমার জেলা সম্পর্ক নেই। অনেকদিন পরে ধীরাজ ভট্টাচার্যকে গল্পচ্ছলে এ-কথা বলেছিলাম। আমার এই হাল্কা উক্তিকে তিনি হালকা-ভাবে নিলেন না। তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললেন, "কি সোনার দেশই ছিল আমাদের, ভাই।" বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠে ছল। কি ভালই বাসতেন যশোহরকে। র‍্যাডক্লিফ সায়েবের রায়ের পরও তিনি দেশে গিয়েছেন, অভিনয় করেছেন।

আমার সঙ্গে ধীরাজ ভট্টাচার্যের সম্পর্ক র‍্যাডক্লিফ সাহেবের সঙ্গেই শেষ হয়ে যেতো, যদি না দু'জনেই এক অজ্ঞাত কারণে সাহিত্যের মালঞ্চে অনধিকার প্রবেশ করতাম। ধীরাজ ভট্টাচার্যের 'যখন পুলিস ছিলাম' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল, লোকে চমকে উঠলো—একি সেই সিনেমা-থিয়েটারের ধীরাজ? মা সরস্বতীর সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক তো আদায় কাঁচকলায়! কিন্তু তবু বিস্মিত বাঙালী পাঠক

দেখলেন, জীবন-সায়াহ্নে সিনেমার এক কেষ্টঠাকুর অপরূপ ভঙ্গিতে লিখে চলেছেন। গৌড়জনের চিত্ত জয় করলেন লেখক ধীরাজ ভট্টাচার্য।

'যখন পুলিস ছিলাম' একদিন শেষ হলো। কিছুদিন পরে দেশ পত্রিকার সেই শূন্য স্থানটুকু অধিকার করল এক ব্যারিস্টারের বাবুর আত্মকথা। তারপর একদিন বর্মন স্ট্রীটের দেশ পত্রিকার আপিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এসেছিলাম জনৈক প্রকাশকের দপ্তরে। প্রকাশক একখানি বই দেখালেন আমাকে। বললেন, "আপনার বইটাও এইভাবে কম্পোজ করতে চাই।" কথা শেষ করে উঠে পড়লাম। বইটা টেবিলে রেখে চলে আসছিলাম। ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—"এ বইটা নিয়ে যান। জীবনে সেই প্রথম বিনামূল্যে গ্রন্থপ্রাপ্তি—প্রথম প্রেমের মতোই অবিস্মরণীয়। আর সে বই-এর নাম—যখন পুলিস ছিলাম।

বই নিয়ে আবার বেরুতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এবারও বাধা পড়লো। মাথায় মাড়োয়ারী টুপি আর যতদূর মনে হচ্ছে, ফুলপ্যান্ট পরে ঘরে ঢুকলেন এক তীক্ষ্ণনাসা প্রৌঢ়। আমার চিনতে দেরি হয়নি। যাঁর বই বিনামূল্যে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তিনিই—স্বয়ং ধীরাজ ভট্টাচার্য। একটা চেয়ার নিয়ে তিনি বসে পড়লেন। প্রাণখোলা আত্মভোলা মানুষ। পুরো যশুরে টানে বললেন, "এক কাপ চা খেতেই হবে। টালিগঞ্জ থেকে সোজা আসছি।"

প্রকাশক পরিচয় করিয়ে দিলেন। আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আমার হাতটা ধরে বললেন, "আহা কি মিষ্টি হাত তোমার! পরিচয় করে বড্ড খুশি হলাম।"

আমার যে তাঁর থেকে শতগুণ আনন্দ হচ্ছিল, কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারিনি। তিনি বুঝতেও চাননি। বললেন, "আমার বইতে নিজেকে যেন বড্ড জাহির করে ফেলেছি। তোমার তা হয়নি। নিজেকে কেমন সুন্দরভাবে একপাশে সরিয়ে রেখেছ।

একদিনের আলাপ যে কতদূর গড়াতে পারে, তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা নিজেদের একান্ত পারিবারিক সংবাদ আদান-প্রদান আরম্ভ করে দিয়েছি। ওঁর বাবা, ওঁর মায়ের কথা শুনিয়েছেন আমাকে। আমার বাবা, মা, ভাইদের কথাও সব বলে ফেলেছি তাঁকে।

কি অপরূপ কথা বলবার ভঙ্গী! বৈঠকী গল্পের রাজা। অথচ মনের

মধ্যে একটুও সংকীর্ণতা নেই, দম্ভ নেই। বললেন, "ভাই, আমাদের কি হবে বলতে পারো ?" একটি প্রখ্যাত ইংরাজী সংবাদপত্রে জনৈক বাঙালী সমালোচকের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করলেন। বললেন, "উনি লিখছেন, দেশটা গোল্লায় গেল। সাহিত্যের কমলবনে মত্ত হস্তীরা বিচরণ করছে। সাহিত্যের আভিজাত্য বলে কিছু থাকলো না আর, জেলের প্রহরী, উকিলের মুহুরী, রঙ্গালয়ের নট সবাই লেখক সেজে সাহিত্যমন্দিরকে কলুষিত করছে।"

মনে হলো প্রবন্ধকারের মন্তব্যে তিনি গভীর দুঃখ পেয়েছেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলাম, তার প্রয়োজন হলো না। তিনিই আমাকে বললেন, "আমাদের আঘাত সহ্য হয়ে গিয়েছে। তোমরা যেন ভেঙে পোড়ো না।"

সেই থেকেই আলাপ। যতোবার দেখা হয়েছে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন, "আমার বাড়িতে এসো একদিন। তুমি আমার ঘরের লোক —যশোর জেলায় বাড়ি—তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করতে পারবো না।"

তারপর কলেজ স্ট্রীটে বসে বসেই গল্প শুরু হয়ে গিয়েছে। সে কি প্রচণ্ড আড্ডা! কথা যেন শেষ হতে চায় না। তিনি একাই একশ। একাই সকলকে কাঁদিয়ে, হাসিয়ে, চমকিয়ে মাত করে রাখেন। কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! কত অদ্ভুত মানুষকে দেখেছেন তিনি। আর অদ্ভুতভাবেই মনে রেখেছেন তাদের। বৈঠকের সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। উনি বলেছেন, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সিনেমা-থিয়েটার করে যারা পেট চালায় তাদের এসব রপ্ত হয়ে যায়।"

সিনেমা থিয়েটার নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি। বলে ফেলেছিলাম, "সেই এলেন সাহিত্যে, কিন্তু বড্ড দেরিতে।"

তিনি আবার হা হা করে হেসে উঠলেন। "যা বলেছো ভাই। রসকস একটু আধটু যা ছিল টালিগঞ্জ তা নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। লিখতে গেলেই কেমন যেন আর্টিফিসিয়াল হয়ে উঠি। চোখের সামনে দেখি ক্যামেরা 'প্যান' করছে।"

তাঁর বোধ হয় বিশেষ কাজ ছিল সেদিন। অনিচ্ছার সঙ্গে ধীরাজ ভট্টাচার্য বিদায় নিলেন। আমার জানা ছিল না, সেদিনই শুনলাম, এর

থেকে বিশগুণ রসিয়ে গল্প বলেন তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ির আড্ডায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র সবারই প্রেমেনদা। তাঁর এই আড্ডাটিকে বাদ দিয়ে আধুনিক যুগের কোনো সাহিত্য-ইতিহাসই লেখা যাবে না। সিনেমা এবং সাহিত্যকে যাঁরা নতুন ফসলে সমৃদ্ধ এবং সার্থক করেছিলেন, করছেন বা করবেন তাঁদের সবারই পদার্পণে বিচিত্র এক পরিবেশ গড়ে উঠতো তাঁর বাড়িতে। এবং ঐ আড্ডার সঙ্গদোষেই অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের দেহে একদিন সাহিত্যের ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছিল।

আর একদিন দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। সেদিন শনিবার। দেখেই বললেন, "কেমন আছ ভাই?" তারপর আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন।

ইউনিভার্সিটি এবং মেডিক্যাল কলেজকে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। তিনি বললেন, "চলো না।"

শেষ পর্যন্ত বৌবাজারের এক সোনার দোকানে নিয়ে এসে তুললেন। বললেন, "আমরা সেকেলে হয়ে গিয়েছি। তাই একটা মডার্ণ ছোকরা খুঁজছিলাম। দেখি এবার তোমার পছন্দ কি রকম।" এইবার আসল রহস্যটি প্রকাশ করলেন, "প্রেমেনের মেয়ের বিয়ে। আহা বড় ভাল মেয়ে।"

অনেকক্ষণ ধরে নানা রকমের অলঙ্কার দেখলেন। আমার মতামত নিলেন। শেষে আমার পছন্দমতো একটি অলঙ্কার কিনে বেরিয়ে এলেন।

বললাম, "এবার চলি।"

ধীরাজবাবু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "চলো, কলেজ স্ট্রীট ঘুরে আসি। এখন বাড়ি গিয়ে কী করবে?"

সুতরাং আবার পদযাত্রা। যেতে যেতে বলেছেন, "প্রেমেন যে আমার কী, সে তোমরা জান না।"

'যখন নায়ক ছিলাম' তখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বললেন, "ওতে শুধু নায়কজীবনের কথা বলেছি। এবার আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়ের কথা লিখবো। নাম হবে 'যখন জোয়ার এল'। সে বইতে প্রেমেন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখতে হবে।"

কলেজ স্ট্রীটের এক বই-এর দোকানে বসে তিনি আবার গল্প আরম্ভ করেছেন। সেদিন বেশী লোকজন ছিল না। বললেন, "ভালই হয়েছে।

তোমাদের একটা জিনিস পড়িয়ে দিই। 'যখন নায়ক ছিলাম' বইটার ভূমিকাটা লিখে ফেলেছি।" সেইটে পড়ে শোনালেন। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। কাউকে অমন দরদ দিয়ে আবৃত্তি করতে আমি কখনও শুনিনি। আমার শরীরের লোমগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে শেষ প্যারাটি। বাঁ হাতে কাগজটা ধরে, তিনি একবার আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আমাদের সবাইকে ভুলে যেন কোথায় চলে গেলেন। নির্বাক যুগের বোবা নায়ক যেন এ-যুগের নায়কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বলছেন—"ধীরে, বন্ধু ধীরে, একটু আস্তে—থেমে থমকে চারিদিক দেখে পথ চলো। আজ যে কুসুম বিছানো কংক্রিটের চওড়া রাস্তায় তোমার বেপরোয়া যাত্রা শুরু হয়েছে—একদিন তা ছিল আঁকাবাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো—ছিল কাঁটায় ভরতি। আমরা, মানে বোবা যুগের হতভাগ্য নায়কের দল—কাঁটার আঘাত তুচ্ছ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েও রোলারের মতো বুকে হেঁটে ঐ রাস্তা করে দিয়েছি সমতল মসৃণ—কুসুম বিছানো। কিন্তু বেপরোয়া গতিবেগে তোমরা ওটাকে করে তুলেছো বড্ড বেশি পিছল। তাই বলছিলাম—ধীরে, বন্ধু ধীরে।"

পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এবং অকস্মাৎ সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের একজন বলেছিলেন, "অভিনেতার পড়া, সাধারণের থেকে তো ভালো হবেই।" কি জানি, হয়তো তাই। হয়তো আমি কেবল তাঁর বাচন-ভঙ্গীতেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল, কি সত্য ভাষণ! শুধু সিনেমা কেন? সে যুগের সাহিত্যিক, সে যুগের দেশপ্রেমিকও তো এ-যুগের সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিককে ঐ একই কথা বলতে পারেন। আমার মনে হলো, প্রাচীন পৃথিবী যেন নবীন সভ্যতাকে ডেকে বলছে, ধীরে, বন্ধু ধীরে।

তারপরও কয়েকবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সব সময়ই হাসিমুখ। সব সময়ই যেন হৈ হৈ হট্টগোলে ডুবে থাকতে চান। মনে মনে আনন্দ পেয়েছি। এই তো হওয়া চাই। মনের সেই ভাব নিয়েই ১৯৫৯ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত ছিলাম। খবর পেয়েছি ধীরাজবাবু অনেক দিন থেকেই অসুস্থ। লিভারের সিরোসিস। নিজেদের অতিমাত্রায় বিজ্ঞ মনে

করেন, এমন কয়েকজন বলেছেন, "অভিনেতা ও সিরোসিস ওতো Pair of words-এর মতো। লিভারকে যারা কষ্ট দিচ্ছে, লিভার তাদের ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবেই।"

অভিবিজ্ঞরা চিরকালই পৃথিবীতে থাকবেন। তাঁদের কথাতে কান দিইনি। বিষণ্ণ মন নিয়ে রবিবারের বিকেলে হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে তাঁর বাড়ীতে হাজির হয়েছি। বাইরের ঘরে বসে থাকতে হলো কিছুক্ষণ। কিন্তু ক্লান্তি লাগেনি। টেবিলের কাঁচের তলায় অসংখ্য ছবি। যৌবনে ধীরাজ ভট্টাচার্য বিভিন্ন ছবির রূপসজ্জায়। এই প্রথম দেখলাম নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। এতো সুন্দর দেখতে ছিলেন! কোনো একটি নায়িকার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ধীরাজ! সত্যই অসাধারণ! 'যখন নায়ক ছিলাম' আমি পড়েছি। তাঁর 'মাকাল ফলের' মতো রাঙা দেহে আর বাবরি চুলের জন্য কত দুঃখ করেছেন। কিন্তু সেই দুঃখ কি এই দেহের জন্যে? বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য, অভিনেতার আত্মজীবনীতে অভিনয়ের একটি ছবিও স্থান পায়নি। যা শুধু অবাক হয়ে দেখবার, তার পরিবর্তে শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি কথা।

এবার ডাক এল। ওপরে যেতে পারি আমরা। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু এ কি! খাটের দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো। যে ছবিগুলো এইমাত্র দেখে এলাম, সেগুলো কি বিধাতার পরিহাস? কোথায় সেই ধীরাজ ভট্টাচার্য? চামড়া দিয়ে ঢাকা একটা কঙ্কাল বিছানায় পড়ে রয়েছে! কোথায় সেই কাঁচা সোনার মতো রঙ? চামড়ার উপর কে যেন কালো কালি মাখিয়ে দিয়েছে। মুখের চামড়াটা বোধ হয় স্বচ্ছ, ভিতরের কঙ্কালটাও যেন দেখতে পাচ্ছি। চুলগুলো রুক্ষ। বড় বড় চোখদুটো আজও রয়েছে। কিন্তু কোনো উজ্জ্বলতা নেই, যেন ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন রান্নাঘরের পঁচিশ পাওয়ারের বাতি। দেহটা চাদরে ঢাকা—কিন্তু পেটটা যে দশগুণ বড় হয়ে উঠেছে তা বেশ বোঝা যায়।

আমাকে যেন দেখতে পেলেন না ধীরাজ ভট্টাচার্য। একদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন, দেওয়ালের বাঁধানো তাঁরই একটা ছবির দিকে—নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য, সেখানে যৌবনের ভরা জোয়ারে অবগাহন করছেন।

হঠাৎ তিনি ভেঙে পড়লেন। নিজের চোখ দুটো ঢেকে বললেন, "বিশ্বাস কোরো না, এই দেহটাকে বিশ্বাস কোরো না। তোমরা বলো, ঐ আমি আর এই আমি কি এক?"

ধীরাজ ভট্টাচার্য নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিলেন। দরজার কাছে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখেই চিনতে পেরেছি। ধীরাজ ভট্টাচার্যের মা ছাড়া তিনি আর কে হতে পারেন? যে ভদ্রলোক ধীরাজ-বাবুর সেবা করছিলেন তিনি একটা দুধের কাপ নিয়ে এলেন। ধীরাজ ছোটছেলের মতো বললেন, "এতোটা—না, অতোখানি আমি পারবো না।" লোকটি বললেন, "মা বলেছেন খেতে।" "ও, মা বলেছেন"—আর কোনো আপত্তি করলেন না ধীরাজবাবু।

এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রশান্তিতে আমার মন ভরে উঠেছিল। মা ও ছেলের এমন রূপ, যে দেখে সে ধন্য, যে শোনে সেও ধন্য। কৌতূহলী পাঠককে 'যখন নায়ক ছিলাম' গ্রন্থখানি আর একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। মাতা-পিতার প্রতি এমন অকৃত্রিম অনুরাগ ইদানীংকালের আর কোনো রচনাতে লক্ষ্য করেছেন কি?

দুধের কাপটা ফেরত দিয়ে ধীরাজ বললেন, "মা আমাকে রোজ তিন সের করে দুধ খাওয়ান। খাই আমি, মার কষ্ট যে দেখতে পারি না ভাই!"

আমি তাঁর খবর নেবার জন্যেই গিয়েছিলাম। কিন্তু চরম রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও পুরনো ধীরাজ ভট্টাচার্য নষ্ট হয়ে যাননি। আমার বই-এর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসছিল আমার। ভাইপোকে ডেকে পাঠালেন। এই ভাইপোটিই নিঃসন্তান ধীরাজবাবুর নয়নের মণি। তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন বুঝতে পারছি। তবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, "ওদের হাতে-লেখা কাগজে একটা লেখা দিয়ো ভাই। ওর যে কি মুশকিল। সবাই বলে, তোমার জেঠু থাকতে আমাদের পত্রিকায় লেখা যাবে না? অথচ কিছুই করে উঠতে পারি না।"

বাঁচবার সে কি উদগ্র কামনা। আশা করছেন, আবার সুস্থ হয়ে উঠবেন, আবার অভিনয় করবেন। আবার যশোরে যাবেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যশোরের অবলাকান্ত মজুমদারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। আমি যশোরের ছেলে, শুনলে অবলাবাবু যে কী খুশীই হবেন।

যশোর থেকে আমরা সোজা পাঁজিয়ায় চলে যাবো। চারটে রাত পর পর অভিনয় হয়তো করতে পারবেন না। ডাক্তার বারণ করবে, মাও রাগ করবেন। কিন্তু নবমীর রাত্রে আদর্শ হিন্দু হোটেলটা একবার করবেনই।

উৎসাহিত হয়ে লেখার কথা তুললাম। 'যখন জোয়ার এল' কবে লিখবেন? তিনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। "না ভাই, ও বইতে অনেকের সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করতে হবে। 'লাইনে' থেকে লেখা চলবে না। রিটায়ার করে লিখবো।"

হা ঈশ্বর, এখনও তিনি 'লাইনে' রয়েছেন। তারপর তিনি রিটায়ার করবেন। এই তো জীবন।

এতক্ষণ আমরা দু'জন মাত্র ঘরের মধ্যে ছিলাম। আরও দু'জন ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের চিনি না। ভাবে বুঝলাম, ওঁর বিশেষ পরিচিত। নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধুদের কেউ হবেন।

তাঁরা বললেন, "বেজায় কাজের চাপ! তাই আসতে পারিনি।"

অভিমানী ধীরাজ ভট্টাচার্য বললেন, "তোমাদের দোষ নেই। নিত্য নেই দেয় কে? নিত্য রোগী দেখে কে?"

ওঁদের দেখেই তিনি যেন কেমন হয়ে পড়লেন। চোখের কোণে জলের ফোঁটা। আমার দিকে তাকিয়ে সকরুণভাবে বললেন, "সারাজীবন শুধু আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলাম ভাই। জীবন আমাকে কিছুই দিল না। শুধু বঞ্চনাই পেলাম।" নিজের দুঃখের কথা এই প্রথম শুনলাম তাঁর মুখে। বললেন, "অভিনয়? প্রশংসার বদলে, সেখানে পেয়েছি সমালোচনার নিষ্ঠুর কশাঘাত। সাহিত্য? লোকে বলেছে, ধীরাজ ভট্টাচার্য লিখবে ঐ বাংলা! নিশ্চয় কেউ লিখে দিয়েছে।"

একটু থামলেন তিনি। চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পেটের উপর হাত রেখে আবার বললেন, "সব সহ্য করতে পারি আমি। কিন্তু বঞ্চনা···নাঃ, ··বড় কষ্ট পেলাম ভাই।"

বড় ক্লান্ত মনে হলো ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। কত কিছু যেন বলার আছে। জীবনের কাছে কী যেন চেয়েছিলেন, অথচ পাননি। তাঁর আত্মীয়রাও তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝলাম, তাঁরা কিছু

বলতে চান ওঁকে। সেই অবস্থায় আমার উপস্থিতি হয়তো অস্বস্তিকর হতে পারে মনে করেই আমি উঠে পড়লাম।

ধীরাজবাবু বললেন, "আবার আসবে তো ভাই?"

বললাম, "নিশ্চয়ই আসবো, এবং খুব শীগগিরই আসবো।"

মনে হলো, আমাকে তিনি বিশ্বাস করলেন না। মাথার কাছে টেলিফোনটা দেখিয়ে বললেন, "অন্তত টেলিফোন কোরো। করবে তো, কথা দাও।" নিজেই নম্বরটা দিলেন—৪৮-১৩১৩। বললেন, "একটা তেরো নয় দুটো···doubly inauspicious."

বুধবার বিকেলে, কিংবা বৃহস্পতিবার সকালে টেলিফোন করবো কথা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। ব্যর্থতার আগুনে একটি প্রাণ যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। অথচ সবই পেয়েছেন তিনি। মনে পড়েছিল সেই বিখ্যাত কবিতাটি—

"জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি।
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।"

হাওড়ার পথে ট্রামে বসে ভেবেছি, কে তাঁকে ক্লান্ত করেছে? কেন তিনি হঠাৎ ভেঙে পড়লেন? সামনাসামনি জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কিন্তু টেলিফোনে জেনে নেবো।

বুধবার ব্যক্তিগত কয়েকটি কাজে ছুটোছুটি করেছি, টেলিফোন করা হয়ে ওঠেনি। বৃহস্পতিবার সকালেই টেলিফোন করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তার কিছু আগেই সজ্ঞানে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। আমাদের সকলকে অবজ্ঞা করে জলের পোকা আবার জলে ফিরে গিয়েছে।

এখন বুঝছি, পৃথিবীর অঙ্কে আগে যোগ এবং অবশেষে বিয়োগ। জন্ম দিয়ে শুরু আর মৃত্যু দিয়েই শেষ। চারুচন্দ্রের বিয়োগ কথা বলে আমিও তাই শেষ করবো। চারুচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি এক কথার লোক—যা কথা দিই, তা রাখি। তোমরা হয়তো সন্দেহ করছো, ভাবছো বুড়ো নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি খেলাপ করবে। কিন্তু আজকের সময়, তারিখ, সন তোমার নোট-বইতে লিখে রেখে দিও; তারপর যদি সুযোগ হয় এই 'বসুধারা' আপিসেই আমার উপর এসে হামলা কোরো। আর সে সুযোগ যদি না পাও তাহলে বাড়ি বসে তুমি একলা-একলাই মিলিয়ে নিও।"

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন! ১৯৬১ সালের ২৬শে আগস্ট, শনিবার তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। আর আগস্ট মাসের শেষদিনে ন্যাশনাল লাইব্রেরির চেয়ারে বসে, এই মুহূর্তে আমি লিখছি। বৃহস্পতিবারের এই বারবেলায় বাইরে বেশ প্রবল বেগেই বৃষ্টি পড়ছে। চিড়িয়াখানার সামনে সমর্থ জোয়ান জোয়ান গাছগুলো ঝড়ের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছে; মাতালের মতো নিজের মাথা ঠুকছে। বজ্রের শব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নাচঘরের আলোগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর আমার সামনে পড়ে রয়েছে আমার নোট-বইটা। আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী এই নোট-বইটারই এক কোণে লেখা রয়েছে "তোমরা দেখে নিও—এই রবীন্দ্র 'শতবর্ষপূর্তির' বছর আমি পেরোতে পারবো না, এর মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবো।"

নোট-বুকে প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জী লিখে রাখার অভ্যাস আমার নেই। তবু কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর হলদে-রঙের বাড়িটার দোতলায়, বৈশাখের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, 'বসুধারা'র চিরযুবা সম্পাদক যখন হঠাৎ অমন কথা বলে উঠলেন, তখন কেন জানি না বুকের ভিতরটা ভয়ে মুচড়ে উঠেছিল। সেইদিন রাত্রেই বাড়িতে ফিরে এসেই তাঁর কথাগুলো লিখে ফেলেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, ফাঁড়া কাটলেই একদিন 'বসুধারা' আপিসে গিয়ে হামলা

করবো। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। আগস্টের এই শেষ সন্ধ্যায় আমি সেদিনের কথাগুলো একা-একাই মিলিয়ে নিচ্ছি।

লিখে লিখে আমিও যেন ক্রমশঃ পেশাদার হয়ে উঠছি। অনুগত কলমটা আজকাল যত সহজে অভিভূত হয়ে পড়ে, মনটা তত সহজে হয় না। পেশাদার লেখকের এই নাকি ধর্ম—কোনোকিছুতেই সে অভিভূত হয় না, অথচ কলমটা কথায় কথায় কেঁদে ওঠে। সরলপ্রাণ পাঠক সেই লেখা পড়েই কাঁদতে শুরু করেন; কিন্তু সাবধানী জহুরী ঠিক ধরে ফেলেন কোন্‌টা আসল মুক্তো, আর কোন্‌টা ইমিটেশন। এ-কথাও কিছু আমার নিজের নয়, জহুরী সম্পাদক চারুচন্দ্রই একদিন আমাকে বলেছিলেন।

কিন্তু আজ আমি কাঁদছি। আজ আমার কলম যেন শুকিয়ে গিয়েছে। কলমের সব কালি কান্না হয়ে চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরির এক কোণে বসে, সবার অলক্ষ্যে, বৃষ্টিবাদলের মধ্যে আলিপুরের চিড়িয়াখানার দিকে তাকিয়ে, আমার মনকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছি। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর এই ঐতিহাসিক নাচঘরে আজ যেন আমি একলাই বসে রয়েছি। এখানে কেউ যেন নেই। কিছুই আমার কানে আসছে না, কেবল লাল নোট-বইটার একটা পাতা থেকে সেই পরিচিত রসিক কণ্ঠ আবেগ মিশিয়ে বলছে, "কেমন? কথা রেখেছি তো?"

এই কথা-রাখার পিছনে একটা সামান্য ইতিহাস আছে। কয়েকমাস আগে আমি এক গুরুতর অপরাধ করেছিলাম। আমার সেই অপরাধ এই স্বর্গতঃ আত্মা আপন স্নেহবশে মার্জনা করেছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে করলেই যে তিনি আমাকে পাঠকের আদালতে সমর্পণ করে আমাকে অপদস্থ করতে পারতেন, তা আজ আমি সর্বসমক্ষে স্বীকার করছি।

বৈশাখের শেষে সবাইকে এড়িয়ে চুপি চুপি আমি একদিন অধ্যাপক চারুচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেই দেখা করার পিছনে একটা ব্যক্তিগত কারণ ছিল।

তারও কিছুদিন আগে আপিসে বসে কাজ করছিলাম। এমন সময় ফোন এসেছিল "হ্যালো, শংকর?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আমি 'বসুধারা'র চারু কথা বলছি। যে চারু তোমার সুধাময়কে

দিল্লীর পুরস্কার পাবার জন্যে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে 'যাবার আগে' উপন্যাস পড়ে খুশী হতেন।"

আমার তখন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাবার অবস্থা। আগের বছরের বৈশাখ মাসে 'বসুধারা'তেই এক সার্থকনামা লেখকের জীবন নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্পেরই এক অংশে রসিকতা করে লিখেছিলাম, 'বসুধারা'-সম্পাদক চারু ভট্টাচার্য নায়ক সুধাময়কে ফোন করে বলছেন—হ্যালো, আমি 'বসুধারা'র চারু কথা বলছি। এই অংশটি ছাপবার সময় প্রুফরীডারের নজরে পড়ে এবং সদাসতর্ক দাশরথিবাবু স্বভাবতঃই সেটি বাদ দেবার জন্যে চারুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চারুবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করেছিলেন—"হ্যালো, শংকর, আমি 'বসুধারা'র চারু কথা বলছি। ওরা তোমার গল্পের ঐ অংশটা পছন্দ করছে না, আমাকে বলছে কেটে দিতে। কিন্তু আমি বলেছি, না বাপু, ওসব হবে না। এখন কেটে দিই, আর তারপর যেদিন মরবো, সেদিনই ছোকরা লিখে দিক চারু ভট্টাচার্যি নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে পারতো না ; সেটি হচ্ছে না, শ্রীমান শংকর! তোমার সে আশায় হানিব বাজ—জিনিব আজিকার রণে। যা লিখেছ তাই পাস করি দিব, হৃদয় দিব তারি সনে!"

কিন্তু সেই থেকেই তিনি আমাকে ছাড়তেন না। ফোন তুলেই বলতেন—"আমি 'বসুধারা'র চারু কথা বলছি।"

ফোনে আমি বললাম, "এইভাবে আমাকে আর কতদিন শাস্তি দেবেন। এক দুই তিন-এর নেক্স্ট্ এডিশনে লাইন ক'টা বই থেকে কেটে দেবো।"

ফোনের ওধার থেকে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। "তাতেই ভেবেছো নিস্তার পাবে? মনে রেখো আমি 'বসুধারা' দিয়ে গাইডেড হই—তোমাদের ঐ বই-এর এডিশন দিয়ে নয়। যা হোক, শোনো—আগামী বৈশাখ সংখ্যাই আমাদের রবীন্দ্রসংখ্যা। আমার ইচ্ছে ছিল, এই সংখ্যায় নাটক-নবেল রাখবো না, শুধু রবীন্দ্রালোচনা থাকবে। কিন্তু রবীন্দ্রালোচনা ভোজন করে করে পাঠক-পাঠিকাদের যেরকম অগ্নিমান্দ্য শুরু হয়েছে, তাতে একটু গল্পের এবং নবেলের চাটনি রাখা প্রয়োজন—না হলে নিশ্চিত পেটের গোলমাল। তা তুমি একটা

বড়ো গল্প—গত বারে, বৈশাখ সংখ্যায় যেমন লিখেছিলে—তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও।

আমি কথা দিয়েছিলাম, এবং সেই প্রতিশ্রুতি-মতো 'বসুধারা'তে তা ঘোষণাও করা হয়েছিল।

এরপর মধ্যিখানে 'বসুধারা' আপিসে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। যেতেই বললেন, "বোসো বোসো। তোমার কথা ভাবছিলাম। বেশ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তা শেষপর্যন্ত বে হলো?"

আমি তো একদম মাথায় হাত দিয়ে বসেছি। "কার বিয়ে? আমার? এই বয়সে? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শেষ-বয়স পর্যন্ত বিয়ের কথা ভাবতেন, কিন্তু সে তো মরণের সঙ্গে, না কার সঙ্গে।"

চারুবাবু আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোমার মুখ দেখেই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। বুঝেছি, বিষ খেয়েছে। মস্তবড় ট্র্যাজেডি।"

"বিষ খেয়ে মরেছে? কে?" তাঁর কথা শুনে আমি সত্যিই তখন ভয় পেয়ে গিয়েছি।

এবার চারুবাবু হেসে ফেললেন। "কেন তোমার গল্পের নায়িকা? তোমাদের তো দুটো অলটারনেটিভ আছে—হয় বে হবে, না হয় বিষ খাবে।"

আমাকে হেসে বলতে হলো, এখনও গল্পের শেষে এসে পৌঁছয়নি। আরো কয়েকটি দিন সময় লাগবে।

চারুবাবু বললেন, "সে কি হে? এখনই তো প্রজননের পক্ষে সবচেয়ে উত্তম সময়! এখনই তো সামার-ভেকেশনের টাইম।"

"মানে?" আমরা প্রশ্ন করলাম।

"মানে?" চারুবাবু এবার তাঁর সম্পাদকীয় চেয়ারে নড়ে বসলেন। "মানেটা তাহলে তোমাদের খুলেই বলি। আমি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে মাস্টারি করি। সামার-ভেকেশনের পর কলেজ খুলতে, একদিন বিকেলবেলায় বেড়াতে বেড়াতে এক বহুলপ্রচারিত মাসিক পত্রিকার আপিসে গিয়েছিলাম।"

"কোন্ মাসিক পত্রিকা? আমরা প্রশ্ন করলাম।

"সেটি বলতে পারবো না।" এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হয়ে আর-এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের পিঠে আমি ছুরি মারতে পারবো

না। ওটা আমাদের ট্রেড-ইউনিয়ন-কোডে বাধে। ধরো পত্রিকার নাম ক, সম্পাদকের নাম খ ; এবং মালিকের নাম গ। আমি যখন গেলাম তখন খ ও গ দুজনেই বসেছিলেন। আমাকে দেখেই খ বললেন, 'আসুন আসুন। আচ্ছা, বলুন তো মশাদের বংশ-বৃদ্ধির সময় কোনটা ?'

'কেন ? বর্ষাকাল।' আমি জোরের সঙ্গে বললাম।

ভদ্রলোক তখন প্রশ্ন করলেন, 'লেখার বংশবৃদ্ধি হয় কোন্ সময় ?'

'যদি রবীন্দ্রনাথের কথা ওঠে, তবে বলতে হয়, তাঁর লেখার কোনো সিজন নেই।'

গ হাঁ হাঁ করে বললেন, 'ওঁকে এর মধ্যে টানছেন কেন ? এমনি সাধারণভাবে বলুন।'

খ এবার নিজেই উত্তর দিলেন, 'সামার ভেকেশন। কলেজে লম্বা ছুটি দেওয়ার সিস্টেম বন্ধ না করলে, আমাদের মারা পড়তে হবে। আপনাদের কলেজের যত ছেলেছোকরা ছুটিতে বাড়ি যায়, আর কবিতা লিখতে আরম্ভ করে। প্রতি বছর ঠিক সামার-ভেকেশনের পরই—আমরা বারো-শো থেকে দেড় হাজার কবিতা পাই—তাতে প্রকৃতি আছে ; গ্রাম আছে ; প্রেম আছে ; বিরহ আছে ; দীর্ঘ বিরহের পর ক্ষণিকের মিলন আছে ; ক্ষণেকের মিলনের পর আবার বিচ্ছেদ আছে।'

গ বললেন, 'হয়তো লক্ষ্য করেছেন, "নূতন লেখকদের প্রতি নির্দেশ" এই শিরোনামায় আমরা প্রতিবার ছাপাই—কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখবেন। ওটা কেন জানেন ?'

আমি বললাম, 'না, মশায়। কলেজে ফিজিক্সের মাস্টারি করি, সাহিত্যের অতো মারপ্যাঁচ বুঝি না।'

গ বললেন, 'তা হলে, আমার টেবিলের পাশে চেয়ে দেখুন।'

চেয়ে দেখলুম, 'চৌকো চৌকো করে কাটা হাজার দশেক স্লিপ রয়েছে।'

গ বললেন, 'এই সময়ে আমরা যা কবিতা পাই তাতে আমার দোকানের, আমার আপিসের, এমনকি আমার প্রেসের পুরো বছরের স্লিপ হয়ে যায়। এক পৃষ্ঠায় কবিতা লেখার ঐ একটা মাত্র সুবিধে।'

"এবার বুঝলো তো ? স্ট্যাটিস্টিক্স্ অনুযায়ী নিশ্চয়ই এই সময় তোমাদের বেশী লেখা উচিত।"—চারু ভট্টাচার্য কথা শেষ করলেন।

সেইদিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েও, আমি কিন্তু আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করতে পারিনি। 'বসুধারা'র বৈশাখ-সংখ্যায় লেখা দেওয়া হয়নি। সম্পাদকীয় এবং বৈবাহিক জগতে কথা দিয়ে কথা না রাখার মতো গুরুতর অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। উকিলরা এই অপরাধকেই বলেন, Breach of promise.

এরপর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছে। 'বসুধারা' আপিসের সামনে পর্যন্ত গিয়েছি, কিন্তু ঢুকতে সাহস হয়নি। মনে মনে ভেবেছি, যে লোক রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন—'সঞ্চয়িতা', 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র পিছনে যাঁর অদৃশ্য হস্ত রয়েছে, তাঁর কী দুর্ভাগ্য—রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি-বছরে তিনি আমাদের লেখা চাইছেন।

বুদ্ধিমান পাঠক আমার দুর্বলতা ক্ষমা করবেন। এমন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে আমার প্রতিটি ভুলকে গ্রহণ করবার সুমধুর দৃষ্টান্ত, আমার জীবিতকালে আর পাবো বলে মনে হয় না। অন্ততঃ আমি আশা করি না।

সবার অলক্ষ্যে ক্ষমা-ভিক্ষার জন্য একদিন বিকেলে চারুবাবুর ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। তখন সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কেউ ছিল না। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই তিনি বললেন, "এই যে শ্রীমান, এসো। তারপর নিজেকে সংশোধন করে বললেন, "ওহো, তুমি তো আবার শ্রীহীন শংকর। কী যে তোমার রুচি বুঝি না—নিজের ল্যাজামুড়ো নিজেই বাদ দিলে। আমি যদি তোমার শত্রু হতাম, তা হলে বলতাম, এই কারণেই তোমার রচনায় হৃদয় থাকলেও, মস্তিষ্ক থাকে না!"

আমাকে ক্ষমা চাইতে হলো না। তার আগে নিজেই তিনি বললেন, "তুমি যে লেখা দাওনি, এতে খুশী হয়েছি। তুমি যে লিখছো, এমনকি আপিস থেকে পর্যন্ত ছুটি নিয়েছো, এ-খবর আমি পেয়েছি। লেখাটা নিশ্চয়ই তোমার মনের মতো হয়নি। আমাকে ছুঁচো-গেলার হাত থেকে রক্ষে করেছ। আগেকার যুগে রীতি ছিল—সম্পাদকরা লেখা পড়ে বিচার করবেন। মনের মতন না হলে ফেরত দেবেন—সে তিনি যেই হোন না কেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখে প্রথমেই কয়েকজন মনের মতো লোককে শোনাতেন। এখনকার বিখ্যাত লেখকদের লেখা প্রথম যিনি পড়েন—তাঁর নাম কম্পোজিটার, এবং শেষ যিনি সংশোধন করেন তাঁর নাম

প্রুফ-রীডার। এতে সম্পাদকের কাজ কমে বটে, কিন্তু সাহিত্যের উপর অবিচার করা হয়। কারণ খারাপ লেখাটা কিছু অপরাধ নয়, অপরাধ সেটা ফলাও করে কাগজে ছাপা।'

আমি বলেছিলাম, "আমার সৌভাগ্য, আপনি আমাকে ভালোবাসেন। আমার লেখা পড়েন। যে-চোখ রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি পড়েছে, সেই চোখই আমার লেখা যাচাই করছে।"

চারুবাবু হেসে বললেন, 'লেখকরা বেজায় সেন্টিমেন্টাল হয়। তবে, ধরা যাক তোমার যে-লেখাটা প্রকাশ করতে দিলে না, সেটা খারাপ হয়েছিল। কিংবা মডার্ন কায়দায় বলা যেতে পারে—স্ট্রিল-বর্ন চাইল্ড। অনেক যন্ত্রণার পর মা যে শিশু প্রসব করলেন সে মৃত।"

"বাঃ চমৎকার বলেছেন!"—আমি বললাম।

"কিন্তু একটা প্রশ্ন করি। সেই সন্তানটি কী? গজক্ষয়? না মূষিক-বৃদ্ধি?"

"মানে?" আবার প্রশ্ন করলাম।

"আধুনিক লেখক হয়ে, ঐ সিক্রেটটা জানো না, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করছি না। যদি তুমি কোর্টে এফিডেভিট করো, তা হলেও না।" তার জন্যে যদি আমাকে আবার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তা হলেও না।"

"আপনি কি কখনও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন?"

"কেন, বিখ্যাত লোকদের চরিত্রের একটা ডার্ক-সাইড থাকতে নেই? নিষ্ঠাবান সৎব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছি, প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশ বোসের কাছে পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘুরেছি, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোসকে পড়িয়েছি বলে চরিত্রে একটু কলঙ্ক থাকবে না? তা হলে চারুচন্দ্র কেন? কিন্তু সে কথা পরে। আগে গজক্ষয়ের ঘটনাটা শোনো। সেটাও আমার মতো এক মাস্টারের কীর্তি।"

চারুবাবু বলতে আরম্ভ করলেন—"এক মাস্টারমশায়ের পাঠশালে পড়াচ্ছেন। ভদ্রলোক চোখে ভালো দেখতে পান না। বোধহয় ছানি ছিল। এমন সময় পাঠশালের পাশ দিয়ে একটা শূয়োর ছুটে গেল। ছেলেরা বললে, 'গুরুমশায়, ওটা কী গেল!' গুরুমশায় ঠিক ঠাওর করতে পারেননি। কিন্তু ছাত্রদের কাছে ইজ্জত যায় আর কি? শেষে ঠেকায়

পড়ে বললেন—'গজক্ষয় বা মূষিকবৃদ্ধি'। অর্থাৎ হয় ক্ষয়ে যাওয়া হাতি, না-হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূষিক।"

একটু থেমে চারুবাবু বললেন, "এই যে তোমরা বাংলাদেশে উপন্যাস বলে যেগুলো চালাচ্ছ, সেগুলো হয় গজক্ষয় নয় মূষিকবৃদ্ধি। গজক্ষয়, ভদ্রতা করে বললাম। আসলে এখন প্রায় সবই মূষিকবৃদ্ধি!"

আমি হেসে উঠলাম।

তিনি আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন, "কীগো? রাগ করলে নাকি?"

আমি বললাম, "মোটেই না। আপনাদের সমালোচনা শুনেই তো আমরা নিজেদের সংশোধন করে নেবো।"

তিনি আবার হাসলেন। "বুড়োবয়সের ঐ দোষ। মানুষ গ্যারুলাস হয়ে ওঠে। বকবক যেন না করলে ভাত হজম হয় না।"

আমি বললাম, "আপনার ক্রিমিন্যাল কেস্‌টার কথা এবার বলুন। আপনার কী শাস্তি হয়েছিল?"

"সেটি এখন বলছি না। শেষে তোমরা বলে বেড়াও, কন্‌ভিক্‌টেড লোক দিয়ে ত্রিদিবেশ বসু 'বসুধারা' চালাচ্ছেন!"

"আদালতে কন্‌ভিক্‌টেড বিপিন পাল, এমন কি কন্‌ভিক্‌টেড কম্পোজিটরের কথা তো আপনিই কিছুদিন আগে লিখেছেন।" আমি উত্তর দিলাম।

"ওরে বাপু, সেসব রাজনৈতিক কন্‌ভিকশন। ওতে নাম আরও বাড়ে। আমার তো তা নয়; আমার অপরাধ যে অত্যন্ত ঘৃণ্য।"

"কী ধরনের?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"তুমি ভেবেছো, তুমিই আদালতের সমস্ত ব্যাপার বোঝো! আমিও আদালতে গিয়েছি। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড্‌টা বুঝি না, কিন্তু মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট্‌টা 'সঞ্চয়িতা'র মতো মুখস্থ আছে। মায় একটু উৎসাহ পেলে মিউনিসিপ্যাল কোর্ট নিয়ে আর একখানা 'কত অজানারে' লিখে ফেলতে পারি।"

"অনেকদিন যেতে হয়েছিল বুঝি?" আমি প্রশ্ন করি।

"নারে বাপু, মাত্র একদিন। তাতেই ডবল ডিমাই, স্মল-পাইকা

পাঁচশো পাতা। বেশীদিন গেলে তো ভল্যুমের পর ভল্যুম লিখতে হতো। ব্যাপারটা বলি শোন—

আমাদের বাড়ির সামনে ময়লা ফেলা নিয়ে ব্যাপারটা হয়েছিল। নিয়ম হচ্ছে, কর্পোরেশনের ময়লা-গাড়ি এলে, তবে বাড়ির ময়লা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। কিন্তু একদিন আদালত থেকে সমন পেলাম কোন্ এক ধারা মতে আমার বিচার হবে। কারণ, কর্পোরেশনের খাতায় যে-বাড়ির মালিক বলে আমার নাম আছে, ঠিক তারই সামনের ডাস্টবিনে ময়লা ফেলবার আইন মানা হয়নি।

বোঝো অবস্থা। কোর্টে গিয়ে তো হাজ্‌রে দিলাম। কখন ডাক পড়ে। উকিল বলে দিয়েছেন, 'যেমনি আদালতে জিজ্ঞাসা করবেন—দোষী? অমনি বললেন, হ্যাঁ ধর্মাবতার, দোষী। তাহলে কয়েকটা টাকার ওপর দিয়ে আপদ চুকে যাবে। খবরদার গুঁইগাই করবেন না; তাহলে ট্যাক্সির মিটারের মতো ফাইন বাড়তে আরম্ভ করবে। কোর্টে বসে বসে, ওই গদটাই মুখস্থ করছি।

ওদিকে কোর্টে বেজায় ভিড়। গ্র্যাণ্ড পূজা ক্লিয়ারেন্স চলেছে। ছুটিতে বহু কেস্ জমা হয়ে গিয়েছিল। তাই পাইকারী রেটে বিচার হচ্ছে। শ'চারেক আসামী জমা হয়ে আছে। গোটা চল্লিশ পঞ্চাশ আসামীকে একসঙ্গে কাঠগড়ায় পুরে নাম ডাকা হচ্ছে। 'দোষী?' সবাই একসঙ্গে বলছে, 'হ্যাঁ হুজুর!' আর পাঁচটাকা করে জরিমানা হচ্ছে। কেউ প্রতিবাদ করলেই মুশকিল।

'রাম আহির? তুমি অমুক দিন অমুক সময় মিউনিসিপ্যাল রাস্তার উপর চারগাড়ি চুন-সুরকি ঢেলে রেখেছিলে! তোমার পাঁচটাকা ফাইন।'

'হুজুর, আমার চুন-সুরকির দোকান নেই। আমি গয়লা মানুষ। সুরকী দিয়ে কী করব?'

রাম আহিরের প্রতিবাদে পাঁচটাকা দশটাকা হয়ে গেল। 'দশ, দশ—দোষী?'

দেরী করলে এখনি পনেরো হয়ে যায় এই ভয়ে রাম আহির বললে, 'হ্যাঁ হুজুর দোষী।' জরিমানার টাকা দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে 'আখতার আলি' তুমি অমুক দিন অমুক সময়

মিউনিসিপ্যাল রাস্তায় তোমার খাটালের মোষ ধোয়াচ্ছিলে, তোমার পাঁচ টাকা……'

'হুজুর ! মোষ আমি কোথায় পাবো। আমি চুন-সুরকির ব্যবসা করি।'

'দোষী ?'

'হুজুর' আমি…'

'দশ টাকা।'

'দোষী ?'

আখতার আলীও এবার ফাইন দিয়ে চলে গেল। তারপর চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

'চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য' পিতা…ভট্টাচার্য 'তুমি অমুক' তারিখে ডাস্টবিনে জঞ্জাল…'

হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট মুখ তুলে তাকালেন। আমাকে ডকে দেখেই যেন চমকে উঠলেন। 'স্যার ? আপনি ? আপনি এই কোর্টে।'

কাঠগড়া থেকে খালাস হয়ে, সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের খাসদপ্তর। জরিমানা তো দূরের কথা, রাঙতামোড়া সন্দেশ খেয়ে বাড়ি ফিরলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে মাস্টারি করার ঐ একটা সুবিধে !" চারুবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন।

সেদিন আরও অনেক কথা হয়েছিল। আসামের দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ভারতের জাতীয় ঐক্য। তিনি বলেছিলেন, "বাংলার কালচারাল কন্ট্রোয়েস্ট-এর জন্যে দুটি জিনিস দায়ী। একটি রবীন্দ্রনাথ ; অপরটি রসগোল্লা। রসগোল্লার মধ্যে দিয়েই বাঙালী ভারতবর্ষকে জয় করবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ কোন সূত্রে একত্র হয়ে আছে, বলো দেখি ?"

আমি বললাম, "বইতে পড়েছি আগে ছিল ইংরেজ—আর এখনও বোধহয় ইংরেজী।"

চারুবাবু বললেন, "তোমার মুণ্ডু। ছোটোবেলায়, কলেজে পড়বার সময় শুনেছিলাম, শিবলিঙ্গ। ভারতবর্ষের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম যেখানেই যাবে শিবলিঙ্গ দেখতে পাবে। কিন্তু ভারত-সন্ধানে বেরিয়ে আমি আবিষ্কার করেছি, না শিবলিঙ্গ নয়—অন্য কিছু।"

"সেই অন্য কিছুটা কী ?" আমি অধীর হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"সেই অন্য কিছুটিকে খুঁজে বার করতে গিয়ে জীবনের আটাত্তরটা বছর

কেটে গেছে। রবীন্দ্রনাথও যা পারেননি, আমি তা পেয়েছি। আর তোমাকে এক কথায় তা বলে দেবো ?"

'আমরা ছোটো। আমাদেরও যদি খুঁজে খুঁজে সব শিখতে হয়, তাহলে কোনোদিনই তো কিছু জানা হবে না।" ওঁর কাছে কাতর আবেদন করলাম।

তিনি হেসে বললেন, "তবে জেনে রেখে দাও—কিন্তু ক্লোজলি-গার্ডেড সিক্রেট—জিলিপি। ভারতবর্ষের যেখানেই যাও, জিলিপি তুমি পাবেই। বাঙালীর রসগোল্লা-বিজয় গোল্লায় গিয়েছে ; শিবলিঙ্গকে আমরা আমাদের জীবন থেকে হটিয়ে দিয়েছি—কারণ আমরা জেনে ফেলেছি আমাদের মধ্যেই শিব বিরাজ করছেন। এখন সবেধন নীলমণি যা রইল তার নাম জিলিপি।"

কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর কথা উঠলো। বললেন, 'তুমি দুজনেরই ভক্ত ?'

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। এঁদের দুজনেরই কাছে ভারতবর্ষের মানুষ আমরা চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবো।"

"ওঁদের দেখেছ ?" চারুবাবু প্রশ্ন করলেন।

"না। রবীন্দ্রনাথ যখন বিদায় নিলেন, তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি ; আর গান্ধীজী যখন গড্‌সের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, তখন আমি ম্যাট্রিকের পড়া মুখস্থ করছি। ভারতবর্ষের দুজন মহামানবের সমসাময়িক হয়েও কাউকে দেখে যেতে পারলাম না, বুড়ো হয়ে নাতিদের কী বলবো ?" আমি বললাম।

তিনি একটু ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, "হয়তো আমার ভুল। কিন্তু আমার নাতিকে কী বলি জানো ? আমি দুজনকেই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ হলেন সমুদ্র—আর গান্ধীজী তাজমহল। পুরীর সমুদ্র দেখবার আগে মনে মনে একটা কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু মিললো না—দেখলাম সমুদ্র কল্পনা থেকেও অনেক বড়ো। তাজমহল দেখেছি—কিন্তু কল্পনার থেকে খাটো মনে হয়েছে। কিন্তু কাউকে বলতে পারিনি—পাছে শিল্পরসিক বন্ধুরা হাসেন।

হঠাৎ তিনি গম্ভীর হয়ে পড়লেন। বললেন, "কী সব বাজে বকছি।

স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি এনে তোমাদের হাতে দিয়ে যেতে চাই। কিন্তু সে আমরা পারিনি। রবীন্দ্রনাথের নিকটতম সান্নিধ্যে এসেও—তোমরা যারা তাঁকে দেখোনি—তাদের কিছুই দিয়ে যেতে পারলাম না। বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেই আমরা স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। এই শত বর্ষের বছরে তোমাদের মালাগুলো জোর করে আমরা গলায় পরে গেলাম। পরে হয়তো তোমরা সব বুঝবে কিন্তু তখন যেন আমাদের জোচ্চোর বোলো না। বিশ্বাস করো, আমাদের সামর্থ্য ছিল না।"

"আর তা ছাড়া···" চারুবাবু এবার দীর্ঘশ্বাস নিলেন, আস্তে আস্তে বললেন, "একে একে নিবিছে দেউটি। মাইকেলের মৃত্যুদিনে আমি জন্ম নিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি বছরেই আমার শেষ। এই তোমাকে বলে রাখলাম। বিশ্বাস না হয়, তোমার নোটবইতে টুকে রেখে দিও।" হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, "চলো, ওঠা যাক।"

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর থেকে তিনি মোটরে চড়লেন। মোটর ছেড়ে দিল। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে তিনি বললেন, "আমি সাহিত্যিক নই যে কথার খেলাপ করবো। কথা দিলুম, তা ঠিক রাখবই।"

ডাইরির পাতার মধ্যে থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, "কি হে আধুনিক সাহিত্যিক, কথা রাখিনি?"

হ্যাঁ, কথা তিনি রেখেছেন। কিন্তু আবার কথা রাখেনওনি এইতো কিছুদিন আগে, এক প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবে বক্তৃতা করতে উঠে তিনি বলেছিলেন, "আজ আমার বিশেষ কিছু বলবার সময় নেই। আমার যা কিছু বক্তব্য, তা আমি প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে বলবো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আপনাদের সবাই যেন সুস্থ শরীরে সেদিন এখানে উপস্থিত থেকে আমার বক্তৃতা শুনতে পারেন।'

কবে তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে জানি না। কিন্তু সে-দর্শন যতোই বিলম্বে হোক, তাঁকে আমি আর একবার মনে করিয়ে দেবো, তিনি কথার খেলাপ করেছেন।

আর সেই বোঝাপড়ার আগে পর্যন্ত আমাদের সবাইকে চোখের জল ফেলতে হবে। তাঁর কী ছিল? তাঁর বিচিত্র জীবনের প্রায় কোনো অভিজ্ঞতাকেই আমাদের অনাগত বংশধরদের জন্য রক্ষে করা হলো না।

তাঁর আত্মজীবনী রচিত হলে, ভারতীয় সাহিত্যে তা একটা আশ্চর্য সৃষ্টি হতো।

ছোটবেলায় এক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প পড়েছিলাম। আফ্রিকার গহন অরণ্য থেকে দুষ্ট এবং লোভীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুজন অসমসাহসী বাঙালী যুবক রত্নসম্ভার উদ্ধার ক'রে, পালতোলা জাহাজে দেশে ফিরছিল। কিন্তু ভারত মহাসাগরের বুকে হঠাৎ সাইক্লোন উঠলো। ঝড়ঝঞ্ঝায় সেই সোনা-বোঝাই জাহাজ শেষপর্যন্ত ডুবে গেল। কৈশোরের অপরিণত বুদ্ধিতে, সেই সর্বনাশা ক্ষতির জন্য সেদিন চোখের জল ফেলেছিলাম। আর আজ এতোদিন পরে আমাদেরই চোখের সামনে আর-এক সোনা বোঝাই জাহাজ মৃত্যুসাগরের অতলে তলিয়ে গেল। দুঃখ এই, এতো কাছে থেকেও আমরা একতাল সোনাও সেই ডুবন্ত জাহাজ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করলাম না।

তাঁর কোনো কথা, কোনো গল্পই আমরা লিখে রাখলাম না। পৃথিবীতে সক্রেটিস, খ্রীষ্ট এবং শ্রীরামকৃষ্ণরাই বিরল বলে ধারণা ছিল—কিন্তু বস্‌ওয়েল এবং 'শ্রীম'রাও যে নিতান্ত সহজলভ্য নন তা এতোদিনে জানলাম।

———